1976 B
vol
XXIII

আনন্দবার্তা

বর্ষ ২৩ জানুয়ারী, ১৯৭৬ সংখ্যা ১

আনন্দবার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ—অধ্যক্ষ

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ, পি০আর০এস০, ডি০লিট্

ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম০ এ০. পি০ এইচ০ ডি০

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

☆

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড
অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং
(ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	—	১
২।	মাতৃ-সংসঙ্গ (১৩)	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি ...	৩
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ..	১৫
৪।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ ...	২৮
৫।	সত্যই কি মা বড়লোকের মা ?	—শ্রীবগলাচরণ বসু ...	৩৮
৬।	মাতৃ-পদামৃত	—শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৪৬
৭।	দিব্য-মহাজীবন-বেদ	—শ্রীদিব্যদর্শী ...	৪৯
৮।	২৬তম সংযম মহাব্রত	—শ্রীপ্রতিভা কুমার কুণ্ডু ...	৫৭

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তায় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।
* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক কমিশন বাবদ অতিরিক্ত দুই টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা

জেনারল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
(পাবলিকেশান একাউন্ট্)
ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা

সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা'
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

আনন্দবার্তা

"অয়ম আত্মা—অয়ম্পন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

ত্রয়োবিংশ বর্ষ] জানুয়ারী ১৯৭৬ [সংখ্যা ১

: মাতৃ-বাণী :

[সংকলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

মনকে শুদ্ধ ভোজন দাও। তাঁর দিকে বেশী সময় মন দিলে সকলের মধ্যে ভগবৎ বুদ্ধি হওয়ার আশা থাকে। চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। শেষ নিঃশ্বাসে যে স্থিতি, বর্ত্তমান ঐ স্থিতি অনুসার প্রাপ্তি হয়।

* * * *

চেষ্টা করিয়া আসক্তি ত্যাগ করা যায় না। কেবল তাঁহাকে পাইবার আসক্তি বাড়াইলেই অন্য আসক্তি ত্যাগ হইয়া যায়। জাগতিক জিনিষের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া। আনন্দ আর শান্তি সকলেরই লক্ষ্য। উহা সকলের মধ্যেই আছে। উহার ত আর ত্যাগ হইবে না। যা যা ত্যাগ হইবার তাহা ত্যাগ হইয়া যাইবে।

* * * *

ব্যাকুল হতেই হবে। ব্যাকুলতা আমাদের স্বভাব। তাঁহাকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আমাদের আপনি আসে। স্বধন লাভ হইলেই এই ব্যাকুলতা চলিয়া যায়।

* * * *

যতক্ষণ ধরিতে পারা যায় ততক্ষণ কেবল এককেই ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করা। দরকার কেবল এক লক্ষ্য হওয়া। কর্ত্তব্য কেবল এককে লইয়া থাকা। এক নাম, এক ধ্যান, এক চিন্তা লইয়া এক লক্ষ্য হওয়া।

* * * *

দৃঢ় বিশ্বাস চাই, কিন্তু উহারই যে বড় অভাব। কর্ম্ম করিয়া বাসনা শেষ করা যায় না। একটির পর একটি করিয়া অনন্ত বাসনা দেখা দেয়। কেবল একটি বাসনা লইয়া থাকিলে – কেবল ভগবানকে লাভ করিবার বাসনা লইয়া থাকিলে অন্য বাসনা লোপ পায়। যেমন ডালপালার দিকে লক্ষ্য না দিয়া যদি দিনের পর দিন গাছের গোড়ায় জল ঢালিয়া দেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে ঐ গাছের সব পুরাতন পাতা ঝরিয়া নূতন পাতা দেখা দিয়াছে। সেইরূপ অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু শুধু নাম করিয়া গেলেই মানুষ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিতে পারে।

* * * *

সৎকর্ম্মের ফল তো ব্যর্থ হবার নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে কর্ম্মভোগ। যতক্ষণ ভগবানেতে কর্ম্মযোগ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ না দিয়ে তিনি ছাড়েন না।

* * * *

প্রণবের অর্থ – অক্ষর ব্রহ্ম। সর্ব্ব অক্ষরে এই অক্ষর – যাহা ক্ষরিত হয় না – ইহাই শব্দ ব্রহ্ম।

* * * *

মাতৃ-সৎসঙ্গ

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

(১৩)

প্রস্তাবনা ঃ—

উত্তরকাশীর প্রসিদ্ধ মহাত্মা পরমপূজ্য শ্রীদেবী গিরিজী মহারাজের সাথে শ্রীমা এবং অন্য ভক্তদের, ৩০শে মার্চ ১৯৪৮ থেকে ১লা এপ্রিল ১৯৪৮ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কাশীতে, খুব সুন্দর সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এই লেখাতে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। পূজ্য দেবীগিরিজী মহারাজ উত্তরকাশীতে প্রায় ৫০ বছরেরও বেশী তপস্যা করেছেন। অক্টোবর ১৯৫০এ উত্তরকাশীতে ওনার শরীর ব্রহ্মলীন হয়। আমার পুরোনো ডায়েরীই এই লেখাটির আধার। যথাসম্ভব আমি মা ও অন্য মহাত্মাদের মুখনিঃসৃত শব্দাবলীই রাখার চেষ্টা করেছি। ৩০শে মার্চ ১৯৪৮ ঃ—

আশ্রমে প্রবেশ করেই মা সর্বপ্রথম শ্রীদেবীগিরিজী মহারাজের ঘরে (তিনি আগেই এখানে এসে পৌঁছেছেন) গেলেন। মাকে দেখেই উনি দাঁড়িয়ে প্রসন্নতাপূর্বক আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।

মা বললেন— বাবা! আমিত তোমার ছোট্ট মেয়ে।

দেবীগিরিজী— অনেক দিন থেকে আপনার দর্শনের ইচ্ছা ছিল।

মা—বাবার এই অহৈতুকী কৃপা যে দর্শন দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন মহাত্মাদের দর্শন-যোগ অমৃত যোগ। আগে বাবার দর্শন করে পরে ভোজন করব। তাই বাবার সাথে দেখা করতে এলাম।

দেঃ—সচ্চিদানন্দ ভোজনইত আপনার বিশেষ ভোজন।

মা—মা প্রণাম করতে করতে বললেন—"নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ !! নমো নারায়ণ !!!"

* * *

বিকেলবেলাতে মা বাইরে হলের উপরের ছাতে বসে আছেন। পূজ্য দেবীগিরিজী মহারাজ মার সাথে দেখা করতে এলেন। মা ওনাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। ওনাকে আসন দেওয়ালেন ও বললেন—"বাবা! কুম্ভমেলায় গেলে না। বাবার জন্য কুটিয়া রাখা ছিল।"

দেঃ—কি দেখব ? সবইত স্বপ্ন। মায়ার বিলাস।

মা—হ্যাঁ বাবা, সত্যি ঠিক কথা।

দেঃ—শরীর ত নিষ্কর্মা, ষট্‌বিকারযুক্ত।

মাঃ—হ্যাঁ নিষ্কর্মা।

দেঃ—আত্মাই রাম।

মাঃ—হ্যাঁ, আত্মারাম।

দেঃ—"রমন্তে যোগিনঃ অস্মিন্ ইতি রামঃ"—যিনি সবার হৃদয়ে রমণ করেন তিনিই রাম। প্রকাশের নামই কাশী। স্বপ্রকাশের ক্ষয়ও নেই বৃদ্ধিও নেই। সেখানে একরস।

মাঃ—সেখানে সব দিক থেকেই একরস।

দেঃ - নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ যাঁর মধ্যে, তিনি সমাধিতে বসুন বা বাইরে থাকুন ওঁনার আর লাভ-ক্ষতি কি ?

মাঃ— লাভ-ক্ষতিরত কোনো কথাই নেই।

দেঃ - মার দর্শন হয়ে গেল। খুব মঙ্গল হল !

মাঃ—বাবা! ছোট্ট মেয়ের উপরে স্নেহ করে অহৈতুকী কৃপা কর। কুম্ভ সম্বন্ধী আলোচনা হওয়ায় মা বললেন— বাবা স্বয়ংই অমৃত কুম্ভ। দেখা আর কি ?

দেঃ পাঁচটি কুম্ভতো দেখলাম। এখন আর কি দেখব? এখন বসে বসে পাঠ করি!

মাঃ- এই শরীরত উড়ন্ত পাখী। কখনো কখনো ঢুকে পড়ে, আবার কখনও বের হয়ে যায়। যদি আশ্রমের কথা বলা যায় তো সম্পূর্ণ পৃথিবীই এই শরীরের আশ্রম।

দেঃ—কোথায়ও ন্যূনাধিক নেই।

মাঃ সেখানে দেশকালের কোনো কথাই নেই।

দেঃ - কেবল একরস।

* * *

কাল পূজ্য দেবীগিরিজী মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে ভোজনের নিমন্ত্রণ এসেছে। মা জিজ্ঞাসা করলেন "কাল ভোজনের জন্য যেতে হবে?"

দেঃ—খাওয়া কি? ওদেরই খুশী।

মাঃ--খুশীইতো খাওয়া। আনন্দই খাওয়া।

দেঃ—ভক্ত ভগবানকে দাস করেন। যেমন অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন "ভগবান্! আমার রথ উভয়পক্ষের সেনাদের মধ্যে নিয়ে চল।"

মাঃ—মানে আর কি? তিনিইত।

* * *

মৌনী মা কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধে দেবীগিরিজীকে প্রশ্ন করলেন। দেবী-গিরিজী বললেন "কৃষ্ণলীলা আদি সব মায়ারই বিলাস।"

মৌনিমা—কৃষ্ণতো সচ্চিদানন্দ-ঘন মূর্ত্তি ছিলেন।

দেঃ—যা সচ্চিদানন্দ তা তিনকালই থাকে। যখন মূর্ত্তি ধারণ করে তখন মায়ার দ্বারাই ধারণ করে। কৃষ্ণ কোথায়? দেখাও। যেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আছে, সেখানে সব মায়াই। এর বাইরে যা তা নির্বিশেষ। দৈ বী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

মৌঃ—শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং ভগবান ছিলেন। মায়াকে আশ্রয় করে লীলা করতেন। সাধারণ জীব যা করে তাত অজ্ঞানের দ্বারা করে।

দেঃ - তিনি কিছুই করেন না। তিনিত সাক্ষী। যতদূর মনের গতি, ততদূর মায়ার রাজ্য। সৎ, চিৎ, পরমানন্দ—এই সব মনোময় বিলাস। মায়া কি করে দূর হতে পারে? যে পুরুষ আমারই সাক্ষাৎকার করে সেই মুক্ত হতে পারে। সচ্চিদানন্দ, এই সব মায়া। নির্বিশেষ বস্তু যা তা কিছুই না। জ্ঞানস্বরূপের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আত্মাকে পঞ্চকোষের উর্দ্ধে বলা হয়েছে। তাঁর সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। দুধের থেকে মাখন বের করে নিলে তা আর দুধে মেশানো যায় না। মন শান্ত হলেই জ্ঞান হয় না। মনের গতি দিনরাত লেগেই আছে। যখন কোন সময় মনের গতি শান্ত হয়ে যায় তখন সম্যক্ জ্ঞান হয়। এই যে মা, এনাকে কি কেউ চিনতে পেরেছে? ইনি নিজ-সংশয় এক রসময়। যিনি মার মত হবেন তিনিই মাকে চিনতে পারবেন। মা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাও কিছু করছেন না। লোকেরা দেখে যে মা এদিকে আসছেন, যাচ্ছেন তা কিছুই না। মা সব জায়গাতেই ব্যাপ্ত। "বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।" কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন -"তোমারও আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। লোকেরা বলে যে কৃষ্ণ গোপীদের সাথে রাস করতেন কিন্তু তাত নির্বিশেষ। বালক যেমন নিজের সাথেই খেলা করে তেমন ভগবান নিজের সাথেই সমস্ত লীলা করেছেন। সচ্চিদানন্দ! এই কথাত বলাই উচিৎ যে মনকে শান্ত কর। সব হয়ে যাবে! "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ তদনু-শিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।" এই সব উপনিষদ বলে। তিনিত জ্ঞান—অজ্ঞানের উর্দ্ধে।

প্রঃ - বেদান্ত দর্শনে আছে, গীতায়ও আছে যে "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মাণী।" কেউ কেউ বলে যে জ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম ও ক্রিয়মাণ কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। প্রারব্ধ কর্মও কি নষ্ট হয়ে যায়?

দেঃ —যেখানে কেবল ব্রহ্মাকার স্থিতি সেখানে তিনটি কর্মই থাকে না।

প্রঃ —প্রারব্ধ না থাকলে দেহ থাকে কি ?

দেঃ— দেহ থাকা সত্বেও দেহের ভান থাকে না। দেহ কোথায় ?

*　　*　　*

৩১শে মার্চ ১৯৪৮ ঃ—

কথা প্রসঙ্গে শ্রীদেবীগিরিজী মহারাজ বললেন ঃ— সেখানে বাণী পৌঁছায় না।

মাঃ—সেখানে নাও নেই। (মা হাসতে লাগলেন)। সেখানে কোনো ভাষার প্রকাশ হতে পারে না।

প্রঃ—যেখানে "নেতি নেতি" আছে সেখানে সব শেষ হয়ে যায়। আর সব কিছু, যখন এখানে আমি, তখন।

মাঃ—এই প্রশ্নটিই ভুল।

দেঃ— যখন "নেতি নেতি" তখন প্রশ্নই কোথায় ?

মাঃ— "নেতি নেতি" যেখানে বলা হয়েছে সেখানে কি আর কোন রাস্তা থাকে ? কোথা পৌঁছাতে হবে ? যেখানে প্রকাশ হয়—সেখানে, "যেখানে সেখানে" থাকে না।

দেঃ - যখন "নেতি নেতি" করে দিয়েছি তখন মহাকাল কোথায় যায় ?

মাঃ—রাস্তা ত নিজের কাছে আছে।

প্রঃ - সেখানে শেষ হয়ে যায় না আরও আছে ? গীতাতে বলা হয়েছে যে আমি ব্রহ্মতে প্রতিষ্ঠিত। আমার থেকে কেউ বড় না।

দেঃ—ভিতরে দেখ। এই সমস্তত মনের গতি। সমস্ত যে তোমার "নেতি নেতি" তা সব মনের গতি।

*　　*　　*

কথা প্রসঙ্গে দেবীগিরিজী মহারাজ বললেন যে ভক্ত ভগবানকে দাস করে নেন।

মাঃ দাস কে ? স্বয়ংইত দাস।

দেঃ—বেশী বলার আর দরকার নেই। ভিতর দেখ। মনের গতিকে শান্ত কর।

প্রঃ—আমিত ভগবানের ভক্তি করি। সংসারেও থাকি। মেয়ের বিয়েতে ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। আমি সেই ঋণ শোধ করব না ভগবানের পূজা করব ?

মাঃ - তুমি যদি ঋণ ছেড়ে, ভগবানের ভজন কর তাহলে ঋণের কথা মনে থেকে যাবে। যখন এমন অবস্থা হয়ে যায় যে কে ঋণ দেবে আর কে ঋণ নেবে তাহলেত অন্য কথা। কিন্তু যতক্ষণ সেই অবস্থা না আসে ততক্ষণ ভজনও করতে থাক আর ঋণ শোধও করতে থাক। যথাশক্তি তাঁকেই স্মরণ কর। তারপর ভগবান যা করেন। ভগবানের উপর নির্ভর কর।

প্রঃ—ঋণের জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ কি না।

মাঃ—যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে চেও। আরেক ভাব যে—হে ভগবান, আমি তোমার থেকে কিছু চাইছি না। আমিত তোমাকেই চাই। যদি চাইতেই হয় তাঁকেই চাও।

* * *

প্রঃ—কাল ভজন শুনতে শুনতে দেবীগিরিজীর চোখে জল দেখা গিয়েছে। এটি মনের দোষকি চোখের দোষ ?

নেপালদা—উনি এমন ভাবে কাঁদছিলেন যে ওনার বিভূতি সব মুছে গিয়াছে।

মা—বিভূতিত ঠিক না। বিভূতিত মুছেই যায়।

নেপালদা—যদি অনুভূতি হয় তবেত ?

প্রঃ—নিত্য বিভূতি আছে কি ?

মা—হ্যাঁ আছে। নিত্য বিভূতি, নিত্য নূতন খেলা।

* * *

কথা প্রসঙ্গে মা বললেন চোখের জল বের হলেই কি বেদান্ত চলে যায় ?

প্রঃ—শোনা যায় যে মহাপ্রভূর চোখ থেকে সব সময় পিচকারীর মত অশ্রুধারা বের হত।

মা শান্ত হয়ে বসে রইলেন।

প্রঃ—ভগবানের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ; কোন নাম জপ করব ?

মাঃ—তুমি নিজেইত বললে যে অনেক নাম ও অনেক রূপ আছে। যে নাম ভাল লাগে, তাই স্মরণ কর।

প্রঃ—কার ধ্যান করব ?

মাঃ—যে রূপের নাম স্মরণ কর তাঁরই ধ্যান কর।

প্রঃ—রাম ও কৃষ্ণ দুই নাম। রামের হাতে ধনুষ ও কৃষ্ণের হাতে বাঁশী।

মাঃ—যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ আর যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম। কেউ রামকে প্রধান ভেবে পূজা করেত কেউ কৃষ্ণকে। একেরই দুই রূপ। যেমন কেউ কেউ 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ করে সবাইকে যে আকর্ষিত করে, আর সবার মধ্যে যিনি রমণ করেন তাঁকে 'রাম' বলা হয়। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের অর্থ আছে। একে অনন্ত ও অনন্তে এক।

একটি ভদ্রলোক মাকে বললেন—"কলকাতার হল্লায় ভজন হয় না। তোমার চরণে ভজন করতে চাই।"

মা—আমিইত তোমার ঘরে, তোমার আশ্রমে থাকি।

*　　*　　*

রাত্রিবেলাতে কাশীর আশ্রমের ছাতে শ্রীদেবীগিরিজী মহারাজ ও মা বসে আছেন। মধুর ধ্বনিতে কীর্ত্তন হচ্ছে। মাতৃ-কীর্ত্তন সমাপ্ত হওয়ার পরে মা 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম' কীর্ত্তন করতে বললেন। তারপর দেবীগিরিজী বললেন--"মা তুমিত আনন্দ স্বরূপ।"

মা—তুমি স্বয়ংই আনন্দ স্বরূপ।

হঠাৎ মা নিজের খেয়ালে রাত্রিবেলায় (কীর্ত্তনের পরে) শ্রীশ্রীদেবী-গিরিজী মহারাজের ঘরে গেলেন। তখন দেবীগিরিজী মহারাজ বললেন "মঙ্গল হয়েছে হয়েছে। খুব মঙ্গল হয়েছে। খুব মঙ্গল হয়েছে। এখানে কেমন করে লাভ হল ?"

মা—সবার ভাগ্য। সবার তোমার দর্শনের লাভ হল।

স্ব০ পরমানন্দজী—নারায়ণ স্বামিজী (হরিদ্বারের কাছে থাকেন) মাকে বলেছিলেন যে তুমি আশ্রম ক'রনা ও বেশী ঘোরাঘুরি ক'র না।

মা—আমি বাবাকে বলেছিলাম এই শরীর কারুর কাছে যায় না, কারুরটা খায়না ও কারুর সাথে কথা বলে না।

দেঃ—ঠিক কথা। কোথায় যাবে ?

মা—কোথায় যাওয়া ? কোথায় আসা ?

দেঃ—যাওয়া মানে পরিচ্ছিন্ন।

মা—কে যাবে ? কোথায় যাবে ? কেমন করে যাবে ?

দেঃ—আপনি উত্তম উত্তর দিয়েছেন।

মা—লেখা পড়াত নেই, যা এসে যায় তাই বলি। উনি খেয়াল করেছেন যে আমি আশ্রম করি। আমিত বলেদিয়েছি আমি আশ্রম করি না। কখনো কখনোত আশ্রমের কথা আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না, যদি আমি নিষেধ করি তাই। এই শরীরত উড়ন্ত পাখী, কখনো উড়ে কখনো বসে।

দেঃ—যেখানে একরস, স্বপ্রকাশ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সেখানে বিজ্ঞান জ্যোঃতিতে আসা যাওয়া কোথায় ?

মাঃ—আসা যাওয়াত কথাই নেই।

দেঃ—বেদ বলে যে তিনি অখণ্ড ব্রহ্ম। যাওয়া, আসা, মরা, বাঁচা, সব দেহাধ্যাস।

ইতিমধ্যে দিদিমা (স্বামী মুক্তানন্দগিরি) ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বামী

পরমানন্দজী পরিচয় করিয়ে দিলেন যে ইনি মার মা। ইনি স্বামী মঙ্গলগিরি মহারাজের থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়েছিলেন।

দেঃ মঙ্গলগিরিজী খুব বিদ্বান ছিলেন। খুব ভাললোক ছিলেন। কেউ বলেছে যে উনি লোকেদেরকে খুব বকতেন।

মা—তিনিত বাইরে থেকে বকতেন ও ভীতরে খুব নরম ছিলেন।

দেঃ— তাইত মহাত্মাদের বিলাস। খেলা।

মা—মহাত্মাদের রাগ ত জলের বুদ্বুদের মতই।

দেঃ— মহাত্মাত মঙ্গলরূপ।

মা—যার উত্তম দৃষ্টি তার সব কিছুই উত্তম। যার অধম দৃষ্টি সেই অধম।

দিদিমা— অন্তর্দৃষ্টি ত খোলে না। মার মা হলে কি হবে?

মা— ধীরে ধীরে খুলে যাবে। মহাত্মার কথা মিথ্যা হয় না।

দেঃ—মার দর্শন হয়ে গেছে। আর কি বাকি আছে?

পূজার বিষয়ে কথা ওঠাতে দেবীগিরিজী বললেন—"পাঁচ প্রকারের পূজা হয়। মূর্ত্তি পূজা, জপ, স্তোত্র, তত্ত্ববিচার ও দেবতার আরাধনা। সত্যিকারের পূজা তাই, যাতে পূজা নেই।"

মা—তিনিই! তিনিই!! তিনিই!!!

দেঃ—বিন্ধ্যাচল খুব সুন্দর জায়গা, কিন্তু খুব গরম। ওখানকার মাহাত্ম্যও দেখেছি।

মা—যদি শরীর থাকেত শীতকালে এখানে এলে ভাল হয়।

দেঃ—শরীর ত ক্ষণিক। সেখান থেকে আসতে অনেক পয়সাও লাগে।

মা—পয়সাত হয়েই যায়। মহাত্মাদের পয়সার কোন কথাই নেই। পয়সার ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

দেঃ—বিন্ধ্যাচল-মাহাত্ম্য হিন্দীতে পড়েছি, কিন্তু স্বাদ পেলাম না। সংস্কৃতে আরও স্বাদ পাওয়া যায়।

মা—জলে এক রকম স্বাদ আর কেবল দইএ আর এক রকম স্বাদ।

দেঃ—বিন্ধ্যাচল-মাহাত্ম্যে অনেক জ্ঞানের কথা লেখা আছে। লিখেছে যে চরণামৃত নিলে সেখানেই মুক্তি হয়ে যায়। মুক্তি না হলে জ্ঞান নেই। কাশীতেও যে মরে তাকে শিব মন্ত্র দেন। (এই কথা বলে উনি সংস্কৃত স্তোত্র আউড়াতে লাগলেন)।

মা—যা আছে তাই প্রকাশ হয়ে যাওয়া।

দেঃ মা! আপনার মহিমা অপার। যেখানে বাণী পৌঁছায় না, যেখানে গুণ নেই, ক্রিয়া নেই—সেখানে বাণী কি করবে ?

* * *

সেদিন রাত্রিবেলাতে মা ছাতে ঘুরছিলেন। নীচে গঙ্গামাতা শান্তরূপে প্রবাহিত হচ্ছেন। শিবের জটার মত মার চুল বাঁধা রয়েছে। মা দেবীগিরি-জীর প্রশংসা করে বললেন যে "খুব তপস্যার শরীর। তপদেহ। খুব সুন্দর মহাত্মা।"

১লা এপ্রিল ১৯৪৮ ঃ—

প্রঃ—জ্ঞান না হলে কি মুক্তি হয় না ? সেই জ্ঞান কি রকম ?

দেঃ—নিজের স্বরূপের জ্ঞান হওয়াই জ্ঞান। খাওয়া, পান করা আদির জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান না। নিজেকে যথার্থরূপে জানাই জ্ঞান। গুরুর কাছে প্রথমে জ্ঞানের শ্রবণ কর, তারপর মনন কর, তারপর নিদিধ্যাসন কর। তারপরে সমাধি হবে, তখন জ্ঞান হবে। পুঁথীত কেবল রাস্তা দেখায়। জ্ঞান হয় নিষ্ঠার দ্বারা। নিষ্ঠা না হলে জ্ঞান হয় না। নিষ্ঠা তৎপরায়ণ হওয়া উচিৎ। তিনি এক পরিপূর্ণ আত্মা।

মনুষ্য শরীর অতি দুর্লভ। এই শরীরে যদি না হয় তাহলে আর কবে হবে ? আত্মা কখনো মরে না। এই শরীরে থাকতে থাকতেই যথার্থ জ্ঞান হওয়া উচিৎ।

প্রঃ—প্রবল ইচ্ছা বাধা দেয়।

দেঃ—সংসারে সুখ নেই। সংসারের সুখ ক্ষণিক। এই সবইত প্রতিবন্ধক।

প্রঃ—মহারাজ, কিছু হবেত ?

দেঃ—কেন হবে না ? অনেক জন্ম অর্থাৎ তিন জন্মে সিদ্ধ হয়।

মাঃ—হওয়া না হওয়ার কথা মনের থেকেই ওঠে। 'যা হয়ে যায়।'

এই মহামন্ত্র হরিবাবার বাঁধেও চলেছিল। একটি হল "যা হয়ে যায়"—আর আমি কি করতে পারি ? দ্বিতীয় হল "যা হয়ে যায় অথবা না হয়ে যায় সমান কথা।"

* * *

পরিচয় হওয়ার সম্বন্ধে মা বললেন—কোন সময়েও অপরিচিত ছিল না। ছিল না, এই কথাও সেখানে একটি আবরণই হল।

প্রঃ—আমরাত সেই অবস্থার কথা জানি না।

মাঃ—পরিচিত—অপরিচিত—কার সামনে বলতে যাবে ? সেখানেত ভাষাই নেই। চুপ থাকলেও চুপ না থাকলেত ভাষার সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রঃ—চিরস্পন্দিত কিন্তু নিঃস্পন্দিত।

মা—যা বল তাই। কোন গড়বড় নেই।

* * *

ভক্ত চার প্রকারের হয়। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আপনার দরবারে কত জ্ঞানী আছে ?

মা—তোমার কি মনে হয় ?

প্রঃ—আপনি বলুন।

মা—আমার বলা আসছে না।

প্রঃ—উত্তরত হলই না।

মা—যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানীকে চিনতে পারেন।

প্রঃ—যজ্ঞের সময় দেবতারা আসেন, তাঁদের দর্শন কি করে হয় ?

মা—স্বয়ং কৃপা করে দর্শন দিলেই দর্শন হয়।

প্রঃ—উপায় কি ?

মা—ধ্যান কর, পরে যাঁর দর্শন করতে ইচ্ছা হয় তাঁর ধ্যান কর।

প্রঃ—সমাধিতে কি পাথরের মত শরীর থাকে ?

মা—সমাধি লাগাও, জানতে পারবে। সমাধির জন্য চেষ্টা কর।

প্রঃ—কেউত নিদ্রাকেই সমাধি মনে করে।

মা—খেলে পেট ভরে, তার পেট খালী অথবা ভরা তা সে নিজেই বুঝতে পারে। বুঝতে পারলাম না আর তা সমাধি হল এ কখনো হতে পারে না। প্রশ্নই ভুল। ধ্যান করে আর জপ করে আনন্দ পাওয়া যায়। তাত স্বয়ং প্রকাশ। ওখানেত না জানায় কথাই নেই।

প্রঃ—পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি না।

মা—এর অভাব অবশ্যই জানা যায়। সন্তোষে থামা উচিৎ না।

প্রঃ—আর কোনোও উপায় আছে ?

মা—গুরু যা বলেন তাই উপায়।

* * *

মা দেবীগিরিজীর ঘরে এসে বসলেন। মা ওনাকে আরও কিছুদিন থাকতে আগ্রহ করলেন। মা বললেন—"তুমি যত থাকবে ততই লাভ।"

দেঃ—মার স্থানও খুব সুন্দর।

মা—(হেঁসে বললেন) শুয়ে শুয়ে, বসে বসে গঙ্গার দর্শন হয়। দর্শনে মহাপাপের ক্ষয় হয়।

দেঃ—হ্যাঁ, গঙ্গার দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। (এই বলে উনি সংস্কৃতের শ্লোক বলতে লাগলেন)।

মা—এই স্থানটিত গঙ্গার কোলেই।

ডাঃ ব্যাস—জল একেবারে নীচে।

২রা এপ্রিল ১৯৪৮ ঃ—

শ্রী দেবীগিরিজী মহারাজ অযোধ্যা যাচ্ছেন। মা ও অন্যান্য সব লোকেরা ওনাকে সহর্ষ বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। পরে মা বললেন "কেমন সুন্দর যোগাযোগ হল। কেউ কোথা থেকে, কেউ কোথা থেকে এসে গেল। যার সাথে যা যোগাযোগ হওয়ার ছিল হয়ে গেল। কি চমৎকার। দেবীগিরি বাবা পাহাড় থেকে নেমে নীচে এলেন, যাদের দীক্ষা হওয়ার ছিল তাদের দীক্ষা হয়ে গেল।"

———

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

৺অমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত

মহাপুরুষদের আচরণ অনুকরণীয় নহে

আমি। তোমার ব্যবহার হইতে তোমাকে ধরা বড় শক্ত। পূরণ যে রাত্রিতে মারা গেল সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা তাহাকে দেখিতে গিয়া বলিলে, "পথ্য খাও তাহা হইলেই শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইবে," ইহা শুনিয়া কে মনে করিতে পারে যে পূরণ সেই রাত্রিতেই মরিয়া যাইবে? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা, সে যদি ২।১ মাস বা ২।১ বৎসর পরে মারা যাইত তবেত তোমাদের মনে কোন সংশয় জাগিত না। ঐ রাত্রে সে মরিল

বলিয়া তোমরা এই কথা বলিতেছ, কিন্তু আমার কাছে ত সময় বলিয়া কিছু নাই। এক মুহূর্ত্তও যেমন বৎসরও তেমন। ধর না যে সময় আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম, ঐ সময় হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে শান্তি দিবার জন্য যদি ঐ কথা বলিয়া থাকি তবে কি ঐ কথার কোন অর্থ হয় না? যখন কোন কাজ করা হয় বা কোন কথা বলা হয় তাহার অনেক অর্থ থাকিতে পারে। কি উদ্দেশ্যে যে কখন কি বলি তাহা তোমরা বুঝিতে পার না। সেই জন্যই বলে যে মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিবে কিন্তু তাহাদের আচরণ অনুকরণ করিবে না। কারণ তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে অনেক দিক থাকিতে পারে, উহা ধরা শক্ত। কাছেই তাহাদের কার্য্য দেখিয়া বিচার করিতে গেলে ভুল হইবেই।

আমি। কিন্তু বিচার আসা স্বাভাবিক। আমারা ভগবানকে ত বিচার করিয়া নিবই।

মা। হাঁ, এগুলি অবস্থার কথা। এমন অবস্থা আছে যেখানে বিচার আসিবেই। এগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। সেইজন্য আমি বলি যে, যে যে অবস্থা হইতে যাহা বলিতেছে, ঐ অবস্থায় উহা সম্পূর্ণ সত্য।

কথায় কথায় মা আবার বলিতে লাগিলেন—কথায় বলে না যে মহাপুরুষদের বেতালে পা পড়ে না। অর্থাৎ তাহাদের কোন মিথ্যা ব্যবহার হয় না। অনেক সময় মনে হয় যে তাঁহাদের কথা মিথ্যা হইয়া গেল, কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা মিথ্যা নয়। আর বাস্তবিক পক্ষে সত্য মিথ্যা বলিয়াত কিছু নাই। সত্য মিথ্যা বলিয়া যাহা বলা হয় তাহাত জাগতিক দৃষ্টি হইতে; কারণ বস্তু যখন একটিই তখন আর উহাকে সত্য মিথ্যা বলিয়া ভাগ করা যায় কিরূপে? এ দেহের অনেক সময় এরূপ খেয়াল হইত যে এ দেহ হইতে কোন রূপ যেন মিথ্যা বাহির না হয়। সেইজন্য "ঐখান হইতে ঘটীটি লইয়া এস"—এরূপ না বলিয়া বলা হইত যে ঐখানে

যদি ঘটীটি থাকে তবে লইয়া এস। কারণ ঐখানে হইতে ঘটীটি লইয়া এস বলিলে যাহাকে ঐ কথা বলা হইবে সে যদি গিয়া দেখে যে ওখানে কোন ঘটী নাই তবে সে ত মনে করিবে যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া গেল। আবার এমন অবস্থাও আছে যখন যদি বলি যে ঘটীটি লইয়া আস, তখন সেখানে যদি কোন ঘটী নাও থাকে তবে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ঘটী সৃষ্ট হইবে।

গুরুচরণ এবং দীক্ষার ফলাফল

এই সব কথা যখন হইতেছিল তখন পণ্ডিত সুন্দরলালজী বসিয়াছিলেন। তিনি মাকে প্রশ্ন করিলেন, "কাহাকে গুরু করিতে হয়?" মা বলিলেন, "যাহার নিকট তোমার মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িবে, তাঁহাকেই গুরু করিয়া নিবে।"

পণ্ডিতজী—বিচার করিয়া দেখিলে কাহাকেও স্বরূপাবস্থায় স্থিত বলিয়া মনে হয় না। কতইত দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া মনে হইল না যে তিনি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, কাজেই বিচার না করাই ভাল।

মা। বিচার না করিয়া উপায় নাই। বিচার বা প্রশ্ন অভাব বোধ হইতেই উঠে। ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের অবস্থাই দেখ না, তাহারাও তাহাদের অভাব বোধ জানায়। ক্ষুধা পাইলে তাহারা 'হা' করিয়া দুধ গ্রহণ করে। আবার ক্ষুধা না থাকিলে তাহারা উহা গ্রহণ করে না। অভাব বোধ হইতে এই রূপে গ্রহণ বর্জ্জন শিশুকাল হইতেই চলিতে থাকে। শিশু যখন বড় হইতে থাকে তখন এটা কি, ওটা কি এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা তাহারা তাহাদের জ্ঞানের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করে। তারপর আসে যৌবন। তখন সৃষ্টি করার আনন্দ। আনন্দ হইতে সৃষ্টি হয় কিনা, ফুলের কুঁড়ির বেলায়ও সেইরূপ হয়। কুঁড়ি যখন ফুটিতে আরম্ভ করে তখন উহা ফুটিয়া ফুল হইবার জন্য যাহা দরকার তাহা রোদ বাতাস হইতেই সংগ্রহ করিয়া লয়। ভগবানকে জানিবার ইচ্ছাও অভাবরূপে দেখা দেয়। এইখানেই গুরুর প্রয়োজন।

সংসার পথে চলিতে যেমন গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়াই চলা হইয়া থাকে, ধর্ম্ম পথেও সেইরূপ। সেইজন্য দেখা যায় যে লোকে এক গুরুর কাছ হইতে অন্য গুরুর কাছে যায়। তারপর দীক্ষা। ইহাও অনেক রূপে হয়। এমন দীক্ষাও আছে, যাহা পাইলে সমস্ত অভাব বোধ চলিয়া যায়। কেবল যে অভাব বোধ চলিয়া যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে স্থূল শরীরও লোপ পাইয়া যায়। কারণ আমি দেখিয়াছি যে অনেক মূর্ত্তি এ দেহের কাছে আসিয়াছে এবং এ দেহ হইতে একটা কথা বা শব্দ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে।

আমি। তোমার নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়া যেমন সূক্ষ্মদেহী শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে।

মা। আমিত কাহাকেও দীক্ষা দেই না।

আমি। আচ্ছা, তোমার নিকট হইতে কথা বা শব্দ পাইয়া যেমন সূক্ষ্মদেহী শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে সেইরূপ স্থূল দেহধারীর পক্ষেও কি কখনও ঐরূপ হইয়াছে।

মা। (হাসিয়া) এ কথা এখন বলা আসিতেছে না। (সকলের হাস্য) আবার এমন দীক্ষাও আছে যাহার ফলে শিষ্য যে কিছু পাইয়াছে, তাহা অনুভব করিতে থাকে। অর্থাৎ গুরু তাহার ভিতর যে আগুন জ্বালিয়াছেন, তাহা জ্বলিতে থাকে। আবার এমনও হয় যে ঐ আগুন কিছুদিন জ্বলিয়া আবার নিভিয়া যায়। এই যে বলিলাম ইহার মধ্যেও কিন্তু অনন্ত রকমের অবস্থা থাকিতে পারে। আবার এমন দীক্ষাও হয় যাহার ফল শিষ্য কিছু উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু তাহা না পারিলেও গুরুর নির্দ্দেশমত সকাল সন্ধ্যায় তাহার কাজ করিবার জন্য পিপাসা জাগে। অন্য সময়ে অবশ্য সে আনন্দের সহিত সংসারের কর্ম্ম করিয়া যায়। অনেকের আবার পিপাসা লাগে না বটে কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় কাজটা করিয়া যায়। কেহ হয়ত কোন রকমে ঐ কাজটা সারিয়া ফেলে, হয়ত হাঁটিয়া হাঁটিয়াই আহ্নিকের কাজটা করিয়া ফেলে,

কেহ বা উহা একেবারেই ত্যাগ করিয়া বসে। এইভাবে কিছুদিন গেলে কোন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া কিম্বা কাহাকেও আধ্যাত্মিক কাজ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া সে আবার নিয়মমত কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে কিছুদিন কাজ করিয়া উহাতে কোন অনুভূতি না পাইয়া উহা আবার ত্যাগ করিয়া বসে। দীক্ষার পর এইরূপ নানা অবস্থা হইলেও মনে করিতে হইবে না যে ঐ দীক্ষা বীজ বা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বীজ ভিতরে থাকিয়াই যায় এবং এ জন্মে যদি কোন পিপাসা বা অনুভূতি নাও জাগে, পর জন্মে উহা জাগিতে পারে। গাছের বীজ যেমন অনেক সময় মাটিতে পচিয়া বা নষ্ট হইয়া যায়, দীক্ষা বীজ কখনও নষ্ট হয় না ; যদি সত্যই বীজের মত বীজ পড়ে। অনেকে আবার দীক্ষা এক-জনের নিকট হইতে পায়, শক্তি আরেক জনের নিকট হইতে পায়। এই শক্তি সঞ্চার করিতে দীক্ষার প্রয়োজন হয় না, দৃষ্টি দ্বারাও ইহা দেওয়া যায় এবং যাহাকে ইহা দেওয়া যায় যে কিছুই বুঝিতে পারে না, কৃপা এইরূপ নানাভাবে আসিতে পারে। আবার গুরু অনেক সময় বিপথগামী শিষ্যকে কষ্টের ভিতর দিয়া এই পথে টানিয়া আনেন। তাহাকে এমন বিপদ আপদের মধ্যে ফেলেন যে সে বাধ্য হইয়া "ভগবান রক্ষা কর"—এই কথা বলিতে থাকে। ইহাও ভগবানের কৃপা বুঝিতে হইবে। অনুগ্রহ এবং বিগ্রহ —এই দুই ভাবেই কৃপা আসিতে পারে। যাহা দশ জনম ভোগ করিতে হইবে গুরু বিগ্রহের পথে তাহা হয়ত দুই এক জন্মে শেষ করিয়া দেন। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই নানা প্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। (পণ্ডিতজীকে লক্ষ্য করিয়া) এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর হইল ত ?

পণ্ডিতজী। হাঁ।

এই কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১১৷৷টা হইয়া গেল। মা আহার করিতে উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

২০শে আষাঢ় সোমবার (ইং ৪।৭।৪৯) আজ সকাল বেলা যখন মায়ের

কাছে গিয়া বসিলাম তখন সেখানে চিঠি পাঠ করার পর্ব্ব চলিতেছিল। এক একটি করিয়া চিঠি মাকে পাঠ করিয়া শুনান হইতেছিল এবং উহার কি জবাব দিতে হইবে সে সম্বন্ধে মা দুই একটি কথা বলিতেছিলেন। মা খুকুনীদিদিকে বলিলেন, "তোরা চিঠিগুলি ভাগ করিয়া ফেলিস্, কতকগুলি চিঠি আছে যাহাতে প্রয়োজনীয় কথা কিছুই নাই। এ গুলি আমাকে পড়িয়া না শুনাইয়া মুখে বলিস। আবার কতকগুলি আছে যাহাতে প্রশ্ন আছে। এখানে কেবল প্রশ্নগুলি আমাকে বলিলে চলিবে। তবে অনেক সময় প্রশ্ন না থাকিলেও অনেকে মনের আবেগে অনেক কথা লিখে, এ গুলি অবশ্য পড়া দরকার।"

পৌরাণিক গল্পের অর্থ

ইহার পর অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। আমি মাকে প্রশ্ন করিলাম "মা, সমস্ত দেবতাই কি জ্ঞানী ?"

মা। এ কথা তোমাকে কে বলিল ?

আমি। এইরূপ আমি শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক উহা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে জ্ঞানী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পুরাণে তাহাদের সম্বন্ধে যে সব গল্প বলা হইয়াছে উহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া শিব পাগল হইলেন, ব্রহ্মারও আপন কন্যা দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ইহা হয় কেমন করিয়া ? দেবী ভাগবতে দেবতাদের যে সব গল্প আজকাল শুনিতেছি তাহাও এই জাতীয়। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে ইহাদিগকে অজ্ঞানী বলিয়াই মনে হয়।

মা। ইহার উত্তরও অনেক ভাবে দেওয়া যায়। একমাত্র তিনিই ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি অনন্তরূপে আছেন। অন্তর্ভাবে দেখিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহারা আলাদা। উহাদের আলাদা আলাদা মূর্ত্তি আছে, স্থান আছে এবং ক্রিয়া আছে, এই হিসাবে তাঁহারা যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন

তাহাও ঐ ঐ অবস্থায় হইতে পারে। তাঁহারা জ্ঞানী থাকিয়াও অজ্ঞানের মত কাজ করিতে পারেন এবং এই জন্য অনুতাপও করিতে পারেন। তিনি যখন এক হইয়াও অনন্তরূপে আছেন, তখন তাঁহার শক্তির খেলাও যে অনন্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? একটি বীজ হইতে গাছ হয় এবং উহাই অনন্ত গাছ, বীজ, ফলরূপে দেখা যায়। এক গাছের দুইটি পাতাও একরূপ নয়, দুইটি ফলও একরূপ নয়। এই সব ফল হইতেই যদি আবার গাছ হয়, তবে তাহাও একরূপ হইবে না। এই হিসাবে যাঁহাদিগকে আমরা দেবতা বলি তাহাদের মধ্যে শক্তির পার্থক্য আছে! কোন কোন দেবতা মুক্তি দিতে পারেন, জ্ঞান দিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ সব শক্তি আছে বলিয়াই ত তাঁহারা উহা দিতে পারেন। আবার অন্যান্য ছোট ছোট দেবতা ধন ইত্যাদি দিতে পারেন, কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না। তুমি যখন মহাদেবের কথা তুলিয়াছ এবং প্রশ্ন করিতেছ যে তিনি মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইলেন কেন, তখন সেই কথাই ধরা যাক্। তুমি দেখিতেছ মহাদেব এখানে অজ্ঞানীর মত ব্যবহার করিতেছেন। কাজেই তাঁহার জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহাও ত হইতে পারে যে মহাদেব মোহিনীরূপে হরিকেই দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাজেই দেবতাদের যে সব লীলা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে উহার অর্থ লোকে নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে নানাভাবেই করিতে পারে। জ্ঞানী একভাবে উহার অর্থ করিবে, অজ্ঞানী অন্য ভাবে করিবে। শ্রীকৃষ্ণের বেলাও দেখ না তিনি কতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং গোপিনীদের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার অর্থ বুঝা শক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াই তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্য বলা হয় যে বলবানের পক্ষে কিছুই দূষনীয় নয়। ভগবানের পক্ষে ৬০ হাজার গোপিনী থাকা সম্ভব। আবার অন্যদিক হইতে দেখিলে দেখিবে যে এগুলি তাঁহার শক্তি বই আর কি? যেখানে শক্তির ক্রিয়া আছে, সেখানে আকৃতিও আছে এবং সেখানে শক্তির বিষম্যও আছে। ভিন্ন

ভিন্ন খণ্ড শক্তি লইয়া ভগবান্ এইভাবে লীলা করেন। লীলাই যখন করিতে হইবে তখন উহা একভাবে হইতে পারে না, কারণ তাহাতে বিচিত্রতা থাকে না। সেদিন দেবী ভাগবতে শুনিলে না যে, যে সমস্ত শক্তি দেবতাদিগের মধ্যে ছড়াইয়াছিল, উহা একত্রিত হইয়া এক দেবী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল এবং তিনি অসুর বধ করিলেন। এ দেবীই বা কে? এত সেই তিনিই। তিনি খণ্ড-শক্তি রূপে দেবতাতে ছড়াইয়াছিলেন আবার তিনিই সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া একীভূত হইলেন। আর অসুর বা কে? এও ত তিনিই, তিনিই অসুর হইয়াছেন এবং তিনিই অসুর বধ করিতেছেন।

অনেক সময় লোককে দুঃখ কষ্টে হাহাকার করিতে দেখা যায়। উহা দেখিয়া কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে ভগবান্ নির্দ্দয় অথবা তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট হাহাকার দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারে না যে এই দুঃখ কষ্টও মঙ্গলের জন্য। ভগবান্ ধরা দিলেন বলিয়াই তিনি নিজকে এই হাহাকার রূপে প্রকাশিত করিতেছেন। যতক্ষণ লোক সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে একদিক ধরিয়া কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য প্রশ্ন উঠে ভগবান্ এ ভাবে সৃষ্টি করিলেন কেন? অন্যভাবে করিলেন না কেন? কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছামত সৃষ্টিটা যদি অন্য ভাবেও হইত, তবুও কিন্তু এ প্রশ্নের শেষ হইত না। ভগবানের যে সব লীলা বা কীর্ত্তি আমরা দেখিতেছি উহার প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝি না এবং বুঝি না বলিয়াই উহাকে নানাভাবে সমালোচনা করি। কিন্তু যখন পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন দেখা যায় যে কিছুর মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই। যতক্ষণ দুইটি থাকে, তখনই এই বিরোধ। এই দ্বৈতবোধ কাটিয়া গেলে কিছুই সামঞ্জস্য-বিহীন বা অর্থশূন্য মনে হয় না।

এইভাবে অনেকক্ষণ কথা বলিয়া মা বলিলেন, "এখন একটু পাঠের জায়গায় গিয়া বসি।" খুকুনীদিদি বলিলেন, "একটু শক্তির সঞ্চার করিতে বুঝি যাইতেছ?" উহা শুনিয়া মা হাসিলেন। মা গিয়া দেবী ভাগবত পাঠের স্থানে

গিয়া বসিলেন। আমরাও কিছুক্ষণ ঐখানে বসিয়া রহিলাম। দুপুর বেলা বাটুক দাদার সঙ্গে যখন দেখা হইল তখন তাহাকে বলিলাম, "দাদা, আজ পাঠের সময় আপনার কি অবস্থা হইয়াছিল ? ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন কি।"

বাটুক দাদা। ঘুমত রোজই পায়, কিন্তু আজ যেন সর্ব্বশক্তি দিয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। গত রাত্র মেয়েটার অসুখের জন্য ঘুমাইতে পারি নাই। তাই প্রতিক্ষণই মনে হইতেছিল যে ঘুমাইয়া পড়িয়া যাইব। আজ বুঝি আর দুর্নামের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় নাই। এমন সময় মা আসিয়া বসিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার মা আসিয়া বসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার তন্দ্রাভাব কাটিয়া গেল এবং আমি মায়ের কোলে বসিয়া আছি, আমার আবার ভয় কি—এই ভাবটা প্রাণে জাগিয়া উঠিল, ইহার পর তেজের সহিত শেষ পর্য্যন্ত পাঠ চালাইয়া গেলাম।

উপবীত ধারণের বিধি

২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার (ইং ৫।৭।৪৯)। আজ বেলা ১০টার সময় মার কাছে গিয়া বসিলাম। আজও সকাল বেলা হইতে চিঠি পাঠ এবং উত্তর লেখা চলিতেছিল। দুইজন সাধুকে মার কাছে বসা দেখিলাম। ইহারা যমজ ভাই এবং দুই জনই গেরুয়াধারী। উহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "তোমার মাথার ওটা কি ?" সাধুটি মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন যে তাঁহার উপবীতটি ঐভাবে আছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "স্নানের সময় উহা মাথায় রাখিয়াছিলাম, ভুলে ঐখানেই রহিয়া গিয়াছে।"

মা। পৈতাটা লম্বা কতটুকু ?

সাধু। ইহা লম্বা আছে, এখন ইহাকে ভাঁজ করিয়া রাখিয়াছি।

মা। খোল দেখি।

সাধুটি উহা খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মা। পৈতাকে এইভাবে গাঁঠ দিয়া রাখা দূষনীয়।

যখন উপবীতটি খোলা হইল, তখন দেখা গেল যে উহাতে মাত্র তিনটি তার।

মা। ঐ পৈতাতে মাত্র তিনদিন চলে। পৈতাতে অন্ততঃ ছয়টি তার থাকা দরকার ; কিন্তু নিয়ম হইতেছে নয়টি তার রাখা। তিনটি নিজের জন্য, তিনটি উত্তরীয় হিসাবে, আর বাকী তিনটি কোন ব্রাহ্মণের হঠাৎ পৈতা ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য। কাযেই নয়টি তারের মধ্যে নিজের জন্য ছয়টি। কেহ কেহ আবার বলে যে, এই ছয়টির তিনটি নিজের জন্য এবং তিনটি স্ত্রীর জন্য। যদি পৈতার মাত্র একটি তার ছিড়িয়া যায়, তবে সমস্ত পৈতাটিই ফেলিয়া দিতে হয়। এগুলি হইল পৈতা ধারণের সাধারণ নিয়ম। ইহার তত্ত্ব অবশ্য আলাদা। তোমার মাথায় জড়ান সূতা দেখিয়া আমার খেয়াল হইয়াছিল যে উহা পৈতা এবং উহা ঠিক নাই।

২২শে আষাঢ় বুধবার (ইং ৬।৭।৪৯)। আজ সকাল বেলা হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শেষ রাত্রিতে সামান্য একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, চারিদিকের পাহাড় কুয়াসা দিয়া ঢাকা। আজ দেবী ভাগবত পাঠ সমাপ্ত হইবে, ত্রিবেণীপুরী মহারাজ আজ খান্নায় রওনা হইবেন। আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদী এলাচ দিলেন। রাজাসাহেব আসিয়া পুরীমহারাজকে মাল্য অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দিলেন, সঙ্গীয় লোকদিগকেও বস্ত্র দান করিলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে বিশ্রামের যোগাড় করিতেছি এমন সময় আমার কন্যা সতী আসিয়া খবর দিল যে গোপীবাবুর পত্র পাইয়া মা আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে বলিয়াছেন। উহা শুনিয়া আমি তখনই মায়ের কাছে রওনা হইলাম। হেম (বন্দোপাধ্যায়) দাদা আমার সঙ্গে চলিলেন। মার ঘরে গিয়া দেখি যে ওখানে রাজা সাহেব, সুন্দর লাল পণ্ডিতজী, খুকুনী দিদি, স্বামী

পরমানন্দ প্রভৃতি আছেন। আমি মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, আচ্ছা গোপী বাবা বলে না যে কি একটা অবস্থা লাভ হইলেও পশুভাব যায় না। ঐ অবস্থাটির নাম কি ?

আমি। কৈবল্য অবস্থা।

মা। হাঁ, হাঁ, বাবাজী বলে যে কৈবল্য লাভ হইলেও পশুভাব যায় না।

পণ্ডিতজী। পশুভাব কি ?

আমি। অণুভাব।

এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইলে মা পণ্ডিতজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর মধ্যে বেশ একটা সরস ভাব আছে – যাহা দ্বারা বাবাজী সকলকে আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু দোষের মধ্যে বাবাজী সর্ব্বদাই একে 'পশু', ওকে 'মূরখ', 'গাওয়ার' ইত্যাদি বলে। আমার ধারণা বাবাজী ইচ্ছা করিলেই এ সব কথা ছাড়িতে পারে। তা'ই নয় কি ?"

পণ্ডিতজী। হাঁ, ইচ্ছা করিলে ত পারিই, কিন্তু সর্ব্বদা এ বিষয়ে কে ধ্যান দিবে ?

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে পণ্ডিতজী গায়ত্রী জপ করেন না অথচ পৈতা তাঁহার গলায় মালার মত ঝুলান ছিল। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "পিতাজী, তুমি যদি গায়ত্রীই জপ না করিবে তবে পৈতা গলায় রাখিয়াছ কেন ? উহাত এক গাছ সূতা মাত্র।"

পণ্ডিতজী। আমি কণ্ঠি ধারণ করিব।

মা। যখন কণ্ঠি ধারণ করিবে তখন। পৈতা রাখিয়াছ, এখন গায়ত্রী জপ করা উচিত।

মা এই কথাগুলি হাসিতামাসার ভাবেই বলিলেন ; কিন্তু ইহাতে কাজ হইল। পণ্ডিতজী কিছুক্ষণ তর্ক করিয়া শ্রীশ্রীমাকে কথা দিলেন যে তিনি আগামীকল্য হইতেই গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবেন।

ইহাও শক্তির খেলা না কি ?

অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। মা হঠাৎ রাজাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপরে যে কাট দিয়াছ, ইহা কোথাকার ?" এখানকার বাড়ী ইট পাথরের হইলেও উপরে টিনের চাল, বোধহয় শীতের সময় এখানে বরফ পড়ে বলিয়াই এরূপ করা হইয়াছে। উপরে টিন আছে বলিয়াই ঘরের ছাদ কাঠ দিয়া করা হইয়াছে। আমরা যে ঘরে থাকি, উহাও এইরূপ। মায়ের জন্য যে দালান করা হইয়াছে, উহার ছাদও কাঠের। কাঠ হইলেও ইহা দেখিতে খুব সুন্দর কারণ বার্নিস করার জন্য ইহা ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। রাজাসাহেব বলিলেন, "বাড়ীত কণ্ট্রাক্টার করিয়াছে কাজেই ঠিক করিয়া বলিতে পারি না যে কোথা হইতে এই সব কাঠ যোগাড় হইয়াছে। তবে মনে হয় যে এগুলি সোলনেরই কাঠ।" এই সব কথা শুনিয়া আমি ছাদের দিকে তাকাইলাম, ঘরের বিদ্যুতের আলোকে ছাদের কাঠগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, কিন্তু মায়ের খাট যেখানে পাতা ছিল উহার ঠিক উপরের দিকে ছাদের যে অংশটি আছে, উহার এক খানা কাঠ নাই। ঐ জায়গাটা কেন যে খালি রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একটু পরেই মা বলিতে লাগিলেন, "এ দেহ যখন ছোট ছিল, তখন একটি কাঠের বাক্স হইতে মাঝে মাঝে শব্দ বাহির হইতে শুনা যাইত। লোকে প্রথম প্রথম মনে করিত যে অন্য কোথাকার শব্দ বোধ হয় ঐ কাঠের বাক্সে প্রতিধ্বনিত হইত। পরে দেখা গেল যে ঐ বাক্স হইতেই মাঝে মাঝে শব্দ বাহির হয়। (হাসিয়া) হয়ত কোন শক্তির আবেশ ঐ বাক্সের উপর হইত!"

আমি। মা, তুমি এইমাত্র এই ঘরের কাঠগুলি কোথাকার একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন ?

মা। খেয়াল হইল তা'ই জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি। এই কাঠগুলি হইতে কোনরূপ শব্দ বাহির হয় নাকি ?

মা। (হাসিয়া) না। তবে আজ এক কাণ্ড হইয়াছে। ভোর রাত্রিতে উপর হইতে একখানা কাঠ আপনি খুলিয়া প্রথমে খাটের মশারির উপর সমানভাবে পড়ে। পরে মশারির উপর হইতে সোজা হইয়া মাটিতে পড়িয়া ধীরে ধীরে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়ে। এতবড় একখানা কাঠ পড়িয়া গেল, কিন্তু উহাতে খাটের কিংবা মশারির কোন ক্ষতি হইল না।

মা এই কথা বলিলে রাজাসাহেব আমাকে কাঠখানা দেখাইলেন। কাঠখানা লম্বায় তিন হাত এবং পাশে আধ হাত হইবে। উহা পুরুও প্রায় আধ ইঞ্চি হইবে। হাত দিয়া ধরিয়া দেখিলাম কাঠখানার ওজনও বেশ। এত উচু হইতে এই কাঠখানা খাটে মশারি টাঙ্গাইবার সরু দণ্ডের উপর পড়িল অথচ ঐ গুলির কোনই ক্ষতি হইল না, শেষে আবার যে ভাবে আসিয়া মায়ের পায়ের উপর পড়িল, সে ভাবে পড়া খুবই আশ্চর্য্যজনক। যে সকল পেরেক দ্বারা ঐ কাঠখানা অন্য কাঠের সহিত যুক্ত ছিল সেই সব পেরেকও কাঠে লাগিয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহা বাঁকাইয়া গিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় কেহ যেন কাঠখানা জোর করিয়া টানিয়া বাহির করাতেই পেরেকগুলি বাঁকা হইয়া কাঠের সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে। আমাকে অবাক হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহাও শক্তির খেলা নাকি ?"

২৩শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার (ইং ৭।৭।৪৯)। যে ব্রতের অঙ্গ হিসাবে রাজাসাহেব এই দেবী ভাগবত পাঠ করাইলেন তাহাও আজ শেষ হইবে। সেইজন্য আজ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু আজ সকালবেলা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দিক কুয়াসাতে আচ্ছন্ন। চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় যে আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, শুধু এই স্থানটুকুই জাগিয়া আছে আর সবই যেন জলপ্লাবনে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সকালবেলা যখন জলযোগ করিয়া মার কাছে গিয়া বসিলাম মা দুর্য্যোগ লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কাল খেয়াল হইয়াছিল যে আজ ইহারা (অর্থাৎ রাজা

সাহেব) উপবাসী থাকিয়া যজ্ঞপূজা ইত্যাদি করিবে, তাই আজ বৃষ্টি হইলে মন্দ হয় না, কারণ গরমের মধ্যে যজ্ঞ ইত্যাদি করা কষ্টকর।"

যজ্ঞ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান অতি সুন্দরভাবেই সমাপ্ত হইল, সব কিছুই রাজোচিতভাবে অনুষ্ঠিত হইল। এবার আমাদের সোলন ছাড়ার পালা আসিল। ঠিক হইল মা সোলন হইতে দিল্লী হইয়া কাশী যাইবেন।

(পঞ্চমখণ্ড সমাপ্ত)

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(১২)

জীবন-পথে উপর পানে তাকায় যদি কেউ, খোলা আকাশ ধরা দিতে আড়াল রাখেন না। আর খোলা আশ্রমেরও দুয়ারখানি। হেঁটে-হেঁটে হাঁটা ক্ষয় হলে, সেই মুক্তদ্বারে পৌঁছনো গেল।

ঠিক যেখানে পথে-চলার রিকশা মোটর থেমেছে, ঠিক তখন থেকে ফোটা-ফুলের মেলা। দ্বারপ্রান্তে আসন পেতে মালার পসরা। নানা জাতের নানারঙের ফুল প্রবেশ-পথে পূজার আলো জ্বেলে রেখেছে। সেই আলো প্রাণে মেখে ভিতর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

---

* এই রচনায় উদ্ধার-চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং মায়ের উক্তি।

মা যেখানে আসেন সেখানেই এ দৃশ্য। তিনি যেন এই পুষ্পরথেই আসেন।

কান্তবাবু বললেন, কী করে যে এরা সংবাদ পায়, এই ফুলের, পসারীরা! কিন্তু পথ চিনে হাজির হয় ঠিক। লাভ যথেষ্ট হয়।

বললাম, যথা ইষ্ট, লাভ সেখানে হবেই। ফুলের যে আলোর দিকে দৃষ্টি রেখে ফোটে, তাই মায়ের তাই মায়ের উদ্দেশ পেতে ওদের পথ-ভুল হয় না।

শুনে কান্তবাবু ভুরু বাঁকালেন। বললেন, তুমি এই সব দেখছ নাকি?

বললাম, দেখছি। কতো রঙের ফুলের মেশামিশি! রুদ্রাক্ষ পরা গ্রীবার সঙ্গে কণ্ঠি-পরা গলার গলাগলি। গেরুয়া-কৌপীনের গা ঘেষে খাস্ সাহেবী স্যুট্ আছেন বসে। তান্ত্রিকের রক্তবাসের পাশে ইউরোপ-তনয় ব্রহ্মচারীর শুভ্র চাদর। জাতি বর্ণ ভাষা সাধন সব আলাদা, কিন্তু মায়ের সামনে কাউকে বুঝতে কারও অসুবিধে নেই। এক-সূত্রে গাঁথা হয়েছে সহস্র জীবন। সমগ্রের মধ্যে কে খ্যাত, কে অখ্যাত, কে বৈষ্ণব কে শাক্ত, সে নাম-ধাম খণ্ড-পরিচয় তুচ্ছ হয়ে গেছে। বহুর মধ্যে দেখা দিয়েছেন এক, বিরোধের মধ্যে অবিরোধ।

"এ শরীরের নিজস্ব বলিয়া যদি কিছু বলিতে চাও, তবে জগৎময় সবই নিজস্ব।"

কান্তবাবুকে বললাম, আশ্রমও আজ আনন্দময়ী জননী। মা-যশোদা দুয়ার খুলে রাখালদের জন্য বসে আছেন। সবারই তিনি মা-যশোমতী।

কিন্তু কান্তবাবুর লক্ষ্য ছিল, প্রথম কাজ প্রথম সারার দিকে। বললেন, ঐ যে, ওখানে মায়ের ছবি বই সব পাওয়া যাবে, চলো।

তীর্থে গেলে তীর্থবারি শিশিতে আনলে তবে তো তীর্থ-ধর্ম হয়। আশ্রমে এলে মায়ের ছবি বই তার নেওয়া চাই। নেওয়া হয়ে গেলে বললেন, তুমি হয়তো এসবের মূল্য তেমন মানো না।

বললাম, মানি তো।

"আপন স্বরূপ—আপনাতে আপনিই। যে মনে যা নিজ লক্ষ্যে মেনে চলা যায়। সেইটি ধরে চলতে হয় ত।"

বললাম, কাগজের পর কালি দিয়েই ছাপা, কিন্তু যখন তা মায়ের কথা—তা হয় মাতৃবাণী। যখন তা মায়ের ছবি, তা হয় মাতৃরূপ। সাধারণ কাগজ মহারাণীর ছাপ মেখে হয় হাজারটাকার নোট, তার মহামূল্য জানি। তাই মানি।

কিন্তু তারপর সেই মহামুল্য হাতে নিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতবড় আশ্রম। আনন্দধারা বইছে সর্বত্র—যজ্ঞশালায়, দোলমঞ্চে, নাট-মন্দিরে, জপকুঠিতে। যে সাগরের উদ্দেশে এত ধারা, তিনি কোথায়? কোথায় পাব মাকে?

মহামূল্য হাতে নিয়ে আনন্দের হাটে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখছিলাম আনন্দজী একাই এক-শ' হয়ে সর্বঘটে আছেন। ঘুরছেন। কান্তবাবু বললেন, ওকে ডেকে শুনি।

'ওর মুখে ভাষা নেই, উনি এখন মৌন রাখছেন।' সংবাদটা যিনি দিলেন তিনি চোখে পড়ার মতো একটি মানুষ। স্মিতমুখে রাশীকৃত শালপাতা মাটিরগেলাস ধুচ্ছিলেন। একটা ভারী ত্রিপলও নাটমন্দিরে দিয়ে এলেন দেখলাম। মা করাচ্ছেন ভেবে করছিলেন, নইলে বেশবাসে চেহারায় তার আভিজাত্য গোপন ছিল না।

কান্তবাবু তাকেই বললেন, মায়ের দর্শন কোথায় পাব বলতে পারেন? যজ্ঞশালায় বিশেষ আয়োজন দেখছি, মা কি তবে ওখানেই?

মানুষটি বললেন, মা ওখানেও থাকবেন বলছেন। মা নিজে যজ্ঞে উপস্থিত থেকে বৈদিক কর্মকাণ্ড নিয়মনিষ্ঠায় করলে আজও বেদপুরুষের প্রতিশ্রুত ফল পাওয়া যায় তা দেখিয়ে দেন। অবশ্য মায়ের আসন স্বতন্ত্র আছে।

তা'হলে চলো ওখানে, কান্তবাবু বললেন।

বললাম, ঐ যজ্ঞস্থলে আমরা প্রবেশ পাব কেন? কোনদিন কি স্বর্গ-কামনায় যাগযজ্ঞাদি করেছি, না ওর কিছু জানি!

মানুষটি একথা শুনে দাঁড়ালেন। বললেন, যুগের বদলে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড বিরল হয়েছে। মধ্যযুগ থেকে ভক্তিপথের যাত্রীই বেশি, তাই নাটমন্দিরে দেখতে পাচ্ছেন ভিড়—আজ 'পাঠ' হচ্ছে নারায়ণজীর। মা আসবেন ওখানেও, অবশ্য মায়ের আসন স্বতন্ত্র আছে।

বললাম, যজ্ঞ পাঠ জপ সবেতেই মা আছেন, আবার তিনি 'পরম স্বতন্ত্র।'

কান্তবাবু বললেন, নাটমন্দিরের ওরা যে এধার-ওধার চাইছেন। চোখের সামনে মা থাকলে এমন হয় না। মা জপকুঠিতে নয় তো?

বলেই কিন্তু বিমর্ষ হলেন। বললেন, ওখানেও দর্শনলাভ হয়। কিন্তু জপের মালা আজও করিনি। হাতে জপ রাখব কি, হাতজোড়া কাজ লেগে আছে। কি নিয়ে জপকুঠিতে যাব!

সহসা কান্তবাবু সমুখের মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো মায়ের দর্শন পান, নিশ্চয় পরশনও মেলে, তাই না?

মানুষটি বললেন, তা আশ্রমের বিধান। যজ্ঞের হোতা, মন্দিরের পূজারী, ভাগবতের পাঠক, জপকুঠির জাপকের সঙ্গে তাঁর কর্মের কর্মীদেরও মায়ের সামনে ডাক পড়ে। মায়ের 'নিজের-কাজ' কিছু নেই, তবু মায়ের-কাজ বলে যারা করেন, তাদের কাজ বলে দিতে মাকে দর্শন দিতে হয়।

মায়ের-কাজ ভেবে নিষ্কাম হয়ে কাজ কবে করেছি! কান্তবাবুকে বললাম, আশ্রমের সবটাতেই মা আছেন। কথা হচ্ছে, আমরা তার কোনটাতে আছি। এ যে আশ্রম, একটা নিয়ে তো থাকতে হবে।

মায়ের আশ্রমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একই ক্ষণে বৈদিক কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ, ধ্যান-জপাদি জ্ঞানমার্গ, নিস্কাম কর্মযোগ, পুরো অধ্যাত্মরাজ্য যেন পর্যটন করে

এলাম। মা কোনট লোপ করতে আসেন নি, সবটা সার্থক করতে তাঁর আসা, পূর্ণরূপা ব্যবস্থাও পূর্ণ রেখেছেন, তবু প্রবেশের সাধ্য পেলাম না।

খেয়ানৌকা না পেয়ে নদীতীরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিকালে ছায়া আসছিল অঙ্গনে। হতাশার ছায়া আসছিল মনে। কান্তবাবু বললেন, দেখেছি ভিড়ে হারানো ছোটদের কেউ মায়ের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মা যেন নিজেরই হারানো সন্তান ফিরে পান এমন আনন্দ করেন, আদর করেন, প্রসাদ দেন, তারপর তার আপনের হাতে তুলে দেন।

কান্তবাবু যেটুকু বলতে পারলেন না, সে তার দীন একটু আশা, মুখে ফুটে তা যায় না কাউকে বলা।

তাকে বললাম, আশ্রমের ভূমি বলে এইকথা। নইলে মা বলেছেন—"যারা কিছু করতে অক্ষম, ধর্মজীবনে কোন সহায় যাদের নেই, সবচেয়ে বেশী তাদেরই আমার প্রয়োজন।"

নাটমন্দিরে যে ভক্তেরা উঠছিলেন তাদেরই দলের সঙ্গী হওয়া গেল। কিন্তু ভিতরে গিয়ে চোখ তার আবার কপালে উঠল। বললেন, মায়ের আসনের চারিপাশ যে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, তা দেখেছ?

বললাম, ও আশ্রম-জীবনের বিধি-নিষেধ। এখানকার অনুশাসন মেনে শনৈঃ পন্থায় এগোলে যখন সুমুখ জুড়ে যারা, তারা সরে যাবেন, যারা পিছনে দাঁড়িয়ে তারা পিছনে রবেন, তখনই আপনার পালা সামনে ইষ্টদর্শনের। আশ্রমে আশ্রমরীতি।

কান্তবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, দেরি হলে মায়ের দর্শন না যদি মেলে, মা অতক্ষণ না যদি বসেন—ভিড় যে বড় বেশী।

বললাম, ভিড়ই তো হয়; মায়ের দিকে এগোতে গেলে এতো সামনের ভাবনা, পিছনের চিন্তা, এত কামনা-বাসনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দাবিরাই যে ভিড় করে আসে।

তিনি বললেন, না না, এরা মনের ভাবনা-চিন্তা হবেন কেন। অনেক-কেই আমি চিনি, আপন বলেও জানি।

বললাম, আপন ভাবনা জানি বলেই তো অস্বীকার কাউকে করতে পারিনে, ফেলে এগোতে পারিনে, যেখানে আছি সেখানেই থাকি।

কিন্তু পরশন পেতে হবে, তার কি উপায়!

উপায় "পিপাসিত জনের যেমন জল ভুল হয় না, সেইরূপ ঐ লক্ষ্যে নিজেকে জাগ্রত রাখার কেবল চেষ্টা।...রাস্তা লম্বা কি ছোট এ প্রশ্ন মনে স্থান দিতে নেই।"

ভিড়ের উৎস তিনি, সবারই তিনি মা। তার প্রমাণও মিলল। যারা যজ্ঞে ছিলেন, যারা 'পাঠ' শুনছিলেন, যারা বিগ্রহের কাছে পূজা দিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সবাই নিমেষে এগিয়ে এসে মায়ের আসনের বেড়া ঘিরে দাঁড়াতে লাগলেন। সুমুখে যারা বসেছিলেন তারাও উঠে দাঁড়ালেন। দর্শনার্থী চোখের সামনে দর্শনার্থীদের এক দেয়াল যেন উঠে দাঁড়াল। ওপাশে মায়ের আগমন বোঝা গেল, তাঁকে দেখা গেল না।

কান্তবাবু বললেন, দেখছ তো চেয়ে?

বললাম, চোখ ফোটা থেকে দেখছি। আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরাই। আমার চোখ যে ঢেকেছে সে আমিই।

কান্তবাবু এগোতে গিয়ে যার গায়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি রুষ্টমুখে ঘুরে দাঁড়ালেন। শঙ্কার কারণ দেখা দিল।

কারও কপালে কিছু লেখা থাকলে, তা তার অ-দৃষ্ট। কান্তবাবুর কপালে দেউড়ির সেই ধূলি অদৃষ্ট তিলক হয়েছিল। রুষ্টমূর্তি তাই দেখে বললেন, মশায় বুঝি বৈষ্ণব, এমন গায়ে পড়ে বিনয়।

তাকে শান্ত করতে আমি তাড়াতাড়ি মায়ের-কথা বললাম: "এ শরীরের তো ভেদ-দৃষ্টি নেই, মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে। অনেক আশ্রমে

বলা হয়েই থাকে 'সেইখানকার বিধিনিষেধ যদি মানতে পারো—থাকো, নয় অন্যত্র যাও।' এ শরীরের নিকট সে প্রশ্ন নেই।" ধর্মার্থী মাত্রেই এখানে আসতে পারেন।

এবার তিনি আমার পরে সদয় হলেন। বললেন, এমন করে মায়ের কাছে যেতে চান, আপনি বুঝি খুব ধার্মিক ?

কথাগুলি প্রিয় নয়। কিন্তু চমকে উঠলাম অন্য কারণে। নিজে কোনদিন নিজেকে এ প্রশ্ন করার কথা মনে আসেনি। সামনের মূর্তি মনে ঢুকে প্রশ্ন করে চলল—মায়ের পরশ চাই, কিন্তু আমি কি ধার্মিক ?

যাকে ধর্ম-অন্ত-প্রাণ বলে, তা আমি নই। সাধু-সন্ত নই। কালী, কৃষ্ণ বা শিবদর্শনে এখানে এসেছি তা নয়। এমন কি, কোন মহাত্মা-দর্শনে আসার বোধও নেই। অসহায় এক অভাগা দুহাত বাড়িয়ে প্রাণের মধ্যে তাকে পেতে চাইছি যার মধ্যে দেখেছি আমার নির্ভয় আশ্রয়। পেয়েছি আমার মধ্যে আমারই এক গভীর ব্যাপ্তির আস্বাদ।

বললাম, মায়ের কাছে যাব, ধর্ম-অধর্মের কথা আসে কোথায়।

অন্তরের সেই মূর্তি বলল, তুমি যে 'মা' বলো, তুমি ছেলে হলে কবে ? আসছ তো অনেকদিন !

পাশের এক ভক্ত ঠিক এই কথাই বললেন, আপনার চেহারা যেন চেনা। মাকে বুঝি অনেকদিন থেকে জানেন ?

বললাম, আমি যতদিন মাকে জানি, নিশ্চিত জানি—তিনি আমাকে আরও অনেক বেশীদিন জানেন।

সমুখের বক্রমূর্তি একপ্রস্ত হেসে বললেন, তা'হলে মা-আনন্দময়ী আপনার মতো মহাত্মার বিশেষভাবে খোঁজ-খবর রাখেন। হয়তো সেই জন্যে এসেছেন।

পরিহাসে না টলে বললাম, মা আসেন দেখতে পাই, আবার চলেও যান। চিরদিন কেন পাই না, আজও তাকে অতিথি করে রাখলাম।

মহামান্য লোক দেখছি যে! ভারতজোড়া সাধু-মহান্ত রাজা-মন্ত্রীদের আহ্বান ফেলে মা আপনার অতিথি!

বললাম, সংসারে সকল ঘরের নিজে কর্তা সেজে, শুধু ঠাকুরঘরের অতিথি-ভবনে মাকে রেখেছি, সংকটে পড়লে দুঃখ জানাবার আছেন একজন করে। আপন করে নিতে পারিনি।

"এই মেয়েটিকে পর ভাব কেন? একটু আপন করে নাও।"

কান্তবাবু বলে উঠলেন, মাকে কাছে পেয়েই যে দর্শনার্থীরা গোল বাধাল। ভিড়ের চাপে মা মন্দিরে চলে গেলেন। কেন দেরি করলে বিচারে জড়িয়ে পড়ে!

বললাম, এ আশ্রম যে। এর কোলের বিচার-মীমাংসারা আমায় ছাড়বে কেন।

তিনি বললেন, তাতে এই হোল—মা সবার কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন। মন্দিরে প্রবেশ নেই এটা তো ঠিক।

বললাম, তবু যা ছিল শুধু অনেকের ভীড়, তার মধ্যে এক এলেন। মায়ের দেখা মিলল। এখন বাইরে ভিতরে সবার মধ্যে আছেন।

"তোমাদের আসা-যাওয়ার বুদ্ধি আছে বলেই তোমরা বলছ যে এই শরীর এদিক ওদিক যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এ শরীর সকল সময়ে সকল অবস্থায় একই ভাবে রয়েছে।"

কান্তবাবু বললেন, চেয়ে দেখ—এবার শাস্ত্রীমশায় বিগ্রহকে মা, আবার মাকেই বিগ্রহ ক'রে পূজারতি আরম্ভ করেছেন, কী সুন্দর।

দেখলাম, মন্দিরে যার পূজা হচ্ছে তাকে জানিনে, জানতে হবে। মন্দির যাকে দূরে নিল তাকে জানি, তাঁর প্রসাদের পেয়েছি আমরা স্বাদ। তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আবৃতি করছেন শাস্ত্রীমশায়, ধোঁয়ায় সব ধোঁয়াটে করে

দিয়ে। মায়ের হাসি, মায়ের কথা ঢেকে ফেলছে কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাক চড়া সুরে আপন আপন বাজনা দিয়ে। মূল ছাপিয়ে টীকা-ভাষ্য বাজছে শতগুণ।

দর্শনার্থীদের চোখে-মুখে ভরা নদীর গভীর প্রশান্তি।

সেই শান্ত শোভায় সহসা জোয়ার এল। মায়ের অনতিপূর্বে ছেড়ে-যাওয়া আসনপরের পত্র-পুষ্প লাভের আশায় ভিড়ের একাংশে দোলাদুলি আরম্ভ হয়েছিল। আরতিশেষে পঞ্চপ্রদীপের শিখা এলে সমাবেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত শিখা স্পর্শের আশায় অশান্ত হয়ে উঠল।

কান্তবাবু বললেন, ঐ আগুনের পরশমণি। অগ্নিশুদ্ধ হলে খাটি সোনা হওয়া যায়—তুমি যাবে না কেন, মা তো নিতে না বলেন নি?

বললাম, নিতেই হবে মা-আনন্দময়ী তা'ও বলেন নি। তাঁর আর আমার মধ্যে কোন আচার-অনুষ্ঠানকে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে দেব না।

আমার কাছে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, মন্তরে নয়, অন্তরে তিনি আপন। মায়ের সঙ্গে লৌকিক পরিচয় না-ও যদি থাকে, তবু তাঁর আর আমার মধ্যেকার সম্পর্কটি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। তা কোন ধর্মাচার বা বিধি-বিধানের মধ্যে নিহিত নয়।

কান্তবাবু বলতে লাগলেন, ঐ, হোমের ফোঁটা দিচ্ছে কপালে। ঐ, নির্মাল্যের ফুল-বেলপাতা দিচ্ছে যে,—চলো।

বাইরে মুখ ফিরিয়ে দেখি, অস্তসূর্য গাছপালার পত্রে-পুষ্পে সোনা ঢেলে দিয়ে হাসছেন। মায়ের হাসি। মাথা নেড়ে বললাম, তিনি দেখছেন চেয়ে, তা দেখতে পাচ্ছি যে! নৌকোর গুণ ধরে যিনি আশ্রমে এনেছেন, হালের বৈঠা তাঁর হাতে আছে।

শিখার স্পর্শ, হোমের ফোঁটা নির্মাল্য—আগে কে নেবেন তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। সঞ্চয়-স্পৃহায় প্রসাদও বিষয় হ'লে, মা মন্দিরের ভিতরপথে

উপরে চলে গেলেন। শুনে দর্শনার্থীর ভিড় নাটমন্দির থেকে ধেয়ে নামতে লাগল, অঙ্গন থেকে আবার দর্শনের আশায়।

বোশেখের তৃষিত আকাশে মেঘ এসেছিল, ঝোড়ো হাওয়া ওঠায় মেঘ সরে গেল।

কান্তবাবু কালো মুখে বললেন, শেষে আশ্রমও এমন শিক্ষা দিল।

বললাম, আশ্রম শিক্ষালাভের স্থান, সুশিক্ষাই দিল।

কী শিক্ষাটা হোল, শুনি।

শেখাল যে, এই পুরীতে মা আমাদের সঙ্গেই আছেন, মাঝে সোপান-শ্রেণীর ব্যবধান। হোতা, পাঠক, পূজারী, জাপক- কর্মী যাকে তিনি ডাকবেন সেই পারবে সোপন পথে উঠতে। অন্য পথ নেই।

শঙ্কার ছায়ায়, সন্ধ্যার ছায়ায় কান্তবাবু আঁধারমূর্তি। বললেন, মা টেনে এনেও কাছে নিলেন না, পাছে অপরাধ যা করেছি তা ক্ষমা করতে হয়। পথে পথে বেড়াই তাতে মায়ের ক্ষতি নেই।

বললাম, আপনারও ক্ষতি নেই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন।

"আমি যে সর্বদা তোদের সঙ্গেসঙ্গেই আছি। তোরা দেখতে চাস্ না, আমি কি করব ?"

আমার বলা শেষ হয় নি, শিশুকণ্ঠ কেঁদে উঠল—মা, মাগো! ভিড় ভাঙছিল, সেই ছুটোছুটির মধ্যে কোন জননীর কোলের ছেলে তার মাকে খুঁজতে কেঁদে উঠল—মা, মাগো!

সজাগ হয়ে উঠলাম। ভিড়ে কার বাছা বুঝি তার মাকে হারাল! না, ঐ তো তার মা বলছেন—ভয় কি, অমন চেঁচিয়ে ডাকছ কেন? আমি কি দূরে গেছি, সারাক্ষণ তো কোলে করেই আছি।

কান্তবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক্, ওর মা ওকে বলছে। কিন্তু গলার স্বর কেমন যেন আশ্চর্য লাগল ; না ?

তার কানেও তা'হলে ধরা পড়েছে।

আমি কান পেতেই রইলাম, চোখের পলক পড়ল না, সর্ব-অঙ্গ ভারী হয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—মায়ের কণ্ঠস্বর আমি চিনি। এযে হঠাৎ শোনা সেই কণ্ঠস্বর।

কান্তবাবু বললেন, মা নীচেতেই ছিলেন না তো? পেছনে?

"পিছনেও থাকি, সামনেও থাকি, ডাহিনেও থাকি, বামেও থাকি, উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে থাকি, আবার উপরেও থাকি, নীচেও থাকি!"

কথাগুলির অর্থ-অর্থময় হয়ে উঠতে লাগল।

পুকুরের পূর্বদিকে তখন চাঁদ উঠছিল।

(ক্রমশঃ)

সত্যই কি মা বড়লোকের মা?

শ্রীবগলাচরণ বসু

দিল্লীবাসীর পরম সৌজন্য যে পর পর দুই বৎসর শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃপা করে উপস্থিত থাকলেন। এবার এসেছিলেন ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীগোপাল স্বরূপ পাঠক মহাশয়ের নবনির্মিত গৃহে (১৪ই-১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সন)। আশ্রমে অনুষ্ঠিত ৺সরস্বতী পূজাতেও শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন "ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী"রূপে। তাই ভক্তরা সুযোগ পেয়েছিল শ্রীমার পবিত্র সান্নিধ্যে বলতে—

ঐঁ ঐ ঐ ইষ্ট মন্ত্রে কমল ভব মুখাম্ভোজ ভূতি স্বরূপে,
রূপারূপ প্রকাশে সকলে গুণময়ে নির্গুণে নির্ব্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাত তত্ত্বে,
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবর নমিতে নিষ্কলে নিত্য শুদ্ধে

গৃহে নিত্যকর্ম ও ব্যক্তিগত পূজা সেরে সামাজিক দায়িত্ব মানে বন্ধুর গৃহে ৺সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলেছি আশ্রমের দিকে, বেলা প্রায় ১১টা। আশ্রমের প্রবেশ পথে অগণিত মোটর গাড়ী ছোট বড় দেশী বিদেশী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ; কোনটা মালিক-চালিত কোনও টা বা চালক-চালিত। সরু রাস্তায় ট্যাক্সি স্কুটারও আসাযাওয়া করছে। দেরী হয়ে যাওয়াতে একটু দ্রুতই আশ্রমে প্রবেশ করতে যাচ্ছি—কানে এলো দুটা মধ্যবয়সী মহিলার আলাপ—একজন আর একজনকে বলছেন "বড় লোকের মা" ; নিশ্চয়ই অভিমান। এই অভিমান শুধু ওদের দুজনের নয় অনেকের হয়েছে অনেক দিন থেকে। শ্রীমার কৃপায় মন ও মাথা নূয়ে পড়ল সমস্ত বড়লোকদের পদ-তলে ; বার বার তাঁদের করলাম প্রণাম। অস্ফুটস্বরে মন বলে উঠলো —এত বড়লোক আছেন বলেই ত ঐ দিব্যশরীরকে দেখতে পাচ্ছি চর্মচক্ষুতে, শুনতে পাচ্ছি তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, দেহ পবিত্র হচ্ছে শ্রীহস্তের করুণাময় স্পর্শে লাভ হচ্ছে "জাহ্নবী চরণোদকম্।" বড়লোকেরা শ্রীমাকে রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়ে বা নিজেদের গাড়ীতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে আসেন ; তাঁরা আরও বড়লোক হউন, জেট্ প্লেনে করে, হেলিকপ্টারে করে যেন শ্রীমাকে নিয়ে আসেন, আর আমরা দর্শন করে হই কৃতকৃতার্থ ; সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন, ত কৃপা ব্যতীত হয় না, আর 'যোগমৈশ্বরম্" দেখতে হলে অর্জ্জুনের মত শিষ্যের প্রয়োজন হয়েছিল দিব্যচক্ষুর। সঞ্জয় দেখতে পেয়েছিলেন গুরু ব্যাসদেবের কৃপায়। বড়লোকেরা নিয়ে আসেন শ্রীমাকে তাঁদের রথে চড়িয়ে তাঁরাই শ্রীমার রথ স্থাপন করেন "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে"—দুই পক্ষের প্রবল অরিদের

মধ্যে যত দ্বন্দের, সুখ দুঃখের, বিদ্যা অবিদ্যার ভক্তি পরাভক্তির জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্য বিন্দুতে। তাই বড়লোকের চরণে প্রণাম 'ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম।"

সত্যই কী মা "বড়লোকের মা?" যে তথাকথিত পাগল সাধারণ একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের অবগুণ্ঠিতা কুলবধূকে মাতৃ-সম্বোধন করেছিলেন সেই হরকুমার জাগতিক অর্থে কি বড়লোক ছিলেন? তিনিই দিয়ে গেছেন 'মাতৃমন্ত্র"। 'মা' ডাক জগতের আদি মন্ত্র, যা প্রসূতি-আগারে অস্ফুট স্বরে 'ওমগা ওমগা' করে শিশুর মুখে ফোটে; সেখানে কী বড়লোক গরীবের প্রশ্ন আছে? ঐ শব্দ এক ভাবেই ফোটে। মহাকাল বিরচিত স্বরূপাক্ষ স্তোত্রে "মাতর্যুষ্মদ চরণ যুগল ধ্যান নিপুণঃ" বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তারাই কি সাধারণ অর্থে বড়লোক? এই মাতৃ শব্দ বৈয়াকরণরা বলেন 'মা' শব্দের সাথে তৃচ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে,—অর্থ যিনি মাপেন যিনি মেপে দেন। শিশুর কতটুকু দুধের প্রয়োজন তা ফিডিং বোতলে দাগ কাটা থাকলেও মাকেই মাপতে হয়। নইলে শিশুর বদহজম হতে পারে। শিশুর সেই জ্ঞান বা বোধ থাকে না। শ্রীমা মেপেই সবাইকে দিচ্ছেন যার যতটুকু দরকার। যার গাড়ীর দরকার তাঁকে গাড়ীই দিচ্ছেন আর সন্ন্যাসের যার দরকার তাকে দিচ্ছেন গেরুয়া। তিনি যে "ভোগ স্বর্গাপবর্গদা"—জাগতিক 'ভোগৈশর্য্যই'ত তাঁরই দেওয়া। কে কত ধনী? "যে ধনে হইয়া ধনি মনিরে মানে না মনি" তাঁর সন্তানকে মা সেই ধনেই ধনী করতে চান। সেই পথে চালিত করবার জন্যই ভবঘুরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন আসমুদ্র হিমাচল এই ভারত-ভুমিতে। আর তা সম্ভব হচ্ছে অর্থশালীদের অর্থ সাহায্যে। পুণ্যশ্লোক শ্রীমা সারদামণি বলতেন 'যার আছে সে মাপ, আর যার নাই সে জপ।" মাপার পথ আর জপের পথ আলাদা হলেও গন্তব্যস্থলটিত একই; পথ নিয়ে দ্বন্দ হতে পারে লক্ষ্য ত দ্বন্দাতীত। সুতরাং যাঁরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য করেন তাঁদের হয়ত অন্যের সাথে পংক্তিতে দাড়াতে হয় না কিন্তু তাই বলে তাঁরা সেই "ক্ষুরস্য

ধারা নিশিতা দূরত্যয়া' দুর্গম—পথে কত দূর অগ্রসর হয়েছেন তা শ্রীমাই জানেন।

শ্রীমা বলেন "ভগবানকে লাভ করতে হলে গুরুনির্দিষ্ট পথে চলাই একমাত্র কর্ত্তব্য—ছেলে হইয়া মার কথা শুনিতে হয়।" পথের দ্বন্দের মান অভিমান ছেড়ে শ্রীমা একদিন যা এক ভক্তকে বলেছিলেন "তোমাদের সাধ্য অনুসারে চেষ্টাকর, বাকীটুকু তিনিই করবেন। তোমাদের কর্ম শেষ করিয়া লও তার পর যা হইবার আপনি হইবে।" আমরা কতটুকু চেষ্টা করি ? শুধু অভিমান মার কাছে যেতে পারলাম না, বড় লোকেরা ঘিরে রয়েছেন, আশ্রমের সন্ন্যাসিনীরা মাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছেন, কত কথা! তাই হয়ত এক সময়ে শ্রীমা কাহারও কথার পৃষ্ঠে বলেছিলেন "আমার কাছে আর 'ক' জন আসে ?"

১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৫)। দেরাদুন যাবার পথে শ্রীমা কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন দিল্লীর আশ্রমে। যদিও জিজ্ঞাসু সকলকেই জানান হয়েছিল 'মুসোরী এক্সপ্রেসে শ্রীমা যাবেন, ষ্টেশনেই তাঁর দর্শন হবে,' তবু যখন সন্ধ্যায় আশ্রমে গেলাম তখন দেখি প্রচুর ভীড়। শ্রীমা তাঁর প্রকোষ্ঠে। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ লাভ করছেন। পরে সর্বসাধারণে এক এক করে শ্রীমাকে প্রণাম করে ফিরে আসছেন। যথারীতি সকলকেই কুশল প্রশ্ন করছেন "তোমরা সব ভাল আছ ত ?" যার কৃপায় 'আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে' বাস করার অধিকার পাওয়া যায়, তাদের ভাল না থেকে ত উপায় নেই। তাদের সবই ত 'জয় দুর্গা' নামে জমা আটা।

প্রণাম করে নীচে ফিরে শিব-মন্দিরের চত্বরে বসে আছি। আরতির শেষে কীর্ত্তনও শেষ হয়ে গেছে, দুরাগত ভক্তেরা অনেকেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। এর মধ্যে মাতৃ সেবাপরায়ণা শ্রদ্ধেয়া বুলুদি (শ্রীমতী লাহিড়ী) নিয়ে এলেন 'চরণামৃত'। পান করে "শিরষি" ধারণ করছি, অমনি তিনি

বল্লেন "যান উপরের দরজা খোলা আছে"। আর তৎক্ষণাৎ স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা উপরে শ্রীমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। সাধারণতঃ একবার প্রণামের সুযোগ পেলে দ্বিতীয় বার ভীড় বাড়াতে বড় যাই না, তবুও আগ্রহ দমন করতে পারলাম না। বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের পিছু পিছু আবার শ্রীমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম। শ্রীমা আমাদের সকলকে দ্বিতীয় বার দেখে হেসে উঠলেন "মুলাকাত ত হোয়ই গিয়া।"

মানুষ এই জীবন্ত বিগ্রহের কাছে যাবার জন্য কি ভীড় করে, ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে. একবার আসনের পাশে বসলে নড়ার নামটীও নেই---এই দৃশ্য আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর এই দেশে সকলে দেখে আসছেন। কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, কেউ তা করতে পারবে না। উনি প্রস্তর মূর্ত্তি নন্ যে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, আর যার যতক্ষণ ইচ্ছা চুপ করে বসে থাক, যতক্ষণ ইচ্ছা পূজা আরতি কর। তিনি ভক্তের দেওয়া "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" রক্ত মাংসের শরীর দিয়ে গ্রহণ করেন। তাই তাঁর হাতের থেকে ফল, ফুল, মালা পাবার এই আকুতি। যতদিন মানবের কল্যাণে এই লীলা প্রকট থাকবে ততদিন মনে হয় এই রকমই চলবে। প্রকৃতিয় নিয়মের যিনি বাইরে তাঁকে নিয়ম শৃঙ্খলে আনা অসাধ্য। তাই অতীতে ঢাকায় একবার তিনি বলেছিলেন—তোমরা কি ভেবেছ. যে এই আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে আমাকে আটকাইয়ে রাখবে? মধ্য রাত্রে হেঁটে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লেন ষ্টেশনের দিকে। বড়লোকের গাড়ী এখন হয়েছে, কিন্তু চলাটার ভঙ্গী, এক রকমই আছে। স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে দিল্লীর আশ্রমে। একদিন সন্ধ্যায় একটী বিরাট বিদেশী গাড়ী, একজন সর্দ্দারসাহেব চালক, শ্রীমা উঠে বসলেন সঙ্গে আর কেউ নেই। যে সমস্ত ব্রহ্মচারীরা সচরাচর মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকেন তাঁদের কেহই নেই। প্রায় একবস্ত্রেই চলে গেলেন কার গৃহে কোথায় কেহ জানল না। পূজ্য নির্ম্মলানন্দজী চিন্তিত হলেন মার সঙ্গে কেহ রইলনা,' বলে। জাগতিক ভাল মন্দের বাইরে তবুও ভক্তের চিন্তা হয় চিন্তামণির জন্য।

১৪ই ফেব্রুয়ারীর কথা বলছিলাম। শ্রীমা নেমে এলেন, ষ্টেশনে যাবার সময় হয়েছে। পরম শিবের মন্দিরের চত্বরে দক্ষিণ পার্শ্বে পবন-নন্দন মহাবীরের মূর্তি স্থাপিত। শ্রীমা দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি সেই অপূর্ব্ব শোভা। অন্যদিক থেকে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দজী বল্লেন "মা, যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার টাকা দিয়েছিলেন তিনিই এখন মাসে মাসে টাকা দিচ্ছেন। নিত্য ভোগ হচ্ছে, মঙ্গলবার দিন মহাবীরকে হালুয়া ভোগ দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।" শ্রীমার দৃষ্টি নিবদ্ধ বিগ্রহের দিকে, অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে বল্লেন "ঠাকুর নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছ ঠাকুর বলে মাথা একটু বাদিকে হেলিয়ে দিলেন।

শ্রীমা অনেক দিন আগে (ঢাকা ১৯৩৭ সন) প্রাক্তন ঢাকা হলের ছাত্রদের সাথে কথোপকথনের সময় একটী ছাত্রের "ভগবানকে কি দেখা যায় ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন "হ্যাঁ দেখা যায়, আমি তোমাদের যেভাবে দেখিতেছি এবং তোমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলিতেছি ভগবানকে ঠিক সে ভাবেই দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়।" ভগবানের সঙ্গে ভক্ত কি ভাবে কথা বলতে পারেন তা শ্রীমা দেখিয়ে দিলেন। আমার যতদূর মনে আছে তাতে এই লীলা সন্দর্শনের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের মধ্যে বড়লোক ছিল না বলেই মনে হয়। তবে অভিমান কেন ?

শ্রীমা সিড়ি দিয়ে নেমে আসছেন, কোনও ভক্তের কন্যা শিশুসন্তান ক্রোড়ে ভক্তিযুক্ত বিনম্রদৃষ্টিতে দাঁড়ান। শ্রীমা জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার নাম জানি কি ?" তিনি উত্তর দিলেন "ইরা"। শ্রী বল্লেন "হ্যাঁ উলটালে কি হয়—রাই - শ্রীরাধিকা। পৃথিবীর সমস্ত সাধক সাধিকার ভাব বিগ্রহই ত শ্রীরাধিকারূপে প্রকট। মনটীকে উলটিয়ে, তাঁর চরণে দিতে পারলেই হয়।" সূক্ষ্ম ঈঙ্গিতে কত বড় সত্য শোনালেন, যারা শুনতে পারে। তাই শ্রীমা বলেন, যে যা বাজিয়ে নিতে পারে। এই বাজিয়ে নেবার অধিকার সকলেরই সমান। বড় ছোট ধনী দরিদ্র, সন্ন্যাসী, গৃহী।

সরস্বতী পূজার দিন পূজান্তে শ্রীমা শিব মন্দিরের চত্বরে আসীন। স্ত্রীপুরুষ সুদীর্ঘ দুই লাইনে দণ্ডায়মান শ্রীমাকে প্রণতি জানাবার জন্য শ্রীহস্তে দেওয়া প্রসাদ পাবার আগ্রহে। পূর্বেই বলেছি কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না তবুও কিছুটা ভীড় সংযত করার জন্য এক দিকে আর একটী ভক্তের হস্তবন্ধনীর বেষ্টনী করে অপেক্ষমান ছিলাম। কোনও সময় ভীড়ের চাপে মনে হচ্ছে এই বুঝি বা শ্রীমার আসনের উপর পড়ে যাই। দেখার সৌভাগ্য হলো অতীত কালের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একটী ভক্ত মহিলার নব পরিণীতা বোধহয় পুত্রবধূকে দিয়ে মাকে সিন্দূর পরান। প্রচুর পরিমাণ সিন্দুর ঠেসে দিলেন, কিছুটা নাকের উপর কিছুটা চশমার উপর পড়ল। শ্রীমা নির্ব্বিকার। আমরা যদি চলে যাই সেই অতীত যুগে যখন শ্রীমা "বড় লোকের মা" হন নাই তখন শুনতে পাব—

"প্রফুল্ল—মেয়েরা আপনার উপর যে অত্যাচার করে তা দেখিয়া আমাদের বড় কষ্ট হয়। আপনি তাহাদিগকে নিষেধ করেন না কেন ?

মা—আমি ত নিষেধ করতে পারি না। যদি আমার দেহটা রক্ষা করিবার কোনও বাসনা থাকত তবে আমি নিষেধ করিতে পারিতাম।..... তোমরা ত দেখ নাই যে মেয়েরা আমাকে সিন্দুর পরাইতে আসিয়া আমার কি অবস্থা করে। আমার মাথায় কপালে চোখে সিন্দুর লেপিয়া দেয়। ঐ সিন্দুরে আমার কাপড় জামা লালে লাল হইয়া যায়। মুখ চুল পরিস্কার করিতে নর্দ্দমা দিয়া রক্ত গঙ্গা বহিয়া যায়। কিন্তু তবুও আমি তাহাদিগকে সিন্দুর দিতে বাধা দিতে পারি না। দেহটা রক্ষা করিবার কোনও ভাবই যে আমার মধ্যে নাই, ইহা সকলে বুঝিতে পারে না। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ-দ্বিতীয় খণ্ড)।

আজ এত দিন পরে বিদগ্ধ জনতার মধ্যে সেই সিন্দুর দেবার দৃশ্য যা উপরোক্ত গ্রন্থে পাঠ করেছি তাই করলাম প্রত্যক্ষ।

শ্রীমার স্বরূপের ত কোনও পরিবর্ত্তন নেই—"সৃষ্টেবাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপ অগোচরম্"। তাই ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে থাকাকালীন শ্রীমা বলতেন "আমি ঢাকা আছি।" এই কথার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করলে শ্রীমা বল্লেন "চিন্তা করলেই কাছে পাওয়া যায়।" বহুদিন পূর্ব্বে এক ভক্তকে বলেছিলেন "আমি বিশ বৎসরের সঙ্গেও আছি, পঞ্চাশ বৎসরের সঙ্গেও আছি, আবার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পূর্ব্বেও আছি।" তিনি আছেন ভক্তের হৃদয়ে, জ্ঞানীর প্রজ্ঞায়, যোগীর ধ্যানে। বড়লোকের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত থাকেন, কিন্তু আতিথ্য গ্রহণ করেন বিদুরের কুটীরে, তাই মা তুমি বড়লোকের মা, গরীবেরও মা, ধনীরও মা, নির্ধনেরও মা। শুধু মাই জানেন কোন ছেলের বোঝা কত ভারী, টানতে হয় কিনা। জাগতিক ক্ষেত্রে দুরন্ত ছেলের জন্য দুর্ভাবনা বেশী, শান্ত শিষ্ট ছেলেদের জন্য, ভাবনা বড় একটা হয় না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নেই। জয় দরিদ্র-ধনীর মা, ধনী দরিদ্রের মা।

———

মাতৃ-পদামৃত

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

১

শাস্ত্র কয় ইন্দ্রিয়াদি কর মনে জয়
মনেরে করহ তব বুদ্ধিমধ্যে লয়
বুদ্ধি শুদ্ধ করি' কর আত্মাতে বিলীন
পরম আনন্দ লভ সাধক প্রবীন।

*

এ দীন পরেশ কয় ধর মাতৃ-পদ
মুহূর্ত্তে কাটিবে তব যতেক বিপদ,
ব্রহ্মানন্দ সে তো শ্রীশ্রীমা'র কৃপা-কণা
নিশ্চিন্তে করহে সুখে শ্রীপদ ভজনা॥

২

তত্ত্বজ্ঞ বলেন জেনো অনিত্য সংসার
অনিত্যেতে নিত্য জ্ঞান কর পরিহার,
আত্ম-মধ্যে স্ব-স্বরূপের করহ ভাবনা
অন্তিমে পরমগতি লভিবে আপনা।

*

মা বলেন 'সংসার বটে মায়ার আগার,
সংসারী যতেক কর ধর্ম্মের সংসার ;
ঈশ্বরাংশ-জ্ঞানে সেব' পুত্র-পরিবারে
যত্র জীব তত্র শিব রাখিও অন্তরে ;
নিত্য প্রকাশ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে
সর্ব্বত্র হেরিবে তাঁরে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে ;
ক্রমশঃ হইবে চিত্ত-প্রসাদ উদয়
পরম আনন্দ লভি' পা'বে তাঁ'তে লয় ॥'

৩

"স্থিত প্রজ্ঞ হও সবে"—গেয়েছেন গীতা
"মনের কামনা যত ত্যজিয়া সর্ব্বথা,
আপনি আপনে তুষ্ট রহ সর্ব্বক্ষণ
বিচর আনন্দ-লোকে সাধক সুজন।"

*

মোর মন কহে হায় দুর্জয় বাসনা
এক যায় আর আসে মানা তো মানে না ;
তাই সবে মাতৃ-পদ মাত্র কর সার
অচিরে পালা'বে যত বাসনা তোমার ;
পদাশ্রয়ে আনন্দের নাহি ওরে সীমা
পরেশ কাঁদিছে "আমায় পায়ে ঠাঁই দে মা ॥"

৪

কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ইষ্ট-লাভে তিন পথ
কোন্ পথে সুলভ কেহ নহে একমত ;
কর্ম্ম-ত্যাগ কর কহে কেহ বা নিষ্কাম ;
কেহ বলে ভক্তি-বলে মিলে প্রাণারাম ;

যোগী কয় কর সার পরমার্থ-জ্ঞান
জ্ঞানে ইষ্ট লাভ হয়—শাস্ত্রই প্রমাণ।

(মন্তব্য)

কর্ম্ম-ত্যাগ অসম্ভব, অনাসক্ত হ'য়ে
উপস্থিত কর্ম্ম কর মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে,
মা বলেন ভক্তি সাধ্য নহে বিনা জ্ঞানে
যাঁরে নাহি জান তাঁরে ভজিবে কেমনে ?
গীতা কয় জ্ঞানে পরা-ভক্তি লাভ হয়
পরাভক্তি তত্ত্ব-জ্ঞানে উজলে হৃদয় ;
সর্ব্বজ্ঞা জননী, কর সার তাঁর কথা
তাঁর কাছে জেনে লও পথের বারতা ॥

৫

নৃদেহে জীবন-মুক্তি বাঞ্ছে যোগীজন
ত্যাগে ও বৈরাগ্যে করে বিষয়-বর্জন ;
সর্ব্ব কর্ম্ম করে'ও কিছু করেন নাতো তিনি
নিরাসক্ত আত্মারাম জীবন-মুক্ত মুনি।

(মন্তব্য)

মাতৃ-সেবা মুখ্য যার আর সব গৌণ
চরণ-চিন্তন সদা বৃথা বাক্যে মৌন,
সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁর কর্ম্ম জেনে করে সব
ত্যাগের মাধ্যমে ভুঞ্জে বিষয় বৈভব ;
মহানন্দে দিন যায় মাতৃ-ক্রোড়ে থাকি'
জীবন-মুক্তির আর কি রহিল বাকি ?

দিব্য-মহাজীবন-বেদ

আত্মায় সন্ধানে বিংশ শতাব্দী ও বিশ্বজননী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা

শ্রী দিব্যদর্শী

[২]

এই প্রসংগে বিংশশতাব্দীর আধুনিক কবিতার জনক নোবেল লরিয়েট ইংরেজ কবি টি, এস, ইলিয়েটের কথা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করিতেছি, যিনি তাহার কাব্য ও চিন্তাধারার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ও অর্থগৃধ্নু সভ্যতার মধ্যে আমাদের মনে উচ্চতর জীবনবোধ ও অধ্যাত্ম প্রয়োজনের কথা বারবার ঘোষণা করিলেন। ভগবানের স্পর্শবর্জিত বর্ত্তমান সভ্যতার রূপ দেখিয়া কবি মর্মাহত। কবি গভীর বেদনার সহিত প্রকাশ করিলেন "মানুষ ভুলে গেছে তার ভগবানকে, ভোলে নাই তার কষাই বৃত্তি, উদগ্র কাম, শক্তিমত্তার দম্ভ।"

Men have forgotten
All Gods except usury, Lust, Power"

কবি ঈশ্বরবিহীন এই সভ্যতার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া বলিতেছেন ঃ

বৃথা হলো মোদের সৃষ্টি
স্রষ্টা সেখানে নাই,
হায়, ভগবানের প্রেম মাধুর্যবর্ধিত যারা
তারা কত না শ্রান্ত, কত না ক্লান্ত
জীবনের কারাগারে।"

"We build in vain
Unless the Lord build with us,

Oh weariness of man
Who turn from God"

আমরা বাঁচিবার তাগিদে জীবনকে হারাইয়াছি। জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় হারাইয়াছি প্রজ্ঞাকে। মানুষ পরিণত হইয়াছে বিরাট যন্ত্রদানবের ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষে। বর্ত্তমানের ঘোর বৈষয়িকতা, একদিকে প্রাচুর্য্যের বিলাস, আরেক-দিকে সর্বহারা মানুষের ক্রন্দন, আরেক দিকে কপটাচারের অর্থহীন ব্যস্ততা, বহুধা বিশ্লিষ্ট জীবনের লক্ষ্য, বিকারগ্রস্ত জীবনের অবসাদ আত্মিক জীবনের ধ্রবাস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে হৃতবিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া কবি আর্তস্বরে বলিতেছেন। ভগবানকে বাদ দিয়া মানুষ যেন সব মাধুর্য হারাইয়াছে, আত্মার তৃপ্তির কোন রসধারা এখানে আর ক্ষরিত হয় না।

"এখানে নেই কোনজল, আছে শুধু প্রস্তর
নেই কোন দেব মন্দির, নেই কোন গৃহ সাজ
মানুষ ছেড়েছে ঈশ্বর, ভুলেছে আত্মার মহিমা,
ঘুরিছে বাত্যা বিক্ষোভে,
বীজাঙ্কুর যথা এখানে সেখানে,
নেই তার ধ্রুবা স্থিতি
যেখানে নেবে ক্ষণিকের বিশ্রাম"

"There is no water, but rock
Where there is no Temple, there is no House,
Man without God is seed upon the wind
Driven this way and that way,
Finding no place of lodgement and germination"

কবি শেষ পর্য্যন্ত উপনিষদের শান্তিবাণীতে আশ্রয় খুজিলেন, বলিলেন—
"দত্ত, দয়ধ্বম, দম্যতে শান্তি শান্তি শান্তি, কবি। What the thunder said"

কবিতায় এই শান্তি বাণীতে বিশ্ববাসীর কর্ণে বৃহদারণ্যকের, প্রেম আত্মসংযম, নিজেকে নিঃশেষে দানের মধ্যেই যে অমৃতের ও আত্মার পথ আস্তীর্ণ এই সত্যকে ঘোষণা করিলেন।

ভাবিতে বিস্ময় লাগে বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবির এই মোহ মুক্তির বহুপূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক মর্ম হইতে একটী দৃপ্ত কণ্ঠ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মানুষকে আত্মার দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে মানুষ যখন আত্মাকে ভুলিয়া থাকার জন্য উপদিষ্ট হইতেছিল, তখন একটী কণ্ঠস্বর মানবতা ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের সুর তূর্যনিনাদে, বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে ছিল। পরম গৌরবের সংগে স্মরণ করিতেছি এই ভারততীর্থ হইতে সেই সাম্য মৈত্রী ও পরমাত্মার মহাবাণী যিনি ধ্বনিত করিলেন তিনিই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মার আহ্বান আবার পুনরুদ্গীত হইল। 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', সেই সনাতনবাণী আবার উচ্চারিত হইল। যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল তাহারই একটী শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল। স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"Hear ye children of immortal bliss, You are the children of God, the sharers of immortal bliss ! holy perfect and perfect beings : Come up, oh lions shake the delusion that yon are sheep, you are souls immortal, spirits free. blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies; matter is your servant and not you the servant of matter.

ওগো অমৃতের সন্তানগণ, শোন, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, শাশ্বত মহানন্দের অংশীধারী পূর্ণ পবিত্রতম, পরিপূর্ণ সত্তা, তুমি। ভুলে যাও তোমার মেষশাবকের মতো দুর্বলতা। তুমি পশুরাজ সিংহের মতো বিক্রমশালী। তুমি

মহা পবিত্র, পূর্ণ, মুক্ত, শাশ্বত আনন্দময়সত্তা, বস্তুপুঞ্জ নও তুমি। দেহধারী জীব মাত্র নও বস্তুরাশি তোমার প্রভু নয়, বস্তুপুঞ্জ তোমার দাস।"

এই আত্মিক প্রেরণার মূলে স্বামিজীর দীক্ষাগুরু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে কাজ করিতেছিলেন, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আত্মিক ঋদ্ধির কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন স্পষ্ট অনুভব হয় যখন স্বামীজী বলেন—

"Tons of my energy cannot explain the ounce of my master".

আবার শুনি স্বামীজীর জলদমন্দ্র কণ্ঠে "জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর, নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর" এই মহামন্ত্রের ধ্বনি, স্বামীজী ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই জীবব্রহ্মবাদ এতকাল শাস্ত্রে মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীর সম্বাদরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। যুগাচার্য স্বামীজী এই নর-নারায়ণ সেবার মাধ্যমে আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সাম্যমৈত্রীর এক অভিনব বার্তা বিশ্ববাসীর কর্ণে উপস্থাপিত করিলেন। স্বামীজী জানিতেন এই অখণ্ডবোধে জীবনকে দেখা একমাত্র ভারতের উপনিষদই আত্মার আহ্বানে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতবাসীকে বলিলেন "যদি আত্মার মাধুর্য্য জানিতে চাও, জীবনের মহৎ তাৎপর্য্যকে বুঝিতে চাও তাহাহইলে—

"Go back to your Upanishads the shining the strengthening, the bright philosophy. The truth of the Upanishads are before you, take them up, live to them".

স্বামীজীর নর-নারায়ণ তত্ত্ব ভারতের সনাতন আত্মার তত্ত্বকেই বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত করিলেন, তাঁহার প্রচারিত নর নারায়ণবাদ, বিশ্বের নবসাম্যবাদ। আজ যখন মানুষ আত্মাকে ভুলিতে চাহিতেছে, তখন অনন্ত দিগন্ত প্রসারিত নভোদেশ বিচরণ করিয়া মহাসম্ভাবনাময় আত্মার বাণীতে স্বামীজী সমগ্র মনুষ্যসমাজকে আহ্বান করিতেছেন। আরও স্মরণে আসে সমগ্র মনুষ্য সভ্যতা 'আত্মার সন্ধানে' বিংশ শতাব্দীর যে মনীষীর কথা গভীর শ্রদ্ধার সংগে অনন্তকাল স্মরণে রাখিবে তিনি যুগর্ষি মহাকবি শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র সাধনার মহিমায় আত্মার অভিজ্ঞানে এক পরম বিস্ময়, মনীষা ও মননশীলতা, আত্মা ও জীবন মুক্তি ও ভুক্তির অপূর্ব সমন্বয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন, সনাতন ও অধুনাতনের মাধুর্যপূর্ণ বেনীবন্ধন। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী মনীষী রোঁমারোঁলা বলিলেন—

"Here comes Sri Aurovinda the completest synthesis that has been realised to this day of the genius of Europe and Genius of Asia".

শ্রী অরবিন্দ ঋষিকুলের উত্তর সাধক, বর্ত্তমান যুগের আত্মার পথে পরম দিশারী। আত্মার অমৃতবার্ত্তা জগৎকে শুনাইলেন। তিনি দিলেন চির আনন্দসংবাদ যে আত্মার আনন্দের কথায় উপনিষদ সদা মুখরিত. ঋষি কবিরা যে বাণী শুনাইলেন জগৎকে অনন্য বাগ্‌বিভূতিতে। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—মানুষের জীবন মিথ্যামায়া কল্পনা নয়। দুঃখযন্ত্রণার সমষ্টি মাত্র নয়, রাষ্ট্রজীবনের দাসত্বও নয়। জীবন পরমাত্মার, পরমানন্দের অভিব্যক্তি। তাঁর অপূর্ব আত্মিক জীবন গ্রন্থ "Life Divine"-এ বলিতেছেন—'আত্মার পথে দিব্যজীবনে সমাহিত হওয়াই এই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য'।"

"The ascent to the Divine Life is the human journey, the work of works, the acceptable sacrifice. This alone is man's real business in the world and the justification of his existence without which he would be only an insect on a speck of surface mud and water which has managed to form itself amid the appalling immensity of the physical universe'

(*Life Divine—Man in the universe*).

মানব জীবনের পরম সাধনা শুধু দিব্যজীবনের অভিসার। বিশ্বলীলায় শুধু এই তার করণীয়—তার জীবনের নিহিতার্থ। এ অর্থ যদি সে খুঁজে না পায় তাহলে সে হাজারো কীট-পতঙ্গের অন্যতম হ'য়ে যাপন করবে এক শ্রীহীন মলিন পঙ্কিল জীবন—এই বস্তুজগৎ হয়ে উঠবে শুধু এক নিদারুণ মরুভূমির নিরন্তর হাহাকার।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্যজীবন 'গ্রন্থ' বারবার বলিতেছেন—ভগবদিচ্ছাশক্তিই পরমাত্মার লীলাই বিশ্বপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ ধারার মূল প্রেরণা। এই আত্মার ইচ্ছাকে বুকে করিয়াই প্রকৃতি ধাপে-ধাপে অগ্রসর হইবে ভগবানের ঐশ্বর্যকে জড়ের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। পৃথিবীতে আত্মিক জীবন লাভই প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের চরমলক্ষ্য। এই ঊর্দ্ধাশী আত্মিক প্রেরণাকে অভিনন্দন করিতে হইবে। মাটিছাড়া হইয়া আকাশে নীড় বাঁধিয়া সুধা সুসুপ্তিতে মগ্ন হইয়া থাকিতে নয়, চিন্ময়ের ধ্যানে আত্মার ধ্যান মৃন্ময়কে ভুলিয়া ত্রিতাপের কবল হইতে আশু অব্যাহতি পাইতে নয়, এই জগতেই আত্মার আনন্দকে আহ্বান করিয়া বৈকুণ্ঠের আনন্দ মেলা বসাইতে হইবে। সেদিন মানুষ আত্মার মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাইবে। প্রপঞ্চের রাসমঞ্চে নামিবে সে দিন নিত্যরস বৃন্দাবন। মানুষ আত্মার আহ্বানে জাগিয়া উঠিবে সেদিন —

"Man too shall turn towards the spirits call
The spirit shall look out through Matter's gaze'

And Matter shall reveal the spirits face
The spirit shall take up the human play
The earthly life become the Life Divine'.

"প্রেমে ফিরাবে মানব
সেদিন পরমাত্মার আহ্বানের পানে মুখ তার,
মৃণ্ময়ের দৃষ্টিপথে চাহিবে চিন্ময় সে সুদিনে
মৃণ্ময় আধারে হবে মূর্ত্ত চিন্ময়ের দিব্যানন।
মানবলীলার হবে অন্তরাত্মা নিয়ন্তা
পার্থিব জীবনের যুগান্তর হবে
নিশ্চিন্ত জানি দিব্য জীবন সাগরে।"

(Savitri)

উপসংহারে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি সেই সব সিদ্ধজন অবতারকল্প মহাপুরুষদের, যাঁহারা গ্রন্থ লেখা বা জ্ঞানগর্ভ বাগ্মীতার মাধ্যমে তাঁদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাঁহাদের জীবনই তাহাদের বাণী। শুধু তাঁহাদের আছে সর্ব্বস্ব দিয়া ভগবানকে লাভের সাধনা। তাঁহাদের আচরণ, দৃষ্টি, স্পর্শ, দিব্য বাণীর মধ্যে বিস্তৃত হয় ভাগবতমাধুর্য, সহস্র-সহস্র মানুষ পায় ঈশ্বরের প্রেরণা। তাঁহারা শাস্ত্রউদ্ধৃতি দিয়া কথা বলেন না। কিন্তু তাঁহারাই শাস্ত্রমূর্ত্তি শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত, বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজননী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা তাঁর জ্বলন্ত দিব্যমূর্ত্তি, লোকোত্তর মাধুর্যের অলৌকিক প্রতিমা। শ্রীশ্রীমা কত ভাবে বলেন 'আমি তোমাদের ছোট্ট মেয়ে, আমি কিছু জানিনা"। কিন্তু সেই অজানার শ্রীচরণতলে কেন এত জ্ঞানীগুণী শতজানার সব গৌরব ধূলাবলুণ্ঠিত হয়, সেই রহস্যের সন্ধান বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, বিজ্ঞান সাধনা কি দিতে পারিল।

ওগো বিশ্ববাসী বিংশশতাব্দীর নরনারী, তোমরা মহাপ্রভু চৈতন্যকে

দেখ নাই, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকেও অবলোকন কর নাই। এস, পবিত্র হৃদয় নিয়া ব্রহ্মক্ষুধা বুকে নিয়া এস, আত্মার মাধুর্য আস্বাদনের জন্য এস—সুধাসাগরের মহিমময়ী আনন্দদান পতিতপাবন অমৃত নিঃস্যন্দী বিশ্বজননী ব্রহ্মময়ী শ্রীআনন্দময়ীর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন কর। মর্ত্তের লোকভূমিতে অমূর্ত্তের লীলাবিলাস আস্বাদন কর। বিংশশতাব্দীর আত্মার সন্ধানের সার্থক পরিণতি চিন্ময় মহাদ্যুতি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-তত্ত্বে অবগাহন কর।*

---

* ৯ই ফেব্রুয়ারী '৭৫-এ সংস্কৃতি ও প্রার্থনা ভবনে (চন্দননগর) ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে ডাঃ অমিয় কুমার মজুমদার আই, এ,এস;ডি, ফিল, ডি,এস্,সি, মহোদয়ের প্রধানাতিথি অনুষ্ঠিত সভায় নিবন্ধকারের প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।

২৬তম সংযম মহাব্রত

শ্রীপ্রতিভা কুমার কুণ্ডু

গত ১০ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ পর্য্যন্ত এই বছরের সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উদযাপিত হোল কানপুরের স্বদেশী হাউসে। উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ রাজারাম জয়পুরিয়া।

সংযম ব্রতে ব্রতী হওয়ার আমাদের মুখ্য উপলক্ষ্য হোল শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র বাস্তবিক অভিমুখ সান্নিধ্য, প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে সাতদিন। তখন কোনও ভাষণ শুনতে হয় না, শুনতে হয় না গীতাপাঠ বা পুরাণ ব্যাখ্যা, শুধু মা'র দিব্য শরীরের সম্মুখ সামীপ্যে এক শান্ত সমাহিত স্বর্গীয় পরিবেশে সকলের অন্তঃকরণের কেন্দ্রটুকু পরমাত্মাময় হয়ে যাওয়া। ছোট সুস্মিতা নদীধারার কুলুকুলুধ্বনির মত এই সময়টুকু সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে পরমানন্দ সারা শরীরে বয়ে যায়। তখন মনে হয়, আমাদের মধ্যে আমরা নেই। এক উজ্জ্বল দিব্য জ্যোতির মধ্যে মা বসে আছেন, আমাদের নিয়ে চলেছেন সুদূরে এক পারজাগতিক স্থিতিতে।

জন্মোৎসবে বা দুর্গাপূজায় আমরা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ কোলাহলের আনন্দ, আড়ম্বরের আনন্দ। আর সংযম মহাব্রতের আনন্দ হোল এক নিগূঢ় পরমানন্দ, যা শুধু হৃদয়ের গভীরে অনুভূত হয়, যার কোনও প্রকাশ নেই, যার কোনও আতিশয্য নেই। এই আনন্দ আপনাতে আপনিই ব্যক্ত হয়।

মা'র ইচ্ছা' মা'র সন্তানেরা সবাই সংযম সপ্তাহে ব্রতী হোক। সে মা'র সান্নিধ্যেই হোক, অথবা যার যার গৃহস্থাশ্রমেই হোক, ঐ সপ্তাহটা সংযম

মহাব্রতে যোগ দেওয়া। তাতে মা'র আনন্দ। মা'র আনন্দে আমাদেরও সকলেরই আনন্দ।

সংযম সপ্তাহের দৈনন্দিন কার্যক্রম হয়তো সকলেরই জানা আছে। তবুও আমরা এখানে আর একবার বলে নিই। কার্য্যক্রম ক্রমান্বয়ে পরপর এইরকম: ঊষা কীর্ত্তন, বিরতি, বেদপাঠ, ধ্যান, গীতা চণ্ডী উপনিষদ্ পাঠ, মহাত্মাদের ভাষণ, রামায়ণ পাঠ, বিরতি; সন্ধ্যা কীর্ত্তন, মহাত্মাদের ভাষণ, মৌন, মাতৃ-সঙ্গ। খোলাখুলি সাদামাটাভাবে বলতে গেলে, দুপুরে ঘুমিয়ে বা অন্য কোনও সময়ে দোকানবাজারে কেনাকাটা করে সময়ের অপচয় করবার কোনও সুযোগই নেই। অন্তত সাতটা দিন যাতে অন্তঃকরণ এক লক্ষ্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকে।

আরও যা জ্ঞাপনীয়, তা হোল, মা'র শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। পায়ে ব্যাথা ছিল। মঞ্চের উপরে মহাত্মাদের শুভাগমনে সম্মান দেখাবার জন্যে মা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শরীর অচল থাকায় বেশীর ভাগ সময়েই পারেন নি। মা'র চেহারায় উজ্জ্বল্য যেন প্রায় ছিলই না, কেমন যেন একটা বীতরাগ নিষ্প্রভ ভাব। কি যেন একটা অসীম ক্লান্তি মা'র মুখের উপর প্রকাশমান ছিল, যা আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক ছিল।

জয়পুরিয়া পরিবারের ব্যাবস্থাপনা সম্বন্ধে বলবার মত কিছুই নেই। কারণ বিন্দুমাত্রও সমালোচনা করবার মত কোন কাজ যদি তাঁরা করে থাকতেন তাহালেই আমাদের বলবার মত কিছু থাকত। কিন্তু সেদিক থেকে তাঁরা আমাদের সত্যিই বড় নিরাশ করেছেন। ব্যাবস্থাপনায় সামান্যতম ত্রুটিও তাঁরা রাখলেন না যাতে আমরা একটা সরস আলোচনার বিষয়বস্তু খুঁজে পেতাম।

বরং সত্যি কথা বলতে কি, ব্রতীদের জয়পুরিয়া পরিবারের সবাই এত বেশী আদর যত্ন করেছেন যে, সবসময় সে আদর যত্ন ঠিক সংযম মহাব্রতের অনুকুল হয়নি। সত্যই, জয়পুরিয়া পরিবার মা'র অসীম কৃপাধন্য।

সাতদিন ধরে মহাত্মারা তাঁদের ভাষণে যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন, সে-সবের সার কথাগুলো আমরা এখানে আর একবার অনুধাবন করছি ঃ

নৈমিষারণ্যের মহারাজ নারদানন্দজী বললেন—"কোনও ঋষি সিদ্ধ হননি, যিনি কোনও নামের সাহায্য নেননি। নামেই সব হয়। নামলেখা চিঠি কোলকাতা, বোম্বাই, বদরিনারায়ণ চলে যাচ্ছে চিঠির নামধারীকে খুঁজতে। সেইরকম নাম নিতে নিতে সেই নামধারীর কাছে পৌঁছোতে পারা যায়।"

স্বামী নারদানন্দজীর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দজী বললেন—"কৃপণ যেমন একটি পয়সাও ছাড়তে পারে না, ব্যাপারী যেমন একটুও মুনাফা ছাড়তে পারে না, সেই রকম ব্রতীরা এই সংযম ব্রতে ভগবানকে ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতে পারে না।

জড় শরীর তার চৈতন্য আত্মার মাঝখানে হোল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণের চার বৃত্তি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।

জীবের সুখ দুঃখভোগ অন্তঃকরণের হয়। জীবের শরীরের হয় না, বা জীবাত্মারও হয় না। সকলেই সুখ দুঃখ পাবেই। সংযম করলে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা পাবে। দুঃখের পর সুখ পাবে, সুখের পর দুঃখ নয়। আর ভগবানের কাছে চিত্ত থাকলে সুখ দুঃখ কিছুই থাকবে না।

সংসারের সব কিছুতেই পরমাত্মাকে না দেখতে পারলে সূক্ষ্মদৃষ্টি কখনও লাভ করা যায় না। আর সূক্ষ্মদৃষ্টি না হলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না।

সাধনাপূর্ণ হলে তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসবে।

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বললেন—"রোগী যেমন ডাক্তার-খানায় গেলে কোন্ ওষুধটা খাবে, নিজে জানে না, ডাক্তারের দরকার হবে। সেইরকম গুরুর প্রয়োজন, কার কি রকম সাধনার দরকার জানবার জন্যে। গুরুই তা বলে দেবেন।

যদি সর্ব্বভূতেই পরমাত্মা থাকেন, তাহলে পরমাত্মা-সাক্ষাতের জন্যে সাধনার দরকার কি ? পরমাত্মার দর্শন তো তাহলে সব সময়ই হচ্ছে।"

অবধূত-বৃত্তি সম্পন্ন অবধূত-বেশধারী আনন্দস্বামীজী বললেন—"একমাত্র সংযমেই বুদ্ধির স্থিরতা, চিত্তের সমাহিতভাব, মনের বিশুদ্ধি আসবে, শক্তি আসবে। এ-সব ছাড়া কোনো দিনই ভগবানের নামকীর্ত্তনে কোনো আনন্দ পাবে না।

ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা বৃথা। কারণ ভগবানের সঙ্গে যোগতো আছেই, সেই যোগাযোগ শুধু অনুভব করতে হবে।

এই সংসারকেই আমরা পরমাত্মার আপন সংসার মনে করে আনন্দ পেতে পারি—তাহলে সংসার-বন্ধন মোটেও থাকবে না। আর এই সংসারকেই আমরা যদি বোঝা মনে করি, যদি পংকিল মনে করি - তাহালে সংসারের বন্ধন কোনোদিনই ছিন্ন হবে না। দুঃখই শুধু প্রাপ্য হবে।

জীবনে শুধু প্রভুর নামই কলিযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। চলতে, ফিরতে, উঠতে সব সময় নাম করতে হবে। তাহলে সংসারের জটিলতা অনেক সরল মনে হবে।"

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বললেন—"ঋষির সাধনা শেষ হলে তখন তার যোগ্যতা আসবে, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসবে। যার মধ্যে কোনো অহম্ ভাব নেই, সেই হোল সৎপুরুষ। সেই একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী।

নিষ্কাম কর্ম এক প্রকার সাধনা! কিন্তু সাক্ষাৎ সাধনা নয়, এবং তাতে অমৃতত্ব বা পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয় না। মনে তীব্র উৎকণ্ঠা, তীব্র ইচ্ছা জাগলে তবেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, সংযম—এসবও পরমাত্মা-প্রাপ্তির একমাত্র সাধনা নয়, এ-সবের সঙ্গে চাই শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও ত্যাগ।

তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শীর কোনো শোক হয় না। বুদ্ধিতে যদি সম্যক দর্শন এসে যায়, তাহলে সহজেই আত্ম-উপলব্ধি হবে।"

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী গোবিন্দ প্রকাশজী বললেন—"মনুষ্য জীবন শুধু খাওয়ার জন্যে পরার জন্যে নয়। সংযম সপ্তাহ সুস্থ জীবন-যাত্রার থার্মোমীটার। এক জীবনেরই নয়, অনেক জীবনের শৃঙ্খলভার নিয়ে আমরা চলেছি। সুখ দুঃখ এই সব অনেক জীবনের কর্মফল।

জলেই পদ্মপাতা থাকে, কিন্তু পদ্মপাতার গায়ে জল লেগে থাকে না। সেইরকম এই পৃথিবীতে থেকেও এই পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। নিজের ভাবে নিজে থাকবে।

ঈশ্বর পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু যে ঈশ্বরকে পাইয়ে দেবে তাকে পাওয়াই খুব কঠিন।

মনে হয় সন্ন্যাসীরা খুব সুখী। তাদের একটা ল্যাঙ্গট্, একটা কমণ্ডলু আর দুই খণ্ড বস্ত্র। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর ঐ কমণ্ডলুতে যদি সামান্য একটু আসক্তিও থাকে, তাহলে সেই সন্ন্যাসীর সুখ কোথায় ?

যেখানে তুমি আছো, সেখানে তুমি নেই। যেখানে তোমার মন আছে, সেখানে তুমি।"

স্বামী গোবিন্দপ্রকাশজীর শিষ্য স্বামী হংসপ্রকাশজী বললেন—"পাশ্চাত্য দেশে মানুষের সমস্ত কর্মই স্বাভাবিক। মানুষ বদলাতে পারে না, সমাজ বদলালে তবেই মানুষ বদলাবে। তখনই মানুষের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় ভাবধারায় মানুষই বদলাতে পারে এবং মানুষের কর্মধারা বদলালে তবেই সমাজ বদলাবে।

শরীর এক মন্দির—যেখানে পরমাত্মা নিত্য বিরাজ করেন। সেই শরীরকে বেশী উপেক্ষাও করবে না; অথবা বেশী ভোগেও ডুবাবে না। যেমন গানের সময় বীণার তার বেশী ঢিলাও থাকবে না, বেশী টানও হবে না; ঠিক সেই রকম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—হে পরমাত্মা, তোমার বিশ্ব তো আনন্দময়। আমরা যদি দুঃখ পাই তো সে নিজেদের দোষেই।"

তিরিশ বছর ধরে সাধনারতা কানপুরের নয়াগঞ্জের মাতাজী বললেন—

"গার্হস্থ্য আশ্রমে শান্তি পেতে হলে

১। অহিংসার পথে চল।

২। আমার যা কিছু সবই তো প্রভু তোমার। আমিও তো তোমারই।

৩। অজ্ঞানের কারণই হোল অহংকারের পর্দা ও অহম্ ভাব। এসব দূর করতে হবে।

৪। অনাসক্ত হয়ে প্রভুর চিন্তন।

৫। অসময়ে সময়ে সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব কার্য্যে প্রভুর নাম কীর্ত্তন।"

শুকতালের দণ্ডিস্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী বললেন—

"সূক্ষ্ম-বিচারের দ্বারা মনের সব দ্বন্দ্ব মেটানো যায়।

যখন দুঃখ হয়, তখন পাপক্ষয় হয়। যখন সুখভোগ হয়, তখন পুণ্য ক্ষয় হয়। তাহলে কখন লোকে প্রসন্ন হবে? যখন তার দুঃখভোগ হয় তখনই প্রসন্ন হওয়া উচিত।

শরীরের তৃষ্ণা খুব অল্প। কিন্তু মনের তৃষ্ণা অসীম। মনের তৃষ্ণা কখনো মেটানো যায় না।

আমার আমার করলেই বন্ধন। আমার নয়, আমার নয়, করলে তবেই মোক্ষ, মুক্তি।

চিত্তের মল কর্মের দ্বারা, বিক্ষেপ উপাসনা দ্বারা ও আবরণ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, শরীর অশুদ্ধ।

নামের এমন অভ্যাস করতে হবে যেন মৃত্যুকালেও ভগবানের নাম মুখ দিয়ে বের হয়। তাহলে আর জন্ম হবে না। মরবার সময় যে যেইরকম

চিন্তা করে মরবে, তার সেইরকমই জন্ম হবে। মরতে কখনও ভয় পাবে না। মরতে শিখবে।"

৮ই নভেম্বর ভোরে মা দিল্লী থেকে কানপুরে জয়পুরিয়া পরিবারের স্বদেশী হাউসে এসে পৌঁছোলেন। ঐ দিনই বেলা ১১টা ৩৫এ মা দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন।

মা বললেন—"উত্তরকাশী থেকে মোটরে আসবার পর এই শরীরটার পা দুখানা একেবারে অবশ হয়ে যায়।

এই শরীরটা আর দাঁড়াতেই পারে না যেন। প্রায় চেয়ারে করে ঘরে নেওয়ার অবস্থা।

তোমরা যে দর্শন দিতে আস, তা কখনো বিফলে যায় না। অনন্ত দর্শন, অনন্ত স্পর্শন। দর্শনও তো একটা স্পর্শন কি না। ঝাঁকি দর্শন, ফাঁকি দর্শন, সাচ্চা দর্শন। তোমরা যে এই শরীরটাকে এত ভালবাসো। এই শরীরটার দর্শন, গলার স্বর শোনা, মুখখানা একবার দেখা—খালি ফাঁকফুঁক খোঁজা—মনে প্রাণে চাইলে সে-সব হয়েই যায়।

যারা মরতে চায়, তাদের মা'র মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করে না। তাই কেউ কেউ মরতে চায়"

১০।১১।৭৫ তারিখে মা বললেন—

"এখানে যারা সব বসে আছে, তারা বৈকুণ্ঠে বাস করছে। এরা সবাই ডাণ্ডিতে বসে আছে। যতই বাধা বিঘ্ন আসুক, এরা পার হবেই, যদি শুধু গুরুর আদেশ এরা পালন করে, তবেই।

১১।১১।৭৫ প্রশ্ন: নিজেকে জানা নিজেকে পাওয়া—বুঝলাম না। বুঝিয়ে দাও, মা।

মা: শক্তি জাগরণ হয়। নিজের মধ্যেই শক্তি জাগরণ হয়। সংযমের ঠিক ঠিক নিয়ম মানলে সর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর ও সর্ব্ব সংশয়ের নিবৃত্তি হয়ে যায়।

প্রশ্ন : সবাই যদি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহলে সৃষ্টির কি হবে ?

মা : তুমি তো আগে মুক্ত হও, তারপর সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝবেন।

১২।১১।৭৫ প্রশ্ন : আবরণ কি ? আবরণ কেন আছে ? কবে থেকে আছে ?

মা : তোমার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। আবরণ আছে বলেই তোমার জিজ্ঞাসা আসছে। আবরণ সরে গেলে আর তোমার মনে কোনো জিজ্ঞাসাই আসবে না।

মা আরও বললেন—"বাসনা কামনা থেকে দুঃখ হয়। ভোগ-বিলাসের তৃপ্তি না হলেও দুঃখ হয়। আর ভগবানকে পেলাম না, পেলাম না, সেও একটা দুঃখ। এই দুঃখ থেকেই আসল সুখ আসবে।"

১৩।১১।৭৫ প্রশ্ন : আপনার স্পর্শ চাই। প্রাইভেটে কথা বলতে চাই।

মা : যদি তোমার ইচ্ছা গভীর হয় তাহলে পূরণ হবে।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের কৃপার কি কোনো নিয়ম আছে ? বিপদে পড়লে কি কৃপা পাওয়া যায় ?

মা : অহেতুক কৃপা হয়। বিপদে পড়লে ভগবানের কৃপা পাবেই। ভগবানের স্মরণ, মনন।

১৪।১১।৭৫ প্রশ্ন : ভগবান নিজে আনন্দে থাকেন। আর আমাদের এই পৃথিবীতে দুঃখ দিচ্ছেন কেন ?

মা : ভাগ, ভোগী, সব কিছু উনিই। আর ভগবান আপন খেয়ালের আনন্দে থাকেন। সমস্ত ক্রিয়া তো তাঁরই। পরমাত্মা তো একই। বিশ্ব-ব্যাপক। দুঃখ, শোক, রোগ, তাপ, সব তাঁরই। অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ। পূর্ণ, অংশ। প্রভু, দাস।

১৬।১১।৭৫ প্রশ্ন : যারা তোমার কাছে আসে, তারা কি তোমার কেউ ছিল ? কেউ হয় ? না, এমনিই আসে ?

মা : হয়েই তো আছে। আসে, যায়। আসেও না, যায়ও না।

প্রশ্ন ঃ আমরা এত প্রার্থনা করি, কাছে গিয়ে, দূর থেকে, সব তোমার কাছে পৌঁছায় ?

মা ঃ ভগবানই প্রার্থনা করান, ভগবানই শোনেন।

মা আরও বললেন—"সবাই ভগবান। একই ভগবান। যেমন তোমার চুল ধরলে—ম্যায় হুঁ, আঙ্গুল ধরলে—ম্যায় হুঁ, পা ধরলে ম্যায় হুঁ, সবই তো তুমি।

অভ্যাস, শিক্ষা হতে হতে যখন অন্তর্গুরু জাগরিত হবে, তখন নিজের ভিতরে যে গ্রন্থ মজুত আছে সেই গ্রন্থ প্রকাশ হয়ে যাবে।"

এইভাবে মা'র পবিত্র সান্নিধ্যে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত শেষ হয়ে এল। সপ্তম দিনে মহানিশার ধ্যান, মা'র হাতের প্রসাদ গ্রহণ। তার পর দিন যজ্ঞ, পূর্ণাহুতি, যজ্ঞ টিকা ধারণ ও ভাণ্ডারা। সংযম সপ্তাহের পূর্ণ সমাপ্তি। আবার একটি দুটি করে দিন গুণে গুণে ব্রতীদের এক বৎসরের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার পর আবার মাতৃ-সান্নিধ্যের অনাবিল দিব্য আনন্দ।

আনন্দের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে না যেতেই মা ১৭ই নভেম্বর রাত ৮-১৫তে দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। ১৮ই নভেম্বর সকালে আমরা শ্রী মাংতুরাম জয়পুরিয়ার কাজ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। বৃদ্ধ মাংতুরামজী নয়নের জলে অবরুদ্ধ কণ্ঠে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। বললেন—আপনারা সবাই আবার আসবেন! এ-সব আমরা কিছুই করিনি সবই মা করিয়ে নিলেন।

মহানিশার ধ্যানশেষে যোগীভাই তাঁর অন্তিম ভাষণে সব সন্তানদের অনুরোধ করেছেন, প্রতিদিন অন্তত একবার মা'র নামে মালা অর্পণ করতে মা'র শরীরের সুস্থতা-প্রার্থনায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীতরুণ ঠাকুর গত ২৩শে নভেম্বর যোধপুর পার্কের মাতৃ-মন্দিরে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত এক অখণ্ড জপের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। বহু জাপক সাগ্রহে অতীব

নিষ্ঠার সঙ্গে জপরক্ষা করেছিলেন। মাতৃমন্দিরের পরিবেশ হয়ে গিয়েছিল স্বর্গীয় অনুভূতিময় ও দিব্য গন্ধময়।

অখণ্ড জপ শেষে সৎসঙ্গ শুরু হয়। রাত ৮-২০ নাগাদ রঞ্জিতদা দু' মিনিট মৌনের কথা ঘোষণা করলেন। সেই মুহূর্ত্তে আশেপাশের বাড়ী সমেত মাতৃ-মন্দিরেও সম্পূর্ণ লোড্ শোডিং হয়ে গেল। সমস্ত আলো আপনিই নিভে গেল। আবার যখন মৌনশেষে বীরেনদা প্রণাম-মন্ত্র শুরু করলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত আলো আপনিই জ্বলে উঠল।

এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর গুরুত্ব আমাদের অনেকের কাছেই খুবই গভীর।

তুমি যদি মাগো আমাদের অখণ্ড জপের কথা খেয়াল করে থাকো, তুমি যদি আমাদের সৎসঙ্গের কথা খেয়াল করে থাকো, তুমি যদি মৃদু নীলাভ আলোর মাঝে সূক্ষ্মশরীরে না আসতে ইচ্ছা করে থাকো, তুমি যদি ঐ দু' মিনিটের পরিপূর্ণ অন্ধকারে মূর্ত্ত হয়ে থাকো, তাহলেও মাগো, আমাদের শুধু একটাই মিনতি—তুমি ভাল থেকো। আমরা আর কিছুই চাই না—শুধু তুমি ভাল থেকো মাগো, তুমি শুধু ভাল থেকো।

———

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni „	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XX		...	61.50
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.75
Amar Vāni	...	...	6.00

BENGALI

Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVII		...	48.50
Akhanda Mahayājna „ „	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	...	2.50
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha		...	2.50
Vivek Churamani— „ „ „		...	3.50

GUJRATI

Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		...	4.00
—Vol. II		...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	...	...	6.00
Matri Vani (Sayings)			3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Special	7.50
Mother as Seen by Her Devotees		—Do—	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	3.00
Ma Anandamayi Lila—Hari Ram Joshi		...	15.00
A Mystic Sage—Ma Ananandamayi Shyamananda Banerjee		...	15.00

PHOTOS

Protos -various sizes	0.50 to 15.00

Registered with The Registrar of Newspapers for India under No. N4725-27/57

আনন্দবার্তা

জন্মোৎসব সংখ্যা

বর্ষ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৬ সংখ্যা ২

Statement about ownership and other particulars about periodical

ANANDA VARTA

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of publication :	Varanasi
2.	Periodicity of its publication :	Quarterly
3.	Printer's Name :	Swami Chinmayananda
	(Whether citizen of India ?) :	Yes
	(If foreigner, state the Country of origin)	X
	Address :	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1
4.	Publisher's Name :	Swami Chinmayananda
	(Whether citizen of India ?) :	Yes
	(If foreigner, state the country of origin) :	X
	Address :	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1
5.	Editors' Name :	Br. Nirmalananda, Atmananda & Dr. R. M. Pandey
	(Whether citizens of India ?) :	Yes
	(If foreigner, state the country of origin) :	X
	Address :	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1
6.	Names and addresses of individuals who own the periodical and partners or share-holders holding more than one per cent of the total capital.	Shree Shree Anandamayee Charitable Society (Regd.) Bhadaini, Varanasi-1

I, Swami Chinmayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

(Sd.) SWAMI CHINMAYANANDA

Dated 1-4-76

Signature of Publisher

ওঁমা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী জয়ন্তী মহোৎসব

আনন্দস্বরূপেষু !

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে প্রাতঃস্মরণীয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মায়ের একাশীতিতম শুভ জন্মোৎসব আগামী ১০ই মে হইতে ১৭ই মে পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে কনখল আশ্রমে সম্পন্ন হইবে। ঐ সময়ে কনখল আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র উপস্থিতি আশা করা যাইতেছে।

এই সপ্তাহব্যাপী পুণ্যময় মহোৎসবে আপনি সপরিবারে সম্মিলিত হইয়া আনন্দপরিবেশে আনন্দলাভ করুন এই অনুরোধ।

ইতি--

ভবদীয়—

শ্রীদুর্গা সিং
সভাপতি

২৫শে মার্চ্চ, ১৯৭৬
বারাণসী

শুভজন্মতিথি পূজা—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে, রাত্রি তিনটা।
(১৭ই মে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে)

যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন। সেই অনুসারে ৯ই মে হইতে ১৭ই মে পর্য্যন্ত তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

রাম পঞ্জওয়ানী
সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
পোঃ—কনখল, সাহারানপুর
(উত্তর প্রদেশ)

টেলিফোন : ৫৭৫ (হরিদ্বার)

আনন্দবার্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, *এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ—অধ্যক্ষ*

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, *এমও এ, পিও আর ও এস ও, ডিও লিট্*

ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, *এম ও এ. পিও এইচ ও ডিও*

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ, *এম ও এ, শাস্ত্রী*

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড
অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং
(ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তায় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।
* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক কমিশন বাবদ অতিরিক্ত দুই টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউন্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগদানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপপ্রিণ্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	—	৬৭
২।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ..	৬৯
৩।	মাতৃ-সৎসঙ্গ	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি ...	৭৯
৪।	মা আনন্দময়ী	—শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য ...	৮৮
৫।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ ...	১০১
৬।	কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে দুইটি উৎসব	—কুমারী গীতা ব্যানার্জ্জী ...	১১০
৭।	লহ গো প্রণাম	—শ্রীমধুসূদন নন্দী ...	১১৯
৮।	শ্রীজগদীশ্বর প্রসাদ পাণ্ডিয়ার মহাপ্রয়াণ	...	১২১

আনন্দবার্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

ত্রয়োবিংশ বর্ষ] এপ্রিল, ১৯৭৬ [সংখ্যা ২

: মাতৃ-বাণী :

[সংকলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

সংসার রাজ্যের অন্তর্গত মানুষেরই জীবজগতে অনেকের অনেক রকমের ভোগ। ইহার ভিতরও ভগবানেরই—খেলার মধ্যেই—এই সবই। মনে করা—এই এই রূপে এসেছেন। ধৈর্য্য, সহ্য দাও—প্রার্থনা করা। মনটা ভগবৎ-পরিবেশে থাক্‌লেই স্বপথে যাত্রা অনুকূল হয়। হাতে কাজ, মনে জপ, প্রয়োজনমত বাক্যালাপ।

* * * *

জপ ধ্যানে মন প্রাণ ঢেলে যথাশক্তি চেষ্টা॥ সৎপরিবেশে, সৎক্রিয়ায় শরীর মন যতক্ষণ রাখা যায়। যাত্রীর যাত্রা পূর্ণ হওয়ার তীব্র গতি হওয়া। মন লাগুক না লাগুক, জপ ধ্যান স্মরণ করিয়া যাওয়াই।

* * * *

ঠাকুর যা করেন তাই করা। শুভ মূহূর্ত্তে তিনি কৃপা করিবেন। একনিষ্ঠ হইয়া ক্রিয়াতে ব্রতী থাকা। অনেক সময় গুরু যোগ্য করিয়া

নেওয়ার জন্যও কোনও ক্রিয়া দেন। শুভ মূহূর্ত্ত কখন—অপেক্ষা করা। ভগবানের দিকের স্পর্শ গ্রহণের জন্যই তো লক্ষ্য নিয়ে বসা। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া যায় নিজের চেষ্টা—যোগ্যতার জন্য, সাড়া পাবার জন্য।

* * * *

আসল নেশায় যাহারা লাগিয়া থাকিতে চায় তাহাদের আর উপনেশার আশ্রয় নিতে হয় না। ভেজালের আশ্রয় তো ভেজালই বৃদ্ধি করে কারণ সব দিকই তো অনন্ত। সাচ্চা খাঁটী জিনিষ যাহারা চায় তাহারা নিজেরাই তীব্রভাবে সাধনার উন্নতির দিকে যাত্রা করে।

* * * *

এ শরীরের আত্মা সকলের আত্মা—মায়ের কাউকে না হলে চলে না।

* * * *

ভগবৎ-প্রাপ্তি সত্যলাভের যাত্রীদের এখানে একটু নিয়ম ও আদর্শ জীবন হওয়ার জন্য—কেহ যদি তাহাদিগকে বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি দান করিতে ইচ্ছুক হন, সোজা তাহাদের জানাইয়া দেওয়া—আমাদের এজাতীয় ভাবে গ্রহণ করা নিষেধ, আমাদের ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্তিই জীবনের লক্ষ্য।

* * * *

যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম, পাপ, বাসনা ভগবৎনামে ক্ষয় হয়। প্রদীপ জ্বললে যেমন সহস্র বছরের অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়, তেমনি ভগবৎ নামে কোটী জন্মের তমো নাশ হয়।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

৺অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত

কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন

২৮শে আষাঢ় মঙ্গলবার (ইং ১২।৭।৪৯)। আজ বেলা ১২টার সময় দিল্লী হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম, বন্ধুবর মনোমোহন আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আমাদের অপেক্ষায় সে নিজেও অনাহারে ছিল। ভূপতিবাবুও কলিকাতা হইতে গতকল্য আসিয়াছেন। যাহা হউক আমরা শীঘ্র স্নান সমাপন করিয়া মনোমোহনের বাসায় গিয়া আহার করিলাম। রাত্রি দশটায় শ্রীশ্রীমা আসিলেন।

জাগতিক বিদ্যাভাসের সার্থকতা

৩০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার (ইং ১৪।৭।৪৯)। সকালবেলা বাজার এবং গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া আশ্রমে গেলাম। তখন বেলা ১০টা হইবে, তখনও শ্রীশ্রীমা হল ঘরে আসেন নাই, একটু পরেই আসিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আসিয়াছেন। তিনিও তখন হলঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি আরও অনেকে এখানে ছিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীর বেশ নাদুসনুদুস গোপালের চেহারা। (সকলের হাস্য) বাবাজী পুঁথি পুস্তকের ধার ধারে না, বলে "বহি ত বয়ে যায়।" কিন্তু আমি

বলি বহিকে আমরা যেমন বহন করিব, আবার অনেক সময় বহিও আমাদিগকে বহন করিয়া নিয়া যায়। কোথায় ? না সেই পরমপদের দিকে। বাবাজী বলে যে বহি পড়িয়া কিছু হয় না। এক অর্থে কথাটা ঠিক, আবার অন্য অর্থে কথাটা ঠিক নয়। কোথায়ও যাইতে হইলে যেমন হয় টাইম-টেবিল দেখিতে হয় কিম্বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সেইরূপ ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে হয় সাধুদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় কিংবা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। এই হিসাবে সদ্‌গ্রন্থের উপকারিতা আছে। জাগতিক বিদ্যালাভ করিতে গেলেও ত তোমাদের ভিতরে একটা দিক্ খুলিয়া যায় যদিও ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আপাততঃ দেখা যায় না, কিন্তু জাগতিক বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উঠে তবে ঐ জাগতিক বিদ্যার খোলা পথ দিয়াই উহা তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে। সেইজন্য বলি সমস্ত দিক্ কাজ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কোন না কোন প্রকারে ভিতরের পথগুলি খুলিয়া রাখা ভাল। বৃষ্টির জল বাহির করিবার জন্য নালা তৈয়ার করিলে একদিকে যেমন উহা দিয়া বৃষ্টির এবং অন্যান্য নোংরাজল চলিয়া যায়, আবার প্লাবনের সময় ঐ পথ দিয়াই গঙ্গা বা সমুদ্রের জল প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই জাগতিক কাজের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করিলে ঐ বুদ্ধিও একদিন ধর্ম্মের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে। কারণ সবই যে তিনি। তিনি যে কোন ভাবে, যে কোন স্থানে নিজকে যে কোন সময় প্রকট করিতে পারেন। এই দেহের কথাই ধর না। এ দেহের ত লেখাপড়া বা শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই যে উহার সাহায্যে এ দেহ কিছু গ্রহণ করিবে, তবুও এ দেহ যাহা লইয়া থাকিত, তাহার ভিতর দিয়াই ইহা যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করিত। সেইজন্য উদাহরণ দেওয়ার সময় এ দেহ ঘরকন্নার জিনিষপত্রাদির সাহায্যই বেশী লয়। যে ভগবৎভাব হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং হঠাৎ নিভিয়া যায় এবং যাহার কোন স্থায়ী ফল থাকে না তাহা বুঝাইতে উহাকে পাটকাঠির আগুনের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকি, আর যে ভগবৎভাব ধীরে ধীরে প্রকাশিত এবং

স্থায়ীভাবে থাকে তাহাকে কাঠের আগুনের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকি। এ দেহ যে সব উদাহরণ দেয়, তাহা এই জাতীয়।

তারপর এ দেহ যখন বৌ সাজিয়া ছিল, তখন ত এ দেহের ভিতর দিয়া জপ, পূজা ইত্যাদি সমস্ত আধ্যাত্মিক কাজগুলি হইত। তখন দেখা গিয়াছে যে এ দেহ ঐ গুলি লইয়াই দিবারাত্র পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া অন্যান্য মেয়েরা এ দেহকে বলিত, 'এ আবার কেমন জপ বা পূজা করা! আমরাও ত মন্ত্র পড়িয়াছি, আমরাও ত পূজা করি কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা সকল সময় ঐ লইয়া পড়িয়া থাকি?' উহার উত্তরে এ দেহ বলিত—মন্ত্র ত একটা বীজের মত। বীজ পুতিলে যেমন উহা হইতে গাছ বাহির হয় সেইরূপ মন্ত্র সাধনা করিলেও বীজ হইতে গাছ বাহির হওয়ার মত প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ গুলি ত অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। তাই যাহার ঐরূপ হয় সে উহা লইয়া মাতিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তোমরাও লক্ষ্য করিয়াছ যে বীজ হইতে চারা গাছ যখন হয় তখন বীজ ফাটিয়া উহা হইতে সূতার মত অঙ্কুর বাহির হইয়া মাটি ভেদ করিয়া সোজা উপর দিকে উঠিতে থাকে। কখনও কখনও ঐ অঙ্কুরটি বাঁকা হইয়া বীজকে জড়াইয়া পরে সোজা হইয়া উঠিয়া থাকে। মন্ত্রের বেলায়ও সেই রূপ। মন্ত্র জাগরণকে তোমরা কুণ্ডলিনী জাগরণ বল। উহাও অঙ্কুরের মত কখনও সোজা হইয়া কখনও বা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরে উঠে। এই ভাবেও কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়। আবার কেহ কেহ বলে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রার মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই আরম্ভ হয় না। এ দেহের ত কোনও মতের সঙ্গেই বিরোধ নাই, তাই এ দেহ বলে যে—হাঁ, তাহাও হইতে পারে। কি অর্থে হইতে পারে জান? বীজ হইতে গাছ বাহির হইয়া যখন উহা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আবার ঐ গাছে ফল, বীজ হয় এবং ঐ ফল, বীজ, অনন্ত গাছ. ফল বীজের সূচনা করে অর্থাৎ ঐ ভাবে গাছের অনন্তত্বের দিকটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইরূপ খণ্ডশক্তি সহস্রার মধ্যে গিয়া

উহার অনন্ত গতি, স্থিতি প্রকাশ করিয়া দেয়। এই প্রকাশের দিকটাকে কেহ যদি কর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করে তাহাও দোষের হইবে না।

অজ্ঞান এবং জ্ঞানাতীত অবস্থা

অরুণ বাবু—গতকল্য যে কথা হইয়াছিল, উহার মধ্যে আমার বিশেষ বক্তব্য এই ছিল যে অজ্ঞান নাশ করিতে যেমন জ্ঞানের প্রায়োজন সেই রূপ পরে জ্ঞানকেও ত্যাগ করিতে হয়। যেমন শরীরের ময়লা উঠাইতে সাবানের প্রয়োজন হয়; এখানে ময়লাটা হইল অজ্ঞান আর সাবানটা জ্ঞান। সাবান দিয়া ময়লা উঠান হয় সত্য, কিন্তু শেষে জল দিয়া সাবানকেও ধুইয়া ফেলিতে হয়।

এই কথাগুলিতে সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদা প্রভৃতি অনেকেই আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন সাবানটাকে ত আর জ্ঞান বলা যায় না, উহা কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধি করিতে হয়। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন "হাঁ, সাবানটা জ্ঞান নয়। যদিও উহা ময়লা উঠাইবার একটা উপায় মাত্র কিন্তু উহা নিজেও ময়লা। উহাকে সেবা কর্ম্ম ইত্যাদি বলিতে পার। জল দিয়া ময়লা এবং সাবান ধুইয়া ফেলিতে হয়। এই জলই হইল জ্ঞান-গঙ্গা। কাজেই জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই অজ্ঞান চলিয়া যায়।"

অরুণ বাবু—জ্ঞানের প্রকাশ হয় কিরূপে?

মা—ইহা স্বয়ং প্রকাশ।

অরুণ বাবু—এই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানই-বা চলিয়া যায় কি ভাবে?

মা—এই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানে যদি পূর্ণভাবে স্থিতি লাভ করা যায় তখন জ্ঞান আর অজ্ঞানের কোন প্রশ্নই থাকে না।

অরুণ বাবু আমিও ত তাহাই বলি। যখন আমি সদ্যোজাত শিশু রূপে জন্ম গ্রহণ করিলাম, তখন ত অন্ন, বস্ত্র, পুঁথি, পুস্তক—কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই; অথচ সবই আপনা আপনি জুটিয়া গিয়াছে সেইরূপ—

মা—একথাটা ঠিক হইল না। তুমি যে বলিতেছ যে জন্মের সময় তুমি অন্ন, বস্ত্র কিছুই সঙ্গে করিয়া আন নাই—ইহা ঠিক নয়। আমি বলি তুমি জন্মগ্রহণের পর এ যাবৎ যাহা কিছু চাহিয়াছ ও পাইয়াছ, তাহার একটা পুটুলি সঙ্গে লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। (সকলের হাস্য) তুমি জান আর নাই জান, ঐ রূপ যে একটা পুটুলী সঙ্গে ছিল তাহা নিশ্চিত। তবে একথা সত্য যে ঐ পুটুলীতে যাহা ছিল না এরূপও কোন কোন জিনিষ তুমি জন্মের পর সদ্‌গুণে পাইয়া থাকিতে পার।

অরুণ বাবু– আমি যদি অন্যের হুকুমে কাজ করি তবে উহার ফলাফল আমার নয়। সেজন্য আমি ভোগ করিব কেন ?

মা—তুমি যাহাকে অন্যের হুকুমে কাজ বলিতেছ—উহারই বা স্পষ্ট ধারণা কই ? সেইজন্য দেখা যায় যে অন্যের হুকুমে কাজ করিলেও ভোগফলটা নিজের উপর থাকিয়া যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য বুঝা যায় যে, যে কাজটা করা হইতেছে উহা ত আমার নিজের নয়। আমি যন্ত্রমাত্র, কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হয় না বলিয়া কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। যখন ধারণা হয় যে আমি যন্ত্র বই কিছু নই এবং যন্ত্রী তিনিই, তখনই বলিতে হইবে যে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে। এই অবস্থায় কর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে না।

ইহার পর অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। এদিকে বেলাও অনেক হইয়াছে দেখিয়া মায়ের আহারের জন্য তাগাদা আসিল। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

জাগতিক হিসাবে সমষ্টিভাবে জীবের কল্যাণ সম্ভবপর নয়

বিকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা নীচে আসিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া অনেকেই বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। অরুণ বাবু এ বেলাও মার সঙ্গে নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তিনি

মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি? অনেক সময় বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যেমন পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্যের সহিত সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য। আমার উভয়ের সহিত বিবেক যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে উহার সহিত সংঘর্ষ। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি?"

মা—এই প্রশ্নের একটা দিক হইতে এরূপ বলা যায় যে যা হয়ে যায়। তুমি জগৎকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন তুলিতেছ কি না, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই এখানে সকল বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়াই জগৎ। কাজেই এখানে সকলেরই এক কর্ত্তব্য হইতে পারে না। জগতের দুঃখ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করে যে এমন কিছু করা যায় না যাহা হইতে এই দুঃখ দূর হয়? কিন্তু কাজে দেখা যায় যে এই ভাবের উদয় হইতে যে কাজ হয় উহাতে যাহার দুঃখ মোচন হইবার তাহারই হয়। সকলের পক্ষে সমান হয় না। যে দুই এক জনের উপকার হয় তাহাও তাহাদের কর্ম্মফলের জন্য। ঐ ফল তাহাদের প্রাপ্য বলিয়াই এইরূপ যোগাযোগ হয়। এমনও দেখা যায় যে কেহ কাহারও উপকার করিতে গিয়া তাহা করিতে পারে না, কারণ যাহার উপকার করিতে চাহিতেছে তাহার কিংবা তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বাধা আসিতেছে। জল-প্লাবন হইলে যেমন কতকগুলি জায়গা জলে ডুবিয়া যায় আবার জল কমিয়া গেলে সেগুলি যেমন পূর্ব্বের অবস্থায় ফুটিয়া উঠে, এ জগতের ব্যাপারও সেইরূপ। এই জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাজনেরা ত কতবার নূতন নূতন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সমষ্টিভাবে জগতের দুঃখ দূর হয় নাই। সাময়িকভাবে উহার একটা ফল দেখা গেলেও কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যে জগৎ, সেই জগৎই আছে।

অরুণ বাবু—হাঁ, মা, জগতের মঙ্গল করিতে গিয়া কতজনকে ক্রুশবিদ্ধ হইতে হইয়াছে, গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দূর দূর পল্লীগ্রামে কতলোক যে এই ভাবে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মা—হাঁ, তাহা ত হইতেছেই। তোমাদিগকে আরও একটা কথা বলিতেছি- লোকে যে এখন স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করার পক্ষপাতী—ইহাও কিন্তু সর্ব্বাংশে মঙ্গলজনক নয়। লোকেরা আজকাল স্বামী, স্ত্রী এবং নিজেদের ছেলেপেলে লইয়াই সংসার করাই সুখের মনে করে। কিন্তু এই ভাবে সংসার করিতে গিয়াও দেখে যে এখানে জ্বালা-যন্ত্রণার অন্ত নাই। আবার স্বামীর পরিজন লইয়া সংসার করিতে গেলেও কষ্ট হয় সত্য; কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেতে ধৈর্য্য ও সংযম শিক্ষা হয়—উহার মূল্যও কম নয়। অনেকে আবার দশজন লইয়া সংসার করিতে গিয়া শেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সংসার হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ নানাভাবেই কিন্তু সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। কাজেই সংসারে যে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—ইহাও ভগবানের কৃপা মনে করিতে হইবে।

অরুণ বাবু—তোমার কথায় মনে হয় যে বিবাহ এবং সংসারাদি করা ভাল নয়।

মা—এমন কথা ত আমি বলি নাই।

অরুণ বাবু—সন্ন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট?

মা—সকলের জন্য ত এক পথ নয়। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে ভালমন্দ বিচার চলে না। কেহ বিবাহ না করিয়াও বিবাহিত, আবার কেহ বিবাহ করিয়াও সন্ন্যাসী। (সকলের হাস্য)

অরুণ বাবু চিরকুমার।

জন্মান্তরবাদ

৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার, (ইং ১৫।৭।৪৯)—আজ বেলা ১১টার সময় মা হলঘরে আসিলেন। আমরা অল্পসংখ্যক লোক ঐখানে উপস্থিত ছিলাম। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, গতকল্য জন্মান্তরের কথা উঠিয়াছিল কিন্তু কোন আলোচনা হয় নাই। আজ ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

হউক। খৃষ্টানদের মতে পূর্ব্বজন্ম নাই। তাহারা বলে যে মৃত্যুর পর সকলকেই বিচারের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় এবং যখন সেই দিন আসে তখন সকলেই কবর হইতে উত্থিত হয় এবং বিচারের ফলে কেহ নরকে কেহ বা স্বর্গে গমন করে। ইহাদের যে পূর্ব্বজন্ম হয়—এরূপ কোন কথা উহাদের শাস্ত্রে নাই।

মা—অতি সত্য কথা।

শাস্ত্রী মহাশয়—আমাদের মধ্যে আবার লোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে বলা হয়।

মা—হাঁ, সত্য ত একই।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে সমর্থন করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। মা আমাদের দুইচারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা তাঁহার কথা বুঝিতেছি কি না। আমি বলিলাম যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহাই বলিলেন।

মা—বুঝিতে গেলেই বোঝা বাড়ে। (সকলের হাস্য) তাই নয় কি? লোকে মন দিয়া বোঝে। মন কিনা মানিয়া নেওয়া। আবার মনকে মান অর্থাৎ অভিমান বা অহঙ্কার বলিতে পার। কাছেই মন দিয়া বুঝা আর কিছুই নয়, শুধু বোঝা বা ভার বাড়ান। এক সত্যকেই লোকে সংস্কার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ করে।

শাস্ত্রী মহাশয়—হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস যে কাশীতে মৃত্যু হইলেই শিবলোক প্রাপ্তি হয়। এখন, কাশীতে যদি কাহারও মৃত্যু হয় এবং তাহার যদি এই জাতীয় সংস্কার না থাকে তবে কি তাহার শিবলোক প্রাপ্তি হইবেনা?

মা—কাহার যে কি সংস্কার আছে, তাহা তোমাদের জানা নাই। যদি কোন সংস্কার না থাকে তবে ঐ লোকটির কাশীতে আসা হইল কেন? এজন্মে হয়ত তুমি দেখিতেছ যে এ সব বিষয়ে তাহার কোন বিশ্বাস নাই,

কিন্তু এ জাতীয় কতখানি বিশ্বাস লইয়া যে সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাত তোমার জানা নাই। সেইজন্য বলা হয় যে, কাহার কি গতি হইবে তাহা এক জন্মের কর্ম্ম দেখিয়া বলা যায় না। কেহ হয়ত কর্ম্ম শেষ করিতে জন্ম গ্রহণ করে। কেহ বা কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেইজন্য বলা হয় কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মভোগ। জন্মান্তর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর একদিন এই কথা তুলিও।

সাধন ব্রহ্মচারী—আমরা যে কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করি ইহা বোধ হয় ভগবান্ চান না। (সকলের হাস্য)

মা—সত্যি কি তোমরা মুক্তি চাও ? হরিবাবার লোকেরা যে সব লীলা করে তাহার গল্প তোমার মনে আছে কি ? নারদ কেমন করিয়া শেঠজীকে শেষে জোর করিয়াই স্বর্গে লইয়া গেল, কারণ ইচ্ছা করিয়া কেহই এই জগৎ ফেলিয়া স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত নয়।

সাধন—আমার কাছে যদি নারদ এখন আসেন তবে আমি এখনই তাঁহার সহিত বৈকুণ্ঠে যাইতে প্রস্তুত আছি।

মা—হাঁ, ঐ শেঠজীর মত। (সকলের হাস্য)

এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ হাস্যালাপ হইল। মনে হইল আজ যেন মার কথাগুলি জমিয়া উঠিতেছে না। কোন প্রসঙ্গ ধরিয়াই মা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছেন না। কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, "এবার দিল্লীতে কথা উঠিয়াছিল অভাব সম্বন্ধে। অভাব বোধ সকলের মধ্যেই আছে। উহা পুরুষের মধ্যে যেমন স্ত্রীলোকের মধ্যেও তেমন। স্ত্রীলোককে তোমরা অবলা বল না ? কারণ সে একজন না একজন অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। পিতাই হউক, স্বামীই হউক বা পুত্রই হউক—তাহার একটি অবলম্বন চাই। এজন্য স্ত্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। কারণ সে নিজেই অবলা বা দুর্ব্বল। সে অপরকে বল দিবে কোথায় হইতে ? অবশ্য

তাহার যদি শক্তিসঞ্চয় হয় তবে আর সে অবলা থাকে না এবং তখন তাহার দীক্ষা দিবার ক্ষমতাও হয়। সে আলাদা কথা। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই থাকে। কাজেই তাহার সাধনা হইল নিজের মধ্যে যে পরম পুরুষ আছেন, তাঁহাকে জাগাইয়া তোলা; পরমপুরুষকে জাগাইয়া উহাকে শক্তির সহিত যুক্ত করা। আবার পুরুষের মধ্যেও অভাব বোধ আছে। তাহারাও স্ত্রীলোক হইতে সেবা চায়। স্ত্রীলোক যেমন পুরুষ চায়, পুরুষও সেইরূপ স্ত্রীলোক চায়। উভয়ের মধ্যেই অভাব। স্ত্রীলোককে যেমন তাহার নিজের মধ্যে যে পরমপুরুষ আছেন, তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, পুরুষকেও সেইরূপ তাহার মধ্যে যে মহাশক্তি সুপ্তভাবে আছেন, তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়। এইরূপ পরমপুরুষ এবং মহাশক্তির মিলন হইতেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য বলা হয় সীতারাম, শিবদুর্গা ইত্যাদি।"

(ক্রমশঃ)

—— ০ ——

"সত্যলাভের ইচ্ছাই মানুষের দিক হওয়া উচিত। নিত্য গুরুদত্ত ক্রিয়ায়য় ব্রতী থাকাই আলো পাওয়ার পথ। আবেদন যাহা সর্ব্বদা তাহার কাছেই করা"

—শ্রীশ্রীমা

মাতৃ সৎসঙ্গ

(১৪)

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

প্রয়াগ-ত্রিবেণীতটে অর্ধকুম্ভ মেলায় মাতৃ-সৎসঙ্গ

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ পর্যন্ত প্রয়াগের ত্রিবেণীতটে অর্ধকুম্ভ মেলায় মাতৃভক্ত স্বর্গীয় ৺ডাঃ পান্নালাল মহাশয় মাতৃ-সৎসঙ্গের খুব সুন্দর আয়োজন করেন। আমি এখানে শুধু ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ এর সকালের সৎসঙ্গের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। যথাসম্ভব মার শব্দ রাখারই আমি চেষ্টা করেছি। মার মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দই এখানে লেখা হয়েছে কি না তা আমি শপথ করে বলতে পারি না। যেমন গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ থেকে লোকেরা নিজের শক্তি অনুসারে গঙ্গাজল নিয়ে থাকে ঠিক তেমনি আমিও মার কথামৃতরূপী গঙ্গা—প্রবাহ থেকে নিজের শক্তি অনুসারে যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি ততটাই লেখার চেষ্টা করছি। সুতরাং ভুলের জন্য পরমকৃপালু মার শ্রীচরণকমলেই ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮, মা সৎসঙ্গে বসে আছেন। মায়ের ভক্তগণ মার সদুপদেশ শোনার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে বসে আছেন। ডাঃ পান্নালাল এলাহাবাদের ন্যায়াধীশের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ডাঃ পান্নালাল বললেন—মা, ইনি এখানকার ন্যায়াধীশ। কিছুদিনের মধ্যেই এঁর পেনশন্ হবে।

মা—সত্যিকারের পেনশন্ প্রাপ্ত করার চেষ্টা কর। বাস্তবিক পেনশন্ অর্থাৎ ভগবানের সরকারের পেনশন।

ডাঃ পান্নালাল—কোন্ সরকার ?

মা—এখানের সরকার, যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, তিনিই সরকার।

ন্যায়াধীশ—আগে চাকরী করলে তবেইনা পেনশন পাওয়া যায়।

মা—হ্যাঁ, আগে চাকরী করবে, তবেইতো পেনশন পাবে।

ন্যায়াধীশ—ডাক্তার পেয়ে গিয়েছি। নারায়ণ গুরু হয়েছেন।

ডাঃ পান্নালাল—আমি বলেছি যে চোখ বন্ধ করে গুরুর আজ্ঞা পালন করুন।

মা—বিচারশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন করার চেষ্টা কর। গুরু করার সময় পূর্ণ বিচার করে নেওয়া উচিৎ। একবার গুরু গ্রহণ করার পরে গুরুর আজ্ঞা পালন করাই কর্ত্তব্য। যখন কোনো কুমারী মেয়ের বিয়ে হয়, আমরা তখন তার পতির জন্য দেশ-দেশান্তরে খোঁজ করি। সম্পূর্ণ খোঁজের পর যখন তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তারপর সারা জীবন তাকে পতির সেবাতেই থাকতে হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর তাকি কখনো ভঙ্গ করা যায় ? এই রকমই গুরু কোনো শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন আর শিষ্য যদি বলে, "আমি দীক্ষা তো নিয়েছি কিন্তু আমার কোনো কাজ হয়নি" তাহালে আমি বলব সত্যিকারের দীক্ষাই হয়নি।

ডাঃ পান্নালাল—গুরু করার পরে যদি কাজ না হয় তবে ?

মা- তবে সত্যিকারের বিয়েই হইনি। বিবাহ অর্থাৎ গুরুর থেকে মন্ত্র প্রাপ্ত করা। মন্ত্র উচিৎরূপে প্রভাবকারী হয়নি। কোন কোন সময়ে এমনও হয় যে বিয়ে করতে বসল আর পরে বর পালিয়ে গেল।

প্রঃ - আমি তো খুব বিচার করে গুরু করেছিলাম, কিন্তু এখনও আমার

কোনো কাজ হয়নি। গুরুর আজ্ঞা পালন করেও কিছু হলনা। এইজন্য আমায় কি অন্য গুরু করতে হবে ?

মা—অন্য গুরু করার বিচার যখন আসছে তখন বুঝতে হবে যে তোমার বাস্তবিকরূপে গুরুদীক্ষা হয়ইনি, বাস্তবিকরূপে বিয়ে হয়েইনি, অন্যথা অন্য বিয়ে করার বিচার কেন আসবে ? অনেকে বলে যে গুরু দীক্ষাতো দিয়েছেন, কিন্তু কিছু হয়না। সাধনাতে ব্যাকুলতার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। দীক্ষা নেওয়ার পর এইরূপ ব্যাকুলতা এলে খুব ভাল। বিদেশে থাকতে যায়, কিন্তু সেখানে ভাল লাগেনা। এইটিই ব্যাকুলতার চিহ্ন।

প্রঃ—অনেকদিন হল পতি বিদেশে গেছেন। সেখানথেকে কোন খবর আসে না। কত পত্র লিখেছি একটিরও উত্তর আসেনি। এই অবস্থায় অন্য আরেকটি পতি করা উচিৎ নয় কি ?

মা—গঙ্গার তটে একটী মহাত্মা থাকতেন। মহাত্মাজীর কুটীয়া থেকে একটু দূরে একটি ছোট গ্রাম ছিল। তাতে একটি স্ত্রী থাকত। তার পতি কয়েক বছর ধরে বিদেশে ছিল। স্ত্রী যখন ছোট বালিকা, তখনই তার বিয়ে হয়ে যায়। এখন সে পূর্ণবয়স্কা। পতির কোন খবরই পাওয়া যেত না। তার মনে এই ভাবের উদয় হল যে আরেকটি বিয়ে করি কি না। মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। শেষে গঙ্গাতটের মহাত্মার উপদেশ নিতে গেল। সেই স্ত্রীলোকটী যেখানে দাঁড়িয়াছিল তার একটুই দূরে নির্মিত কুটীয়া থেকে সেই মহাত্মা বের হলেন। তার হাতে জলপান করার পাত্রটী ছিল। সেটী তাঁর হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। মহাত্মাজী সেই ভাঙ্গা পাত্রটীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাই দেখে স্ত্রীলোকটী মহাত্মার কাছে গেল ও জিজ্ঞাসা করল "মহারাজ! কি হয়েছে ?"

মহাত্মা—জলপান করার পাত্রটী ভেঙ্গে গেছে।

স্ত্রী—মহারাজ, আমি আরেকটী পাত্র আনব ?

মহাত্মা—না, যে পাত্রটী ভাঙ্গল সেটী তো আর আমি পাব না।

মহাত্মার অর্থপূর্ণ বচন শোনামাত্রই স্ত্রীলোকটির উত্থিত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। পতি তো একবার আমি পেয়েছি, তিনি আসেন না, এইজন্য আরেকটি পতি করা উচিৎ নয়। এই প্রকার বিচার করে ঐ স্ত্রীলোকটি ঘরে এল ও মহাত্মার আদেশানুসারে ভজন করতে বসে গেল। গুরু আসুক বা না আসুক, ঈশ্বর দর্শন হোক্ বা না হোক্, গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত করে কিছু না কিছু ভজন করতে লেগে যাও। মন্ত্ররূপে গুরু তো সর্ব্বদা সাথেই আছেন। তাই নিয়ে সাধনে রত থাকা উচিৎ।

প্রঃ—যখন পতি বিদেশে যান, বহুপত্র লেখার পরও কেন ফিরে আসেন না?

মা—সাংসারী পতি খবর নেন না, কিন্তু ভগবানরূপী পতি তো সর্ব্বদাই খবর নিয়ে থাকেন। ভগবানের দৃষ্টি সদা সর্ব্বদা তার উপরেই থাকে। তিনি স্বয়ংই তো প্রেরণারূপে এই সমস্ত করান।

প্রঃ—আত্মসমর্পণ কি প্রকারে করা উচিৎ? অহংকারের নাশ কি করে হতে পারে?

মা—অহংকারের নাশ কি করে হতে পারে? (এই বলে মা চুপ করে রইলেন। পরে প্রশ্নকর্ত্তাকে উপদেশের ছলে বলতে লাগলেন) বাবা তুমি তো খুব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছ, তুমিই বল। আমার তো কিছু আসে না। আমি তো একটী ছোট্ট মেয়ে।

প্রঃ - আমাদের বিদ্যা তো অপরা বিদ্যা। আমাদের পরা বিদ্যার জ্ঞান নেই।

মা—একটী সাধনা এইরূপও হয় যাতে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করা হয়। সমর্পণ হয়ে গেলে অহংকারের নাশ হয়ে যায় অথবা অহংকারের নাশ হলে ভগবানের চরণে অর্পণ হয়ে যায়।

প্রঃ—অহংকারের নাশ আগে হয় না সমর্পণের ক্রিয়া আগে হয়?

মা—যদি অহংকার থাকে তাহলে সমর্পণ কে করবে? একটী ব্যক্তি নিজের প্রযত্নের দ্বারা অর্পণ করার চেষ্টা করে। আবার আরেকদিকে এমনও হয় যে অর্পণের জন্য প্রযত্ন করতে হয় না। নিজের থেকেই অর্পণের ক্রিয়া হয়ে যায়। যখন অহংকায়ের নাশ হয়ে যায় তখন অর্পণ হয়ে যায়। এই প্রকার আত্মসমর্পণ ও অহংকারের নাশ দুটোই একই সাথে কি না?

প্রঃ—সমর্পণ করা আর সমর্পণ নিজের থেকে হয়ে যাওয়া এর মধ্যে সমর্পণ করাটাতো অহং থেকেই হয়। নিজের থেকে সমর্পণ হয়ে যাওয়া কৃপা থেকেই কি হতে পারে না?

মা - নিজে নিজে সমর্পণ হয়ে যাওয়া—এইটীতো স্বয়ং কৃপা থেকেই হয়। সমর্পণ যে করে সে সাধনভজনে খুব উন্নতি করে। 'আমার' বলতে যা কিছু আছে তা সব ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করে দেওয়া উচিৎ। জাবনের প্রত্যেক ক্ষণে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বুদ্ধি ব্যাপারে, প্রত্যেক ভাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাত্ম ভান থাকবে, ততক্ষণ সমস্ত কার্য্যে সমর্পণ বুদ্ধি রাখা উচিৎ। ভগবানকে প্রাপ্ত করার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যে পথ গ্রহণ করে সেই পথ ধরে তাতেই তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিমগ্ন থাকা উচিৎ। যে মার্গেই যাওনা কেন বেদান্তমার্গ থেকে আত্মপ্রাপ্তির মার্গ গ্রহণ কর, অথবা সমর্পণের মার্গ গ্রহণ কর। সত্যের আশ্রয় সব মার্গেই থাকে।

কোন একটি পথের আশ্রয় নেও। যদি অনুরাগ হয় তবে বিরাগ নিজে নিজেই হয়ে যাবে। বিরাগ অর্থাৎ পূর্ণ বিবেক। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যায়, তখন কি হয়? তখন বিরাগের উপরেও বৈরাগ্য হয়ে যায়। ত্যাগেরও ত্যাগ হয়ে যায়- ত্যাগও স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যায়। ত্যাগ করা আর ত্যাগ হয়ে যাওয়া এই দুটি বস্তু ভিন্ন। যতক্ষণ না নিজের থেকে ত্যাগ হয়, ততক্ষণ ত্যাগ করা ছেড়োনা। যে কোনই কাজ করতে হলে, এইরূপেই কর যেমন সমর্পণ বুদ্ধির কার্য্য, আত্মজ্ঞানের কার্য্য ইত্যাদি। যতক্ষণ ভগবৎ-

প্রাপ্তি, স্বয়ং প্রকাশ না পাও ততক্ষণ থেমো না। ব্যাস্ ত অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ থেমো না। অখণ্ড ভগবৎপ্রাপ্তি হোক এইরূপই রাস্তা ধরা উচিৎ। ক্ষুধিত ব্যক্তি ভোজন প্রাপ্ত না হলে কি শান্ত হতে পারে? তুমিও তাঁকে প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত থামবে না। খুব ব্যাকুল হওয়া উচিৎ। ব্যাকুলতারূপী অগ্নি না হলে এই পথে কেউ আসে না। এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে, যতক্ষণ অখণ্ড ভগবৎ-প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণ এই পথ ছাড়বনা। নিয়মিতরূপে শরীরকে ভোজন দেওয়া উচিৎ। ভোজন অর্থাৎ সব প্রকারের ভোজন। নিদ্রাও ভোজন। দেখা, শোনা ইত্যাদি সব কিছুই ইন্দ্রিয়ের ভোজন। এই সমস্ত ভোজন নিয়মিত ও প্রমাণমত নিয়ে, সাধারণ সাধকের এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। সাধারণ সাধকের জন্য মধ্যম পথই ভাল। অসাধারণ সাধকের কথা আলাদা।

প্রঃ—যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির রাজ্য সেই পর্য্যন্ত সমর্পণ হতে পারে, কিন্তু একটি অবস্থা এমন আসে সেখানে বুদ্ধি চলেনা। সেখানে কি করা যায়?

মা—বুদ্ধি কি জড় হয়ে যায়?

প্রঃ—না, বুদ্ধির লয় হয়ে যায়।

মা—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুদ্ধির লয় হয়। যেখানে গেলে প্রকাশ পাওয়া যায় সেখানকার কথা অমি বলছি না। যে পর্য্যন্ত প্রকাশের প্রাপ্তি হয় না সে পর্য্যন্ত জড়ে লয় হয়ে যায়। ভান থাকে না আর প্রকাশও পায়না এই সমস্ত অজ্ঞানে লয় হওয়ার লক্ষণ। যেখানে খবর থাকে না সেখানে জড়ে লয় হয়ে যায়। যেমন ঘুম থেকে উঠলে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় কিন্তু সেই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ নয়। তেমনি এইটিও এক প্রকারের ক্ষুধাই।

প্রঃ—ব্রহ্মানন্দ নয় কিন্তু ব্রহ্মানন্দের আভাস তো নিশ্চয়ই?

মা—সুষুপ্তিতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অজ্ঞানের আবরণের আনন্দ।

তুমি ধ্যানে বসলে। খুব একাগ্র হয়ে গেলে আর বাহ্যবিষয়ে ভানও থাকল না। ধ্যানের থেকে ওঠার পর খুব আনন্দ পেলে। কিন্তু যতক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি এমনটি খেয়াল রাখা উচিৎ।

প্রঃ—আমি স্বয়ং তাতে ডুবে যাই। কে কার খেয়াল রাখবে?

মা—অচেতন অবস্থায় যাওয়া তো খারাপ কথা। তুমি জড়কে ধরে নিয়েছ। জড়ে লীন হয়ে যাওয়া ভাল না। যেখানে গেলে মন প্রকাশ পায় সেখানে না গিয়ে তুমি কি করে থাক? জড় তোমাকে ধরে নিজের অধীনে করে নিয়েছে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে সুকৌশল যা তাই কুশল।

প্রঃ—"যোগ কর্ম্মসুকৌশলম্"

মা—সুকৌশলের যোগ, তারই কাজ। শাস্ত্রে কি লেখা আছে তাতো তোমরা সবাই জান। জড়তাতে মনকে লয় হতে দেওয়া মনকে paralysis হতে দেওয়ার মতই।

প্রঃ—উদ্ধার কি প্রকারে হবে?

মা—যেমন সন্ন্যাস নেওয়ার পর সন্ন্যাসী সত্য এবং অসত্যের বিবেক ক'রে ধ্যানে বসে। তেমনি মন্ত্রজপ—কর্ত্তাদের নিশ্চয় করা থাকে। অন্তে শব্দেরও অতীত হতে হবে কি না? তবুও শব্দ সাথে রেখেছে। শব্দ কি? শব্দ জ্যোতি রূপ।

প্রঃ—জ্যোতি? প্রকাশ করে দেয় কি?

মা—অক্ষর কি? জ্যোতি? কেন? তুমি স্বয়ং জ্যোতি। তুমি কে? তুমি কি শব্দের বিনা আছ? প্রকাশের অস্তিত্বও শব্দের অভাবে থাকে না। যখন ঘর্ষণ হয় তখনই প্রকটিত জ্যোতি দেখা যায়। স্পন্দন কম্পন (Vibration) কি? স্বয়ং জ্যোতিরূপ। অক্ষরও জ্যোতিস্বরূপ। রূপও জ্যোতিস্বরূপ। যদি আত্মজ্যোতি হয় তবে শব্দজ্যোতি কেন হবে না?

প্রঃ—শব্দের কি সমাধিতে লয় হয়ে যায় ?

মা—শব্দের মহাজ্যোতিতে লয় হয়ে যায়। জ্যোতিরও আগে যাও। জ্যোতি, আনন্দ, নিরানন্দ, লয়, বিক্ষেপ কোথায় থাকে ? আত্মাকেই মহাজ্যোতি বলা হয়েছে। তোমাদের শাস্ত্র কি বলে ? (সবাই হাসতে লাগলেন) এই জন্যই মহাবাক্যের আশ্রয় নেওয়া উচিৎ। মহাবাক্য শুদ্ধ স্পন্দিত (Purely Vibration) হয়। চেতনা রাখার জন্যই সাধকগণ মহাবাক্যের আশ্রয়ে থাকে কি না ? আত্মজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছায় সাধক ধ্যান করে—আমিই সেই ব্রহ্ম। এই স্মৃতি অথবা ভাবের গতিকে অগ্নির মত সদা প্রজ্বলিত রাখা উচিৎ। যদি তার জড়ে লয় হয়ে যায় তবে তার জ্যোতির দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জ্যোতি তোমার ভিতরে বর্ত্তমান আছে। যা ভিতরে আছে তাকেই প্রকাশিত করতে হবে। প্রকাশ করা মানে প্রকাশিত হওয়া। যদি তোমার জড়ে লয় হয়ে যায় তবে সমস্ত ভাব, মন্ত্র, মহাবাক্য ইত্যাদির দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। জড়তা যদি আসে তাহলে প্রকাশ কি প্রকারে হবে ? স্মৃতি, স্মরণ ইত্যাদিকে জাগ্রত রাখতে হবে যাতে জড়ে না পালটিয়ে যায়। জাগ্রত থাকলে কি হবে ? আরে! প্রকাশ কি হবে ? তুমি স্বয়ংই প্রকাশ। তুমি যখন ধ্যানে বস তখন তোমার একমাত্র লক্ষ্য আত্মপ্রাপ্তি অথবা আত্মবোধ হওয়া উচিৎ। বিচারের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা তুমি যা কিছু জান তাকে মনের ভিতর কেবল প্রজ্বলিত রাখ। এইটিই অজ্ঞানরূপী মেঘকে সরাবার একমাত্র উপায়।

মায়ের উপদেশ শেষ হবার পর একটি ভদ্রলোক মাকে বললেন, "মা, এখানে একটি নিয়ম করা হয়েছে যে ব্যক্তি বাংলা ভাষায় বলবে তাকে দণ্ডরূপে রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।"

মা—আমাকে যদি রসগোল্লা দিতে হয় আমিতো তবে (প্রশ্নকর্ত্তাকে উদ্দেশ্য করে) বাবার কাছেই চাইব। একবার আমি রেলে যাত্রা করছিলাম।

আমার সাথে যারা ছিল আমি তাদের আমার জন্য টিকিট কিনতে নিষেধ করলাম। আমি বিনা টিকিটেই গাড়িতে বসলাম। কিছু স্টেশন পর চেকর্ আসল এবং আমার কাছে টিকিট চাইল। আমি বললাম, 'বাবা, আমার টিকিট তুমিই নিয়ে এস আর তুমি স্বয়ংই চেক্ করে দাও, এই কথা শুনে সে বেচারা আমাকে বিনা টিকিটেই নিয়ে গেল। নিজের ঘরে নিয়ে আমাকে খেতে দিল আর আমাকে পরার জন্য একটি কাপড়ও দিল।

এইরূপ বার্ত্তা চলছিল। ইতি মধ্যে পূজ্য হরিবাবা ও তাঁর ভক্তগণ এসে পৌঁছালেন। মা এবং অন্যান্য ভক্তরা খুব আদর করে তাঁকে বসালেন। তারপর পূজ্য হরিবাবা একটি প্রস্তাব করলেন যে আজ মার ভক্তদের মধ্যে যাঁর যাঁর মার বিষয়ে যা অদ্ভুত অনুভব হয়েছে তাই বলবে। প্রস্তাব শুনে সকলে চুপচাপ বসে রইলেন। পূজ্য হরিবাবা ডাঃ পান্নালালকে বলতে বললেন। ডাঃ পান্নালাল বলার জন্য ইতস্ততঃ করতে করতে বললেন যে আমি এমনি সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। আজ পর্য্যন্ত কান্তিভাই একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। আমার মতে কান্তিভাই-ই কিছু বলুন।" ডাঃ পান্নালাল ও হরিবাবা আমাকে বলার জন্য আগ্রহ করতে লাগলেন। আমি লজ্জা পেলাম, মার সামনে নিজের কি অনুভব বলব? আমি কোনো প্রকারেও বলার জন্য প্রস্তুত হলাম না। ইতিমধ্যে শ্রীমতী কমলাবেন নামে একটি বোন নিজের অনুভব বলতে শুরু করলেন।

(ক্রমশঃ)

মা আনন্দময়ী

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কোন সামর্থ্য আমার নাই। যাঁহারা অত্যন্ত সাধনপরায়ণ এবং যাঁহাদের মন ও দেহ ফুলের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল তাঁহারাই কেবল শ্রীশ্রীমায়ের কথা লিখিতে পারেন। এইরূপ কোন সদ্‌গুণই আমার নাই, তবুও আমার জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও প্রভাবের যে দুই একটা ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমায়েব সম্বন্ধে একখানি ছোট পুস্তক পাঠ করিয়া শিশুকাল হইতে শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ও ভাব সমাধির কথা কিছুটা অবগত হইয়াছিলাম। পরে অন্য পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে আরও বিষদ বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার আগ্রহ মনে উদয় হয় কিন্তু সময় ও সুযোগ কিছুতেই হইয়া উঠিতেছিল না। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ জহুরী নামে এক ভগবৎপ্রেমী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। তিনি আমারই অফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার সহিত প্রায়ই ঈশ্বর-কথা আলোচনা হইত। একদিন তিনি বলিলেন—"কাশীর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রম হইতে পত্রে জানিয়াছি মা বর্ত্তমানে কাশীতে আছেন এবং ২৭শে মার্চ্চ (১৯৭২ ইং) অবধি সেখানে থাকিবেন। চলুন তামরা কাশীতে গিয়া মাকে দর্শন করিয়া আসি।" মাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল

ভাবে অন্তরে জাগরিত ছিল বহুদিন হইতে কিন্তু সুযোগ পাইতেছিলাম না। শ্রীযুক্ত জহুরীর মাধ্যমে ভাগ্যক্রমে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু শুভ-কার্য্যে নানা বাধা। ঠিক এই সময়ে আমার মধ্যম পুত্র নন্দন জলবসন্তে অসুস্থ হইয়া পড়িল। হাতে সেই সময়ে টাকাপয়সাও নাই. কাশীতে যাওয়া আমার গাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য খরচ আছে। এই সকল কারণে কি করিব না করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। টাকাপয়সার বিষয়ে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জহুরী বলিলেন,—"সব টাকাই তো মায়ের টাকা—আমাদের কাছে গচ্ছিত থাকে মাত্র। টাকা যখন আমার বা আপনার নহে এবং আমার কাছে যথেষ্ট টাকা গচ্ছিত আছে তখন মাকে দর্শন করার কাজে এই টাকা ব্যয় করতে তো কোন বাধা নাই। আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না– চলুন যাওয়ার ব্যবস্থা করি।" যাই হোক এক ডাক্তার বন্ধু অসুস্থ পুত্রটিকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইবেন বলিলেন এবং তাহার জন্য কোন চিন্তা করিবার কারণ নাই জানাইলেন। কিছু টাকারও ব্যবস্থা হইয়া গেল। সকলই শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা। তিনি যাহাকে নিজের কাছে টানেন যাওয়ার পথে তাহার কোন বাধাই থাকে না।

২৪শে মার্চ্চ, ১৯৭২, বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩৭৮ (বাসন্তী পূজার দশমী) শুক্রবার—বৈকালে ৫টায় ধানবাদ হইতে শিয়ালদহ পাঠানকোট গাড়ীতে আমরা কাশী রওনা হইলাম। শুইবার জন্য আসন বহু চেষ্টা করিয়াও পাওয়া গেল না। একখানি টু'টায়ার কামরায় বসিবার জন্য দুইখানি আসন পাওয়া গেল মাত্র। গাড়ী ধানবাদ ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম আমরা যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উপরে দুইখানি বার্থ খালি আছে। ঐ বার্থ দুইখানি আমাদের নামে রিজার্ভ করিয়া দিবার জন্য কনডাক্টর গার্ডকে শ্রীযুক্ত জহুরী অনুরোধ করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন,—"আপনারা তো কাশীতে যাবেন, অনর্থক ১০৲ টাকা খরচ করিয়া কি লাভ।" তাঁহার বলিবার ধরণে এইরূপই মনে হইল,—"বার্থে দুখানি তো' খালিই আছে আমরা অনায়াসে ঐগুলি

অধিকার করিতে পারি—টাকা খরচ করিবার প্রয়োজন নাই।" আমরা রাত্রের আহার শেষ করিয়া ঐ খালি বার্থ দুইখানিতে নিজেদের বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাতে বার্থ রিজারভেসনের টাকা খরচ না করিয়াও আরামে ঘুমাইয়া মোগলসরাই ষ্টেশন অবধি গেলাম। আমাদের ঐ কামরাটি ছিল কানপুরের জন্য কাজেই আমরা মোগলসরাই ষ্টেশনে কামরা বদল করিলাম। রাত্রে দুইটা নাগাদ আমরা বেনারস কেন্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনেই থাকিয়া গেলাম। ভোর হইলে মুখহাত ধুইয়া চা পান করিয়া আমরা দশাশ্বমেধের দিকে রওনা হইলাম। দশাশ্বমেধে আমার ভাইঝি-র বাড়ী। ভাইঝি জামাইকে (কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—একজন নাম করা তবলা বাদক এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিশিষ্ট ভক্ত) ধানবাদ হইতে আমাদের কাশী যাওয়ার সংবাদ পত্র মারফৎ দিয়াছিলাম। বেলা প্রায় ৭টায় তাহাদের বাড়ীতে পৌছাইলাম। প্রায় ১৭ বৎসর পরে আমাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলে খুবই খুশী হইল। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া বেলা ৯টা নাগাদ শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দশাশ্বমেধ হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ভাদাইনিতে মায়ের আশ্রম।

আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বহু ভক্ত নানাস্থান হইতে মায়ের দর্শনের জন্য সমাগত হইয়াছে। আমরা উপস্থিত হইবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই করুণাময়ী মা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন—অপূর্ব্ব ভাবঘন আনন্দময়ী মূর্তি, দর্শন ও প্রণাম করিয়া আমরা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করিলাম। একজন বিশেষ সাধুকে মোটরগাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীমা গলিপথে অগ্রসর হইলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ইতিমধ্যে ফুলের মালা ক্রয় করিয়া গলিপথে ফিরিবার সময়ে মায়ের চরণে দিলাম। এবারে মা গোপাল মন্দিরের দিকে চলিলেন। মায়ের পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে দেখিলাম রাস্তা হইতে অনেকটা উপরে এক বাড়ীর বাড়ান্দায় ফুলের মালা হাতে অশীতিপর এক বৃদ্ধা মাকে মালা পরাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন

কিন্তু এই বাড়ী হইতে সিড়ি ভাঙ্গিয়া নিচে আসিতে তিনি অক্ষম। অন্তরযামিনী মা বুঝিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাড়ীর সিড়ি বাহিয়া উপরে বৃদ্ধার কাছে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা মায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার মাথায় ও গায়ে মা তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। গোপাল মন্দিরের দিকে যাইবার সময়ে কলিকাতা হইতে আগত এক ভক্ত মাকে বলেন তিনি যখন গাড়ীর জন্য হাওড়া স্টেশনে বসিয়াছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ মাকে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দর্শন করেন। তিনি ঐ মুর্ত্তি সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে মা বলিলেন, "পরমহংস"। মা ঐ সময়ে মৌনী ছিলেন। দুই একটি শব্দ মাত্র তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইত—যেমন—ভগবান, নারায়ণ ইত্যাদি। ভক্তটির কথা শুনিয়া শুধু বলিলেন,—"পরমহংস।" শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গোপাল মন্দির ইত্যাদি দর্শনের পরে আমরা পুনঃ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। মা ভিতরে নিজের কামরায় চলিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণ ভজন ও গীতা, চণ্ডীর শ্লোক শুনিলাম। পরে মায়ের কামরায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দশাশ্বমেধে ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমে কলা ও কমলালেবু প্রসাদ পাইয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাঁহার শ্রীহস্তের স্পর্শলাভের জন্য মনটা আকুল হইল। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান ও কিছু জলযোগের পরে জামাই আশুতোশ সহ পুনঃ মায়ের দর্শনের আশায় আশ্রম অভিমুখে রওনা হইলাম। আশ্রমে পোঁছাইয়া সংবাদ পাইলাম আজ মায়ের দর্শন সম্ভব নহে কারণ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মায়ের দর্শনে আসিবেন এবং মধ্যাহ্নে আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আশুতোষ তাহার এক পরিচিত স্বামীজীকে (বিভু মহারাজ) একবার মায়ের দর্শন হইতে পারে কি না দেখিবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি মায়ের কামরায় যান এবং অল্প সময় পরে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাদের বলেন। আমরা পুষ্প-মাল্য হাতে

স্বামীজীকে অনুসরণ করি। আজ দোতলার এক কামরায় মা বসিয়াছিলেন। আমরা ঐ কামরায় প্রবেশ করিয়া পুষ্পমাল্য মায়ের পদযুগলের প্রতি নিবেদন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণতঃ হইলাম। মালাগুলি তিনি গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আমাদের গলায় পরাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত জহুরী বলেন,—"মা, আমি গুরু পাব ?" মা উপরের দিকে হাত প্রসারিত করিয়া সহাস্যবদনে বলেন,—"ভগবান।" আমি আমার সাধন সম্বন্ধে বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে তিনি প্রসন্নবদনে উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলেন,—"নারায়ণ"। আমরা পুনরায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের মাথায় তাঁহার শ্রীহস্তস্পর্শ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। গতকল্য হইতে এই স্পর্শের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। আমাদের আশা পূরণ হইল। বাতাসা প্রসাদ পাইয়া স্বামীজীর সহিত ঐ কামরা হইতে বাহিরে আসিলাম। পরে স্বামীজী আমাকে বলেন,—"শ্রীযুক্ত জহুরী গুরুলাভের কথা বলাতে ও আপনি আপনার সাধন সম্বন্ধে বলিয়া মার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করাতে মা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জহুরী নিশ্চয়ই গুরুলাভ করিবেন।" এই ঘটনার ৪।৬ মাস পরে শ্রীযুক্ত জহুরী সদগুরু লাভ করেন।

(২)

কাশীতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে প্রথম দর্শনের পরে দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহাকে দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে মন ব্যাকুল হইত। বাংলা ১৩৮০ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় শুভাগমন করেন কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বন্ধু শ্রীযুক্ত জহুরী গিয়াছিল। তাঁহার মুখে সেখানের আনন্দমেলার সংবাদ কিছু কিছু পাইয়াছিলাম। রেডিয়ো মারফৎ মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত ভজনও শুনিয়াছিলাম। ১৩৮১ সালের ঝুলন উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা রাঁচীতে আসিবেন এবং ১৫।১৬ দিন সেখানে অবস্থান করিবেন খবর পাইলাম। রাঁচীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন

করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। রাঁচীতে এক বন্ধুর নিকট মায়ের সঠিক আগমনের সংবাদ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিলাম এবং তাহার নিকট হইতে উত্তরে সঠিক সংবাদও পাইলাম যে ১৭ই আগষ্ট, ১৯৭৪, মায়ের আগমন হইবে। স্ত্রী শান্তির কখনও মায়ের দর্শন হয় নাই সুতরাং তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব মনস্থ করিলাম।

বুধবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৮১, ইংরাজী ১৪ই আগষ্ট, ১৯৭৪, আফিস হইতে বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া শান্তির মুখে যাহা শুনিলাম তাহারে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মধ্যাহ্নে আহারাদির পরে সে বাড়ীতে শুইয়া আছে। শুইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নে দেখিল বাড়ীতে যেন কেহ আসিতেছেন। দরজা খুলিয়া শ্রীশ্রীমাকে সম্মুখে দেখিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া—"আনন্দময়ী মা আসিয়াছেন"—এই কথা বলিতে বলিতে আগাইয়া যায়। শ্রীশ্রীমায়ের অনেক ছবি আমাদের বাড়ীতে আছে কাজেই তাঁহাকে চিনিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় নাই। শ্রীশ্রীমা হাঁসিতে হাঁসিতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারী (বালিগঞ্জ গ্রাম্য যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ) এবং ২।৩ জন বালক ভক্তও আসিয়াছেন। শান্তি শ্রীশ্রীমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দেয় এবং নিজে ছোট শিশুটির ন্যায় মায়ের কোলে বসে। মা হাঁসিতে হাঁসিতে অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। অল্প সময় পরে সে মায়ের কোল হইতে নামিয়া তাঁহার পদযুগলের কাছে মেঝেতে বসিয়া মাকে বলে,—"মা, আমার বুকে বড় কষ্ট—মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করে। তোমার চরণ দুখানি আমার বুকে রাখ।" তাহার এই কথা শুনিয়া করুণাময়ী মা হাঁসিতে হাঁসিতে তাঁহার রাতুল চরণ দু'খানি তাহার বুকে রাখেন। তুলার ন্যায় নরম চরণদ্বয় বুকে ধরিয়া রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল,—"আমার স্বামী ও তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত জহুরীজীকে বলিতে শুনিয়াছি মায়ের চরণ সকলকে স্পর্শ করিতে দেন না কিন্তু আমাকে তো দিয়াছেন।" পরে সে মাকে বলে—"মা কাশীতে তুমি আমার স্বামী ও তাঁহার

বন্ধু শ্রীযুক্ত জহুরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলে। আমার মাথায়ও হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর।" শ্রীশ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীহস্তযুগল শান্তির মাথায় রাখিয়া নানাভাবে তাহাকে আদর করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের সুমধুর স্নেহস্পর্শে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার খেয়াল হইল এইবার মাকে খাওয়াইতে হইবে। ঐ ঘরেই মায়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। মুগের ডাল, নারিকেলের তরকারি ও ভাত আনিয়া সে মাকে বলে,—"মা আজ এই রান্না হয়েছে—এইগুলিই খাও। আরও রান্না করিতে অনেক বেলা হইয়া যাইবে।" শ্রীশ্রীমা বেশ তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে শান্তির দিকে চাহিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। মা খাইতে খাইতে অদূরে শালপাতায় জড়ানো কতকগুলি লাড্ডু শান্তিকে দেখাইয়া ঐগুলি বালকভক্ত-দিগকে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলেন। সেও মায়ের আদেশমত ঐগুলি বালকভক্তদিগকে বিতরণ করিয়াছিল। ঐ সময়ে তাহার মনে হইল আমার কাছে মায়ের আগামন বার্ত্তা পাঠাইতে হইবে যাহাতে আমি ও শ্রীযুক্ত জহুরী বাড়ীতে আসিয়া মায়ের দর্শনলাভ করিতে পারি। খবর পাঠাইবার জন্য সে বাড়ীর ফটকের দিকে গিয়া কোন পরিচিত লোকের খোঁজ করে কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। ঘরে ফিরিয়া দেখিল মা নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারী এবং বালকভক্তরাও কেহ নাই। ঠিক এই সময়ে আমাদের তৃতীয়পুত্র চন্দনের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পরেও সে চারিদেকে মাকে খুঁজিতে লাগিল। তাহার মনে হইল ইহা যেন স্বপ্ন নহে, সত্য।

(৩)

উপরোক্ত স্বপ্ন দেখিবার ১৭ দিন পরে ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার, বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের আয়োজন করা হয়। মুগের ডাল এবং নারিকেলের তরকারি ছাড়া ও আরও অনেক রকমের তরকারি, ভাজা, পায়েস ইত্যাদি করা

হইয়াছিল। স্বপ্নে দেখা লাড্ডুরও ব্যবস্থা করা হয়। লাড্ডু পাড়ার ছেলে যাহারা ঐ সময়ে আসিয়াছিল তাহাদের দেওয়া হয়। ভোগ শ্রীশ্রীমাকে নিবেদনের পরে আমরা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করি। স্বাদে, গন্ধে অমৃতময় ঐ ভোগ—মনে হইল মা উহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, দিনটা ধানবাদের ভক্ত-সমাজের পক্ষে এক বিশিষ্ট দিন ছিল। ঐ দিন শ্রীশ্রীমা রাঁচী হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টা যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার ধানবাদস্থ প্রতিনিধি ৺রমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নব-নির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধানবাদে আসিবার কোন সঠিক সংবাদ পূর্ব্বে জানা ছিল না। রাঁচীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তিতে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা প্রায় ১০-৩০ মিঃ-এ অফিসে গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ধানবাদে আসিবার কথা যখন সঠিকভাবে জানিতে পারিলাম মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বেলা প্রায় ২-১৫ মিঃ-এ তিনি ৺মিত্র মহাশয়ের রুবিসারকুলার রোডের নূতন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। কোন রকমে বেলা তিনটা অবধি অফিসে কাজ করিলাম। মনটা শ্রীশ্রীমায়ের দিকেই টানা ছিল-আর অফিসে থাকিতে পারিলাম না। ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিলাম এবং শান্তিকে সঙ্গে করিয়া ৺মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। সঙ্গে ফুলের মালা ও কিছু আপেল মায়ের জন্য নিলাম। যাইবার পথে পূর্ব্বকথামত অফিস হইতে বন্ধু শ্রীযুক্ত জহুরীকেও তুলিয়া লইলাম।

৺মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম হলঘরে শ্রীশ্রীমায়ের আসন রজনীগন্ধা ফুলের দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখা হইয়াছে—পাশে অনেক-গুলি সাদা পদ্ম ফুলও আছে। আসনের সম্মুখে কার্পেট ও সতরঞ্জ পাতিয়া ভক্তদের জন্য বসিবার স্থান করা হইয়াছে। ঘরটি ধূপের সুগন্ধে ভরপুর। শ্রীশ্রীমা ভিতরের একটি কামরায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। শুনিলাম পাঁচটার সময়ে তিনি হলঘলে আসিয়া সকলকে দর্শন দিবেন। আমরা আকুল আগ্রহে

হলঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আমাদের পরিচিত কয়েকজনও মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে আমার সহকর্ম্মি ও বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপাল সেনগুপ্তও আছেন। ক্রমে ক্রমে পরিচিত-অপরিচিত বহু ভক্তের আগমন হইল।

শ্রীমতী মিত্র ও তাঁহার দুই পুত্র আগত ভক্তদের স্বাগত জানাইতেছিলেন। এত ভীড়ের মধ্যেও তাঁহাদের সুমিষ্ট ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিল। এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করাইবার পরে ৺মিত্র মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের আগমন হইলে এই বাড়ীর গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইবে কিন্তু তাঁহার জীবিত অবস্থায় শ্রীশ্রীমাকে আনানো সম্ভব হয় নাই—মাসখানেক পূর্ব্বে ৺মিত্র মহাশয়ের দেহ-ত্যাগ হয়। যাই হোক! শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে নিঃসন্দেহে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইয়াছে।

বেলা ৫-১৫ মিঃ নাগাদ শ্রীশ্রীমা হলঘরের আসনে বসিলেন। শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবঘন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আনন্দে "জয় মা, জয় মা" ধ্বনি দিতে লাগিলাম। তিনি মৃদু-মৃদু হাঁসিয়া উপস্থিত ভক্তদের দিকে চাহিতেছিলেন—সকলের মনে-প্রাণে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই জন্যই মায়ের নাম "আনন্দময়ী"—তিনি যেখানেই থাকেন সেইখানে আনন্দের সাড়া জাগে। উপস্থিত সকলে একে একে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়া ফুলের মালা, ফুল, ফল ও মিষ্টি যিনি যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে রাখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা সুমধুর দৃষ্টিসহ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কাহারও কাহারও প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরও দিতেছেন। তাঁহার নিকটে দুইদিকে ফল ও মিষ্টি লইয়া দুইজন সেবক ও সেবিকা বসিয়া আছেন। যাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন প্রত্যেকের হাতে ফল বা মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা ফুলের মালা নিবেদন করিতেছিলেন তাঁহাদের গলায় নিবেদিত মালা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইহাও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ। এইভাবে প্রায় দেড়ঘণ্টা প্রণামের পালা চলার

পরে উপস্থিত সকলের প্রণাম করা শেষ হইলে শ্রীশ্রীমা উঠিয়া ভিতরে কামরায় চলিয়া গেলেন। আমরা কেহ ঐ হলঘরে এবং কেহ কেহ বাহিরে শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম।

(৪)

সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ মিঃ করুণাময়ী মা পুনঃ হলঘরের আসনে আসিলেন। আসনের নিকটে বসিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত ভজন করিতে ছিলেন। এবারে যেন শ্রীশ্রীমায়ের রূপ ভিন্ন আরও জ্যোতির্ময়ী। অন্যান্যদের সঙ্গে আর একবার তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম জানাইবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম। প্রণাম নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম,—"মা, দুবছর পূর্ব্বে কাশীতে আপনার দর্শন পাইয়াছিলাম।" তিনি স্মিতহাস্যে "হাঁ" বলিলেন। মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত ভজন শুনিতে আমাদের খুবই ইচ্ছা হইল। বন্ধু জহুরীয়ও এই সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইলাম। মায়ের শরীর কিছুটা ক্লান্ত থাকাতে প্রথমে তিনি মৃদু আপত্তি করিলেও পরে সকলের ব্যাকুলতায় প্রায় ১৫।১৬ মিনিট সুললিত কণ্ঠে নিম্নলিখিত ভজন করিলেন—

শ্রীগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
শ্রীগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

সদগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
সদগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

জগৎগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
জগৎগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

বিশ্বগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
বিশ্বগুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

জয় জয় জয় গুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
জয় জয় জয় গুরু স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণম মম নমঃ নমঃ ।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

শ্রীরাম স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ।
শ্রীরাম স্মরণম্ মম নমঃ নমঃ ॥

ভজনের সময়ে করুণাময়ী মায়ের শ্রীমুখ হইতে অপূর্ব্ব সুমধুর স্বর্গীয় সুরের তরঙ্গ নির্গত হইতেছিল। আমরাও সুরে সুর মিলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভজন করিতেছিলাম। মন প্রাণ আনন্দের তরঙ্গে দুলিতেছিল। কিছু দূরে থাকিলেও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব জ্যোতিমণ্ডল দেখিতেছিলাম। কখনও কখনও রঙেরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। দুই তিনবার দেখিলাম তিনি স্থির দৃষ্টিতে দূরে দণ্ডায়মান আমার দিকে দেখিতেছেন। এরূপ জ্যেতিদর্শনের জন্য আমার মনে ইচ্ছা ছিল। সেই আশা আমার পূরণ হইল। আমার স্ত্রী শান্তি শ্রীশ্রীমায়ের আসনের খুব কাছেই ছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল মায়ের রাতুল চরণ দর্শন করিয়া স্বপ্নে সে শ্রীশ্রীমায়ের পদযুগল নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। পরে শান্তি আমাকে বলে, সে যেইরূপ মায়ের চরণদ্বয় স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিল ঠিক সেইরূপ রাতুল চরণদ্বয় মা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পায়। আমরা যে যাহা আশা করিয়াছিলাম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা সকলের আশাই পূর্ণ করিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে মা আসন হইতে উঠিয়া ভিতরের কামরায় বিশ্রামের জন্য চলিয়া গেলেন। আমরা আনন্দভরা মন লইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৫)

এই প্রসঙ্গে মাতৃদর্শনের পরে আরও দুই একজন পরিচিত লোকের কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয়। বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপাল সেনগুপ্ত বলেন, বহুদিন হইতে তাঁহার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু নানাকারণে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি ঐদিন অফিসে নিজের কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। বেলা তিনটার সময়ে শ্রীযুক্ত জহুরীর কাছে মায়ের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করিয়া কিছু ফল ক্রয় করিয়া মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া যান। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে।

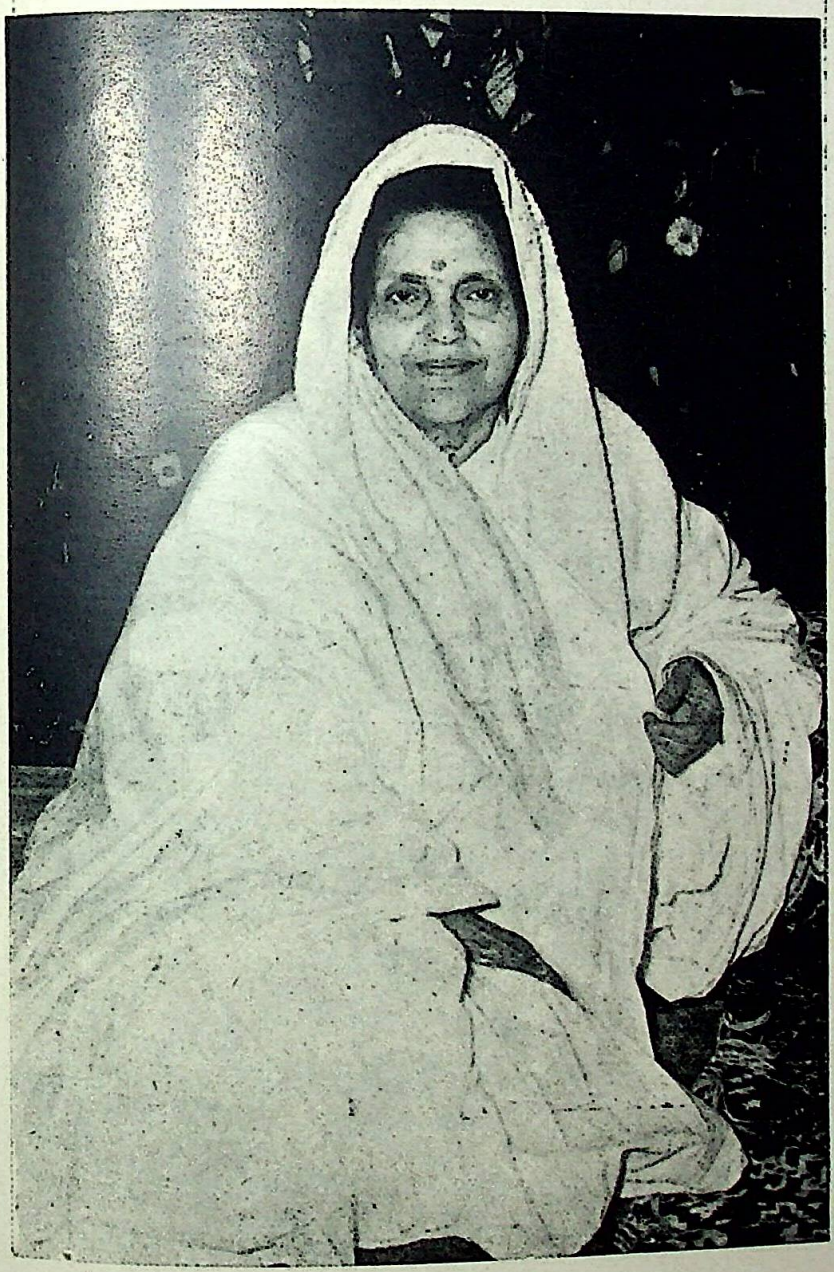

শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন ঘোষ মাতৃদর্শনের পরে বলেন,—"অপূর্ব্ব"। শ্রীযুক্ত ঘোষ আমার অফিসের সহায়ক এ্যডমিনিষ্ট্রেটিভ্ অফিসার, তাঁহার অধিনেই আমি কাজ করি। তাঁহার পুত্র অতীতানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে দীক্ষা লাভ করেছে। তিনি অন্যত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের মহিমার কথা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। সন্ধ্যার পরেই শ্রীযুক্ত ঘোষ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন হলঘরে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। একদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু লোক শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম নিবেদনের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষও একখানি ফুলের মালা হাতে ঐ শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া আছেন। মা তখনও ভিতরের ঘরে। কিছু সময় পরে তিনি হলঘরে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ভজন চলিতেছিল। শ্রেণীবদ্ধ লোকেরা একে একে মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভীড় বেশী থাকাতে শ্রীযুক্ত ঘোষকে অনেকক্ষণ ঐ শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমি কিছুটা দূরে সতরঞ্জিতে বসিয়া শ্রীযুক্ত ঘোষকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম শ্রীশ্রীমা হলঘরে আসিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষের ভাবাবেগ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ আগাইয়া তিনি মায়ের কাছে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইলেন।

আমার মধ্যমপুত্র নন্দনও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করে। অন্যান্য পুত্রেরা উপস্থিত না থাকাতে তাহাদের ভাগ্যে মাতৃদর্শন সম্ভব হয় নাই। তবে আশা হয় পরে সময়মত তাহারাও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করি নাই, তবুও আমি একান্ত মনে তাঁহার ভক্ত। আমার মনপ্রাণ প্রায়ই তাঁহার দিকে আকর্ষিত থাকে—তাঁহার প্রসঙ্গ বলিয়া বা শুনিয়া আনন্দ লাভ করি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—আমার পরমারাধ্য গুরু ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। আত্মাই একমাত্র গুরু। শাস্ত্রে আছে—"আত্মা বৈ গুরু একঃ।" শ্রীশ্রীমা পূর্ণ আত্মস্বরূপ এবং আমার

পরমারাধ্য গুরুদেবও তাহাই, কাজেই তাঁহাতে ও আমার পরমারাধ্য গুরুদেবে কোন ভেদ নাই। শ্রীশ্রীমায়ের ভজনে ও এই জগত বা বিশ্বে সকল গুরুই যে এক তাহার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

জয় জয় গুরুদেব, জয় জয় মা ॥

*

দু রকমের যাত্রী

"দুনিয়াতে দু রকমের যাত্রী। এক ঘুরে বেড়াবার মত যাত্রী—দেশ দেখা, তামাসা দেখবার জন্যই যেন। আর এক স্বভাবের যাত্রী—আপন ঘর পাবার জন্য অর্থাৎ আপনাকে জানা। ঘুরে বেড়াবার যাত্রায় দুঃখ। যতক্ষণ আপন ঘর না মিলে ততক্ষণ দুঃখ। ভিন্ন রুচি দুঃখ দেয়—দুঃখ দেয় দোষ থেকে, দুই ভাব থেকে। এই জন্যই বলা হয় দু-নিয়া।"

—শ্রীশ্রীমা

পরশন *

(১৩)

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

সারাদিন আকাশে চেয়েছিলাম, চাঁদ উঠল রাতে।

আঁধার হয়ে এলে যিনি আলোক-রূপে আসেন, 'একে চন্দ্র' তিনি। সেই চাঁদ এলেন আকাশে, আঁধার ঘুচিয়ে, পুলকে ভাসিয়ে। তার হাসি প্রাণে এসে পড়বে, হাত ধরে পথখানি দেখাবেন।

সেই কথাই কান্তবাবুকে বললাম, মায়ের আবির্ভাবে যে ভাগবতী স্রোত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে, যোগে-ভাগ্যে সেই ভাগীরথীর তট-তরু আমরা। তাই পুষ্পিত আমরা হবই।

"জেনে রাখ্, নিকটেই হোক, দূরেই হোক, যে কোন সময় এ শরীরের একটা লক্ষ্য তোদের উপর সর্বদা জেগে রয়েছে। তোমরা কাজ করে যাও, নিশ্চয় হবে।"

বললাম, ফুল ফোটাবেন তিনি। ফুল ফোটাচ্ছেন।

আরও বুঝিয়ে বললাম, চাঁদের হাসি জোয়ার এনে জনসমুদ্রের বাঁধ ভেঙেছেন। আজ দেশ-বিদেশের অগণিত প্রাণে অক্ষয় হয়ে বাস করছেন মা, তাদের প্রাণপুরুষ তিনি। এমন দৈবীসত্তার আবির্ভাবে সর্বযুগে যা হয়ে

---

* এই রচনায় উদ্ধার-চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং মায়ের উক্তি।

আসছে—স্বর্গামোদীরা তাঁর মধ্যে দেবী বা দেবতার বিগ্রহ দেখেছেন, দার্শনিকেরা মাতৃবাণীর মণি কুড়িয়ে মালা গাঁথছেন, প্রতিষ্ঠান-প্রেমিকরা তাঁকে পেয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ছেন। মায়ের দিব্য-আলোয় ভাগ্য সঁপে দিয়ে বিপুল ভক্ত-সমাজ অর্ধ-শতকের বেশীকাল আঁধারের পথে আলোয়-আলোয় চলছেন।

এত বলেও মনে হতে লাগল, কান্তবাবু যেন অন্যমনস্ক।

তিনি বললেন, চাঁদ অনেক দূরে, আঁধারই আমার কাছে। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি নাটমন্দির দাতা হয়েও সেখানে ছায়াই ফেলেছেন। সহসা মন্দিরের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ বেশ, আমার কথা ভাবতে হবে না। চরণে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকি, তুলে ফেলে দাও। যে কিছুরই ভেতর প্রবেশ করতে পারে না, তার জন্যে কেউ নাই বা চিন্তা করল।

নাটমন্দিরে কীর্তন চলছিল, সেখানে প্রবেশে কারও বাধা নাই। কিন্তু কান্তবাবুর কথা তা নয়।

বললাম, চাঁদ এ ছায়া রাখেন না। যখন আকাশে উঠে এসে মাথার পরে কিরণখানি রাখেন, তখন পাশে নিজের ছায়াটাও থাকে না। ছায়ার জন্যেই তো দুঃখ বলছেন।

কান্তবাবু মগ্নভাবে বললেন, শাস্ত্রভাষ্য, যাগযজ্ঞ, প্রতিমাতত্ত্ব, আমি কি কোনদিন বুঝব! বুঝলেই বা কি হবে! যারা বোঝেন তাদের নজর দেখি মায়ের দিকে—মা কি ও কেমন, কি তাঁর বিভূতি, তাঁর সূক্ষ্মদেহ—এই সব। নিজের কাহিল-দশা বা নিজের-ঘর দেখায় তো তাদেয় নজর নেই! সহসা আমার দিকে চেয়ে বললেন, চাঁদ মাথার ওপরে এলে কি মন্দিরের ছাদের তলায় আলো পড়ে, যাতে সেখানকার সব দেখা যায়?

রীতিমত বিস্মিত হলাম, কান্তবাবু উপমা দিয়ে কথা বলছেন! এ যে হোল নতুন খবর। কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞের মতো কথাগুলিতে তিনি যা চান সেই

নিজের ঘর দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেও, যা এতকাল চাননি সেই মাটি-ঘরের কথাও তিনি বললেন। বললেন এপথে যারা আসেনি তারা স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে আপন-আপন ঘরে একটা পদে আছে তবু। যার কুল পাব না, সেই অকূলে কেবলই ভাসার চেয়ে কাদা-ভরা ফুলে থাকাও ভাল।

মনে হোল, অবস্থা তাকে এমন সঙ্কটে এনেছে যেখানে শ্রেয়ের পথ আর প্রেমের পথ একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাতে চাচ্ছে। আর তিনি এই উভয় সেনার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি-কর্তব্য বুঝতে পারছেন না। দিশেহারা হয়ে বললেন, 'কে আমাকে নিয়ে যাবে এই পথে এস' বলে। কাউকে দেখিনে।

সংশয়-ঘোরের সঙ্গে মিলিয়ে দিনের আলো মুছে আসছিল। প্রত্যয়ভরা স্পষ্ট রূপগুলি দিন শেষের আবছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ব্রহ্মচারী স্বামীজিদের গেরুয়া-বেশও দূর থেকে বুঝতে অসুবিধে। বাতাসে সংশয়ী সেই তার্কিকদের কণ্ঠস্বর ভাসছে। বিতর্কে মন নেই, তবু ভিতরে ও বাইরে বিতর্ক যেন পায়ে পায়ে হাঁটছে।

তার্কিকেরা কলরব করে এবারে আসছিলেন—গলায় ফুলের মালা, হাতে প্রসাদী ফল, মুখে মাখা হাসি। ঐ সব যে মায়ের থেকে পাওয়া সেই সুসমাচার উচ্চকণ্ঠে দিয়ে বললেন,—মা ওপরের ঘরে প্রণাম নিচ্ছেন। কে জানে, আপনাদেরই খুজছেন হয়তো, আপনারা বিশেষ চেনা কিনা!

ব'লে, নিম্নস্তরে হেসে এগিয়ে গেলেন, শারদ-মেঘের লঘু-ছাঁদে চলে। কিন্তু শ্রাবণ-মেঘের কালোছায়া মনের পরে মেলে। কানে সংবাদটা দিলেন, কান ম'লে দিয়ে।

কান্তবাবু নির্ভেজাল কণ্ঠে বললেন, ওরা কিন্তু ভাল মনে আমাদের যেতে বললেন না। আর, বললেই বা কি হোত! মায়ের কতো কাছে তো গিয়েছিলাম, কতো জনে প্রণামও করছিলেন, তবু তো কপালে হোল না। তিনি না দিলে নিজের ইচ্ছেয় কিছুই মেলে না।

বললাম, কেন, এরা তো নিজের চেষ্টাতে নিয়ে এলেন ফুল, মালা, প্রসাদ।

এ-কথার কান্তবাবু সিধা উত্তর দিলেন, ওরা প্রসাদের দিকে তাকিয়েছিলেন, দাতাকে দেখেন নি। প্রসাদ পেলেও স্বাদ পাননি। মায়ের কতো করুণা, ওদের কথায় এতটুকু করুণা নেই—তিনি দিলে তবে তো থাকবে।

"ব্যবহার রূপে তিনিই।.....আর তোমরা ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, যে ভাবেই অপরকে আঘাত কর, এই শরীরটাকে আঘাত করিতেছ।"

বললাম, আপনিও তো ওদের মতোই চান—মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম, মায়ের হাত থেকে ফল, তাঁর মুখ থেকে কথা—

তিনি বললেন, চাই। সোনা চেয়ে নয়, সোনা হতে চেয়ে। প্রসাদ নিতে নয়, প্রসাদ হবো বলে। ঐ দিব্যরূপের কাছ থেকে যা-হোক একটা কিছু—তাঁর হাতের ফল আমার হাতে পাওয়া—সে যে অমৃত! তা পাবার পক্ষে আমি গুণহীন জানি, তাঁর কাছে যাওয়া নিবারণও করি—হাত-পা বারণ মানে না।

আবছায়ায় তার গলা যেন ধরা-ধরা মনে হোল।

বললাম, গুণধরেরাও অমনধারা চেয়ে নাটমন্দিরে যে হাট বানালেন, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে যতো সুন্দর তেমন দেখাল না। আশ্রম শুধু অমনধারা চাওয়ার রূপটা চোখে দেখিয়ে দিলেন। মা দেখালেন।

এবার কান্তবাবু সোজা আমার ওপর চোখ রাখলেন, সে চোখে আঁধারে জল চিকচিক করছে। বললেন, রূপ? শোন তবে। রূপে রূপে প্রতিরূপেই ভালো-মন্দ ছাড়াও কি-কথা যেন, অথবা কে যেন, গোপন হয়ে আছে। সেই মধু ধরি-ধরি করেও তখন থেকে ধরতে পারছিনে। তাকে যতই বুঝছিনে ততই

বুঝছি, ওখানে মা আমায় রাখেন যদি, তবে ওখানটাতেই বাঁচি, মরি। ব্যগ্রতায় তার চোখ এবার জলে ভ'রে এল।

তিনি যখন মন্দির, গাছপালা, লোকজনের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, আমি তখন তার মুখের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সহসা তিনি বললেন, আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। তুমিও আশ্চর্য হয়ে শুনছ, কিন্তু এ-সব কি ঠিক মনে করো?

বললাম, মা বোধ হয় এমন কিছুকেই স্বয়ম্প্রকাশ বলেন।

আমার কথা শেষ হোল না, তিনি বলে উঠ্লেন—ও মধু না পেয়ে শান্তি নেই. শান্তি নেই। কতক্ষণে পাব, কেবা আমায় দেবে—তার শরণাগত আমি। আমি তার দাস।

ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন যেন মানুষটি, এমন মগ্নভাব।

বললাম, আজ অনেক হেঁটেছেন, আপনি ভাল আছেন তো?

বললেন, কেন সে ব্যথা বুঝতে পার না, মুখে যা বলতে পারিনে। আমি ভাল আছি, এতে কি বুঝবে আমার দুঃখ।

সবাইকে মায়ের প্রসাদ নিতে আশ্রম থেকে ডাকছিলেন। অন্যদিন কান্তবাবু পাখি হয়ে উড়ে যেতেন, এখন যেন কানে শুনতেও পেলেন না।

এই মানুষ সেই কান্তবাবু। আজীবন নিয়ম-পালনের বিক্রমে ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ-জয়ের আশা রেখেছিলেন। তারপর আশাহত হয়ে বললেন 'তিনি না দিলে কিছু মেলে না।' তারপর এই শরণাগতি। যে জল তিনি দুপুরে কারও চোখে দেখলে আগুন হতেন, সেই জল সন্ধ্যাবেলায় তারই চোখের কোণা ছাপিয়ে ঝরতে লাগল।

তার বিক্রম নিরুদ্দেশ। পরশনে সোনা হবার ফরমুলা আওড়ালেন না। চোখের জল মোছার চেষ্টাও নেই। কেঁদেছেন তো আগেও, তবু কাঁদলেন যেন এই প্রথম।

এ কি তবে মায়ের পরশনে!

কারণ, তাকে পরাভূতও মনে হোল না। তার দুঃখের কোল আলো করে যেন এসেছে একটি সুখ। তার বিষাদ মাকে পাবার জন্যে বলে তা হয়েছে 'বিষাদ-যোগ'।

"তাঁর চিন্তা যেখানে, সেই ভাবরূপ যে স্বয়ং তিনিই সেখানে।"

বললেন, কোথায় গেলে পাব বলো।

বললাম, মানবজীবনে কিছু যদি পাবার মতো পাওয়া থাকে, তবে যেখানে তা পেতেই হবে তারই নাম আশ্রম। আশ্রম মানুষের মা, এখানে এগিয়ে আসা মানে মায়ের কাছে হাত বাড়ানো।

"একখানিই আশ্রম। সেখানে যা চাও তা-ই আছে।"

আশ্রমের পশ্চিম ভাগ গঙ্গাতট। সেদিকে এগোতে গিয়ে দেখি, বারান্দার তলা থেকে, বাঁধানো চাতাল থেকে অনেকে ভবনের দ্বিতলে ঊর্ধ্বে চেয়ে মাকে দেখার চেষ্টা করছেন। জগতের মানুষ আকাশপানে চোখ তুলেই তো ভগবানের দেখা চাই। ওপরে আছেন মা, দক্ষিণাস্যা আশ্রম-ভবনে। ভবনের এই পূবের দিকটা জীবন্ত দেবীর বাম-হাতের প্রহরণের তলায়। কেউ আশ্রমকুলে প্রবেশ করলে এই পূর্বভাগেই পূজারতি, যজ্ঞপাঠ, সাধন-ভজন, শত কর্মোদ্যোগ। তার একটি থেকে অপরটিতে সতর্ক নিষ্ঠায় চলতে হয়, চড়াই-পথে পাথর থেকে পাথরে পা রেখে-রেখে ওপরে ওঠার মতো। যদি তা হোল না, তবে হবে না।

আশ্রমচর্যার সেই পূর্বের পাঠ পেছনে রইল। গণেশ বিশ্ব-পরিক্রমায় জিতেছিলেন তার মা-জননীর বাম থেকে উঠে এসে দক্ষিণে ব'সে। আমরাও মাতৃভবন মাঝে রেখে পূর্ব থেকে এলাম পশ্চিম ভাগে ভাগীরথী-তীরে, যেখানে মা দক্ষিণহাতের বরাভয় মেলে রেখেছেন দাক্ষিণ্যে ভরে' দিয়ে, বহুকালের পতিত জমি পদস্পর্শে ফুলের বাগান করে, নিভৃত নিলয়ে জপকুঠি বানিয়ে। দেবীর বামে যদি উদ্যোগী কার্তিকেয়, তবে এই দক্ষিণ ভাগে সিদ্ধিদাতার আসন। ওধারে সাধন-সমরে চলা, এধারে পাবনীর কূলে পৌছনো এক শান্ত সমাপ্তিতে। এধারে প্রাণস্পর্শ করবেই শান্তির কান্তি-মাখা ছবি।

"খোলা জায়গায় থাকতে চেষ্টা করবি। খোলা পাহাড়, খোলা সমুদ্র প্রাণ ভ'রে দেখবি, খোলা মনে কথা বলবি। নিতান্ত আর কিছু না পারিস, অবসর পেলেই আকাশের দিকে চেয়ে থাকবি। এরূপ করতে করতে দেখবি তোর জড়গ্রন্থিগুলির বাঁধন শিথিল হয়ে তোকে খুলে দিচ্ছে।"

আশ্রমে সেই খোলা জায়গা এই। এরপর আর পথ নেই। সামনে গঙ্গার যে আনন্দধারা বইছে তার স্রোত-পথই পথ, সেই পথ বেয়ে তিনিই নিজে পথিক, আবার তিনিই পরমাগতি।

"কেমন সুন্দর—আপনিই ঘর, আবার আপনিই যাত্রী, আবার আপনিই পরবাসী; আবার দেখ, আপনাতেই আপনি।"

আনন্দধারার কোলেই প্রাচীন বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটে বসা, ছেলের যেন মায়ের কোলে বসে মাকে পাওয়া। ধারা যেন ডাকতে লাগল, যন্ত্র চালিতের মতো নিজেরাই নিজেদের নিয়ে বসালাম ঘাটে।

কান্তবাবু বললেন, ঘাটে-ঘাটে অনেক ঘুরে শেষে এই ঘাটে, হাঁটা থেকে বাঁচতে চেয়ে এত হেঁটে শেষে এইখানে বসা।

কান্তবাবুর মুখ থেকে এমন ভাষা আগে শুনিনি।

ঘাটের নীচেই পতিতোদ্ধারিণী ধারা। সে ধারায় পৌছতে লোহার সিঁড়ির ক'টি ধাপ আছে। একদা সেই ক'টি ধাপই ধারায় পৌছে দিত, যেন

বর্ণাশ্রমের ক'টি সোপান জীবনকে পৌঁছে দিত চরিতার্থতায়। কিন্তু সেই লৌহকঠিন সোপানে চলার ইতিকথার ইতি হয়েছে। এখন সে পথের বিপদ-কারণ নিবারণ করতে সে-পথ নিষেধের শেকল দিয়ে সাবধানে রাখা।

"কখনও কখনও প্রতিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্বাসের তালে তালে নাম করিতে কাহারও কাহারও মাথা গরম হইয়া যায়। তাহার কারণ ব্রহ্মচর্যাদির অভাব। ঐ একটা আশ্রম নষ্ট হওয়াতেই বাকীগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহাদের মাথা গরম বোধ হইবে তাহারা ঐ ভাবে নাম করিবে না। তাহারা শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গা ছাড়িয়া বসিয়া নাম ভিতরে রাখিবে।"

বললাম, আজকের মানুষ তপস্যার লৌহকঠিন-পথে অমৃতলাভের ঘাটে নামতে অল্পই পারে, তাই এ আশ্রমে পুণ্যধারায় নামার ঘাটটি মায়ের বিধানে জপকুঠির পাশ দিয়ে; জপের পথ ধরে এসেছে।

"দেখনা একবার গিয়া নদীতে পড়িতে পারিলে তারপর স্রোতেই সমুদ্রের দিকে ভাসাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত নাম করিতে হয়।"

আমার সবকথাকে বিলকুল ঘোলাটে বলার এমন সুযোগ পেয়েও কান্তবাবু নীরব রইলেন। তাব'লে কথা উঠল না, তা নয়। এক পক্ষের বিপরীতে আর এক পক্ষের খাড়া থাকার মতো, ঘাটটির দুই প্রান্তে দুখানা সিমেন্টগড়া বেঞ্চ। এধারে আসন থেকে আমি বললে, ওধারের আসন থেকে কেউ বললেন, একালের মানুষ সেকালের পথে চলতে পারে না - তা নয়। বরং সেকালের পথ একালের জটিল মনের, যান-বাহনের ভার বইতে পারে না। তাই ওটা শেকলে বাঁধা।

আবছায়ায় বক্তাকে চেনা গেল না।

আধার দিনের ছবি মুছে দিলে, অল্প-আগে-ওঠা জোছনা অল্পবয়সী বালিকার পুতুল-গড়ার মতো আধারে আলো দিয়ে গাছপালা লোকজনের

ইচ্ছামতো আকৃতি গড়ছিল। চোখে পড়ল—অস্পষ্ট ভাবনায় মনে যেমন সংশয় জেগে থাকে, ওধারের আসনে তেমনই দু'তিনটি অচেনা মূর্তি ব'সে। আরও পেছনে কয়েকটি ঝাপের বিচিত্র আকৃতি, লাফ্ দেবে বলে ঘাপটি মেরে বসে-থাকা প্রাণের মতো।

পূর্বকথার সূত্র ধরে বললাম, মা একান্তে একান্তী হতে বলেন—কোণে, বনে, মনে। তাই এখানে জপকুঠি আশ্রমকোণে, ফুল-ফলের বনে। বাইরের যতো কর্মোদ্যোগ ওধারে রেখে এধারে চলে আসা যেন আপন মনের কাছে পৌঁছনো—এই জপকুঠি তাই মনেও।

সমুখের মূর্তিরা এবার যেন নড়ে-চড়ে বসলেন, সে বোধ হয় সমুচিত উত্তরের হাতিয়ার হাতে নিয়েই।

বললাম, ভয়, আনন্দ যেমন আমাদের মনে, শীত-গ্রীষ্ম বোধ যেমন মনে, তেমন এখানে বসেছি এও কিন্তু মনেই। মনের গড়া এই জগৎ, মনের লয়ে এর লয়।

"এক স্থিতি আছে—তিনি রূপ ধরুন আর নাই ধরুন—যা তাই।"

এবার অস্পষ্ট মূর্তি স্পষ্টকথা বললেন, ধর্মের নামে যতো আজগুবি কথা। সত্যের সাথে নিজের বিশ্বাস মিলিয়ে বলা আজকাল অভ্যাস। এ গল্প যাকে বলা, সেও বিশ্বাস করবে না।

বক্তা কথার সায় পেতে ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন।

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম—তাকে ভেবে নয়, কান্তবাবুকে ভেবে। তার অভিমত জানা আছে, এমন দোসর মিলে যাওয়ায় তো জোরেই বলবেন সন্দেহ নেই। জোরেই বললেনও, কিন্তু তার বক্তব্য শুনে আমি আসনের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে বসলাম।

(ক্রমশঃ)

কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে দুটি উৎসব

কুমারী গীতা ব্যানার্জ্জী

(১) সরস্বতী পূজা

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শ্রীপঞ্চমীর দিনটি প্রতিবারের মত এবারও পরম আনন্দের বার্ত্তা সহ আমাদের কাছে সমাগত হল। আকাশে বাতাসেও তার আগমনের সাড়া পড়ে গেল। সেই আনন্দের ছোঁওয়াতেই আজ শীত ও বসন্তের লুকোচুরি খেলায় মাতামাতি শুরু হল। শীত যেন পলায়নে তৎপর। প্রকৃতি তাই নিজের তুষারশীতল কুহেলিকার চাদরখানি ফেলে দিয়ে ঋতুরাজ বসন্তের আনীত নানারং-এর পুষ্পখচিত বসনখানি পরিধানে ব্যাস্ত হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতির গায়ে শীতের পরে বসন্তের আগমন, হৃদাকাশে অজ্ঞানান্ধকারের পরে জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশের মতই আনন্দদায়ক হয়। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে এই শীত ও বসন্তের মহাসন্ধিক্ষণে মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে মহাবোধস্বরূপিণী বীণাপাণি জগজ্জননী মহাসরস্বতীর পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে।

মাঘ মাসের এই দিনটিতে মহাসরস্বতীপূজার কথা দেবী ভাগবতে উল্লেখিত পাওয়া যায়। উক্ত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলছেন :—

"শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কণ্বশাখোক্তপদ্ধতিম্। জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধি সমন্বিতম্। মাঘস্যশুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভদিনেহপি চ।

পূর্বাহ্ণে সময়ং কৃত্বা তত্রাপি সংযতঃ শুচিঃ" ॥৯।৪।৩৩। ইত্যাদি। এই ভাবে আমরা অতি বিস্তারিতভাবে দেবী ভাগবতে সরস্বতী পূজার বর্ণন দেখতে পাই। নির্ণয়সিন্ধুতে এই দিনটিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়েছে। তাই এইদিনে সরস্বতী দেবীর সাথে শ্রীদেবীরও কুন্দপুষ্প দিয়ে পূজা করা হয়। এইরূপে দেবী ভাগবৎ মহাপুরাণের অনুসারে অতি প্রাচীন যুগে সারা ভারতে সরস্বতী পূজা প্রচলিত ছিল বোঝা যায়। কিন্তু মধ্যযুগ মুসলমানদের বিলাসিতার যুগ। তাই এই যুগে বাদশাহদের মহলে এই দিনটিতে মহাসমারোহে বসন্তের আগমনসূচক বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হত। তাই একে বসন্ত পঞ্চমীও বলা হয়। এইদিনে রাজমহলের প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ বাসন্তী রঙের কাপড় পরে নৃত্য গীতাদি করতেন। এইদিন থেকে হোলিকা উৎসব শুরু হয়। যদিও সাধারণ জনতার মধ্যে দেবী পূজারও প্রচার ছিল। অধিকাংশ বাঙ্গালীরাই শাক্ত দেবীর পূজারী, সুতরাং অনেকের মতে বাঙ্গালীদের থেকেই অন্যান্য জাতিরা এইদিনে সরস্বতী পূজা শিখেছেন। যা হোক্ আজ প্রায় সারা ভারতে সব ভাষাভাষীরাই সমস্ত বিদ্যালয়ে মা সরস্বতীর পূজা করে থাকেন।

আমাদের আশ্রমেও প্রতিবছর শ্রীশ্রীমা যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে সমারোহে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর হল, ভারতের ভূতপূর্ব উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত গোপালস্বরূপ পাঠক শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে সরস্বতীপূজা করাচ্ছেন। আজ থেকে কিছু বছর আগে শ্রীযুক্ত পাঠক কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে "U. N. O."—এতে যান। সেখানে তিনি স্বপ্নে শ্রীশ্রীমাকে সরস্বতীরূপে দর্শন করেন ও মার কাছ থেকে দীক্ষা পান। সেই থেকে তিনি মার উপস্থিতিতে সরস্বতী পূজা করে আসছেন। কাশীতেও কন্যাপীঠের মেয়েরা প্রতিবছর নিজেদের হলঘরে সরস্বতী পূজা করে থাকেন। এবার মেয়েদের প্রার্থনায় ও যোগাযোগবশতং শ্রীশ্রীমার সরস্বতী পূজায় কাশীতে উপস্থিত থাকা স্থির হল। কন্যাপীঠের মেয়েদের ও কাশীবাসী মায়ের ভক্তদের

আনন্দে প্রাণমন নেচে উঠল। মায়ের আগমনের সংবাদ পেয়ে মা সরস্বতী মূর্ত্তিও অন্যবারের থেকে এবার বড় করার ফরমাশ্ দেওয়া হল। মূর্ত্তি খুব সুন্দর হয়েছিল।

২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমা ও মায়ের ভক্ত পরিকরগণ কাশী পৌঁছালেন। মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী পূজার কাজ শুরু হয়ে গেল। একদিকে মসলা ধোওয়া, চালডাল বাছা, খই ভাজা, নাড়ু ও মিষ্টি ইত্যাদি করা শুরু হল। সবকিছুই কন্যাপীঠের মেয়েরা করলেন। সবার উপরে শ্রীশ্রীমার পূর্ণ দৃষ্টি সবদিকেই রইল। দেখতে দেখতে কলকাতা থেকে মায়ের বহু ভক্তরা এসে পৌঁছালেন। দিল্লী থেকে গোপালস্বরূপ পাঠকজী নিজের রূপোর সরস্বতী দেবীর বিগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হলেন। মা বললেন "মেয়েদের পূজা মেয়েরাই করবে।" মেয়েদের মধ্যে কয়েকটি মেয়ের উপনয়ন হয়েছে। তাদের মধ্যেই একটি মেয়ে পূজা করবে, তাকে মা সব বুঝিয়ে দিলেন। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ স্বামীজী পূজা করাবেন। মেয়েরা প্রায় সারারাত জেগে পূজা-মণ্ডপ সাজাল। এবার একটু নতুন ধরণের সাজানো হল। ফুলের মণ্ডপের মধ্যে সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি রাখা হল। পাশে পাঠকজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হলেন। শ্রীশ্রীমা বিশ্রামে যাবার সময় সব কিছু দেখে গেলেন। মেয়েরা রাত্রিবেলা আল্পনাও দিয়ে রাখল।

আজ ৫ই ফেব্রুয়ারী। শ্রীশ্রীমহাসরস্বতী পূজার দিন। সানাই-এ আগমনীর সুর বেজে উঠল। প্রভাতী কীর্ত্তনের সঙ্গে উৎসব আরম্ভ হল। এদিকে সূর্য্যোদয়ের পর ভোগের ঘরে ভোগ রান্না শুরু হয়ে গেল। আজকে এক সাথে কয়েকটি শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার কথা। চণ্ডীমণ্ডপের উপরে দোতলার স্মৃতি-মন্দিরে ভক্তরা দীক্ষার আয়োজন করছেন। গোপালমন্দিরে কলকাতার আশ্রমের জন্য রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই-এর শ্রীবিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। আশ্রমের তিনতলার একটি ঘরে কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্তের

ছেলেদের উপনয়ন হবে। সর্বোপরি সরস্বতী পূজাতো আছেই। সব জায়গা-তেই মায়ের উপস্থিত থাকা চাই। একদিনে এতগুলো কাজ করানো মহাশক্তি-ময়ী শ্রীশ্রীমায়ের শক্তিতেই সম্ভব।

সবার আগে শ্রীশ্রীমা উপরে দীক্ষার্থীদের কাছে গেলেন। ভালভাবে দীক্ষাদান সম্পন্ন হল। প্রায় সাড়ে আটটায় নীচে চণ্ডীমণ্ডপে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি সহ সরস্বতী পূজা আরম্ভ হল। যে মেয়েটি পূজা করবে সে পূজার আসনে বসল। নারায়ণ স্বামীজী তন্ত্রধারের আসনে বসলেন। মার মণ্ডপে আসার সময় কলকাতার একটি বিশিষ্ট ভক্তমহিলা, যিনি পূজা করাচ্ছেন, মাকে খুব সুন্দর করে সাজালেন। হালকা বাসন্তী রং এর বেনারসী সাড়ীখানি শ্রীশ্রীমার শ্রীঅঙ্গে এমন সুন্দর মানিয়েছিল যেন প্রেমবিলাসিনী ভক্তির সাথে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন। মার মাথায় ফুলের মুকুট, হাতে ফুলের বীণা। পূজামণ্ডপে সকলে সচলা সরস্বতী ও অচলা সরস্বতীকে যুগপৎ দর্শন করলেন। মায়ের অপরূপ রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হলেন। মার ভক্তদের তনমন আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। যাঁরা মায়ের সেদিনের সেই মনমোহিনী রূপ দেখেছেন তাঁরা সত্যিই ধন্য। সরস্বতী মূর্ত্তির পাশে ভক্তদের ইচ্ছায় মা দাঁড়ালেন। ফটোগ্রাফার ফটো তুলল। ভক্তবৎসলা জননী ভক্তদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করছেন। তারপর মা নিজের হাতের পুষ্পবীণাটী দেবীর হাতে দিয়ে দিলেন।

এবার মাকে অঞ্জুলি ও মালা দিয়ে প্রণাম করে পূজারিণী পূজা শুরু করল। পাশাপাশি দুটি ঘট বসেছে। একটি আশ্রমের ও অপরটি পাঠকজীর পাঠকজীও পাশে পূজা করতে বসলেন। নারায়ণ স্বামীজী দুজনকেই এক সাথে তন্ত্রমতে পূজা করালেন। অধিবাস ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে দুর্গাপূজার মত সব কিছুই বিধিমত বিস্তারিতভাবে পূজা হল। মধ্যে মা কিছুক্ষণের জন্য গোপাল মন্দিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে গেলেন। আবার ভোগ ও আরতির সময় পূজা মণ্ডপে এলেন। দিদি (গুরুপ্রিয়া) অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্রায়

সারাক্ষণ পূজার সময় নীচে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় বেলা ১টার সময় সুন্দর ভাবে পূজা শেষ হল। আজকের যুগে কোন মেয়ে এর আগে এইভাবে মূর্ত্তি পূজা করেছে এই ঘটনা বিরল। পরে শোনা গেল যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মূর্ত্তি পূজা মেয়েদের এই প্রথম। আগে আর শোনা যায়নি। সবই মায়ের খেয়াল।

পূজা শেষ হলে মা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ওখানে গেলেন। তারপর তিন-তলায়, যেখানে ব্রহ্মচারীরা উপনয়ণ গ্রহণ করছেন সেখানেও মা গেলেন। এইভাবে কখনও পূজা মণ্ডপে, কখনও গোপাল মন্দিরে মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাছে ধীর স্থিরভাবে উপবিষ্টা, কখনও তিনতলায় ব্রহ্মচারীদের থাকা খাওয়ার বিষয়ে নির্দ্দেশরতা মাকে অনুসরণ করতে গিয়ে ভক্তরাতো হিমশিম। ভক্তরাও কোন কিছুর থেকে বঞ্চিত হতে চাননা তাই মা যেখানে যাচ্ছেন, ভক্তরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে পরমানন্দ আস্বাদন করতে লাগলেন।

মা ভোগের পরে একটু বিশ্রাম করতে গেলেন। এরপর প্রসাদ নেওয়ার পালা। যাঁরা পূজা দেখতে এসেছিলেন পরিচিত হোক্, অপরিচিত হোক্ সবাই প্রসাদ পেলেন। আজ কন্যাপীঠের ছোট ছোট মেয়েরাতো মহাখুসী। কারণ তাদের আজ আর কেউ পড়তে বলছেনা। আজ পড়তে নেই। আজ সমস্ত পাঠ্যবইরও মা সরস্বতীর সাথে পূজা করা হয়েছে। বিকেলে আবার সৎসঙ্গ শুরু হল। সন্ধ্যাবেলার আরতিতে মা আর নীচে এলেন না। কীর্ত্তন হল। কীর্ত্তনের পরে মা সকলকে ডেকে প্রসাদী কমলালেবু দিলেন। রাত্রিবেলা কন্যাপীঠের মেয়েরা মাকে হলঘরে নিয়ে গেলেন। প্রতিবার হলে সরস্বতী পূজা হয় তাই মেয়েরা মাকে নিয়ে হলে বসাল। মাকে শোলার মুকুট, কোমরে, হাতে পায়ে শোলার গয়না পরানো হল। একটি মেয়ে প্রথমে মার পূজা করল পরে সবাই অঞ্জুলি ও মালা দিলেন। মেয়েরা খুবসুন্দর কীর্ত্তন করল। কন্যাপীঠের একটি ছোটমেয়ে মাকে একটু নাচ দেখাল। এর পরে মাকে প্রণাম করে সকলে শুতে গেলেন। মাও বিশ্রাম করতে গেলেন।

পরের দিন সকালে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন হল। পাঠকজী দিল্লী ফিরে গেলেন। কোনও ভক্ত অনেক বাতাসা ভোগ দিয়েছিলেন। মা দুপুরে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে চাতালে বসে হরিনামের মধ্যে বাতাসার হরিরলুট দিলেন। অপূর্ব কীর্ত্তন হল। মাও কিছুক্ষণ করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন করলেন। মাকে খুব সুন্দর লাগছিল। যিনি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তস্বরূপ তাঁর যে সবই সুন্দর। এইভাবে মহাসমারোহে মহাসরস্বতী পূজা সমাপ্ত হল। এই সুন্দর দিনটিও কারুর অপেক্ষায় চিরস্থায়ী হয়ে রইল না। তবুও এইদিনের শেষেই কি সব ফুরিয়ে গেল? কখনই না। আমার মনে হয় যাঁরা এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিপটে সেদিনের সেই আনন্দের স্মৃতিকণা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজকের এই উৎসবে শ্রীশ্রীমা আমাদের হৃদয়বীণায় যে নতুন সুরের ঝংকার তুললেন তা ঝংকৃত হবে চিরতরে প্রত্যেকের জীবনবীণার তারে তারে।

(২) কন্যাপীঠের বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণোৎসব

"শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ" হ'ল শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত ভক্ত ও সেবক শ্রদ্ধেয় ৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায় মহাশয়ের (ভাইজীর) একটি মহতী পরিকল্পনার সাকার রূপ। উদ্দেশ্য, মাতৃসান্নিধ্যে ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধারা-সিক্ত-সৎপরিবেশ বালিকাদের আদর্শ চরিত্রগঠন। ভাইজীর এই সুন্দর আশামুকুল মুকুলিত হওয়ার সুযোগ পায়, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠা ভক্তসেবিকা স্বর্ণামধন্যা শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়াদেবীর সফল প্রচেষ্টায়। দেখতে দেখতে ছেলেদের জন্যও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ" নামে যা আজ সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশিত ও বিকশিত।

কাশীতে অমলাধবলা পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে মায়ের এই সুরম্য আশ্রমটি স্বভাবতঃই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন্ সে সুদূর অতীতের পানে, যেখানে জনমানবহীন শান্ত নির্জন ভারতের বনে বনে গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরা শাস্ত্র অধ্যয়নে রয়েছে নিরত। মায়ের আশ্রমের একদিকে কন্যাপীঠ ও অপরদিকে সাধুদের আবাসভবন। মাঝখানে শ্বেতযজ্ঞশালাটি যেন

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতীকরূপ। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথায় চালিত, তাই এখানে মেয়েদের প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যেরই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি কাশীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও ১৯৬১ থেকে রাজ্যসরকারের দ্বারা মান্যতাপ্রাপ্ত, তাই ওখানকার পাঠ্যক্রম অনুসারে এখানে মেয়েদের প্রথমা, পূর্বমধ্যমা, উত্তর মধ্যমা, শাস্ত্রী ও আচার্য্য ক্রমানুসারে পড়ানো হয়। কিন্তু এখানে মেয়েদের পুঁথীগত বিদ্যার সাথে সাথে অন্যান্য আবশ্যকীয় গুণবৃদ্ধির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়—যথা সংগীত, রন্ধন ও শিল্প কলা ইত্যাদি। সর্বোপরি সামাজিক ও ব্যবহারিক আচার বিচারেও শিক্ষার সাথে সাথে অতি শৈশব থেকেই ব্রহ্মচর্য্য জীবনযাপনও ধার্মিক ভাব জাগরণের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়। এই আদর্শে আদর্শান্বিত হয়ে যদি একটি মেয়েও দেশের ও দশের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা সার্থক। এখন পর্য্যন্ত প্রায় ৭টি মেয়ে বেশ কৃতিত্বের সাথে এখান থেকে আচার্য্য পাশ করে বের হয়েছে। এখানকার আদর্শে আদর্শান্বিত হয়ে অনেকে সফলগৃহস্থাশ্রমে নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। যে প্রতিষ্ঠানের উপরে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধারা সতত হচ্ছে বর্ষিত তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সুনিশ্চিত।

প্রতিবারের মত এবারও কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হল ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে। শ্রীশ্রীমা তার দুদিন আগেই এসে পৌছালেন। ধীরে ধীরে কন্যাপীঠের ছোট ছোট মেয়েদের চিরপ্রত্যাশিত পুরস্কার বিতরণের দিনটি নিজের যাকিছু উপহার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। আজ মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। কারণ আজ তারা সারা বছরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বহু জনসমাগমে সগর্বে প্রাদেশিক সরকারের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত রেড্‌ডীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে পারবে। এই উপলক্ষ্যে, রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত রেড্‌ডী ও শ্রীমতী রেড্‌ডীর আসার কথা।

আজ বিকেল থেকেই প্রাদেশিক সরকারের পুলিশ বাহিনীর শুরু হল আশ্রমের গলিতে আনাগোনা। সন্ধ্যে ৬৷৷০টা থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে।

এখনও রাজ্যপালের আসতে একটু দেরী। মা ভক্তদের মাঝে আশ্রমের আঙিনায় আছেন। ইত্যবসরে সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি শ্রীকমলাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকরুণাপতি ত্রিপাঠী এসে পৌঁছালেন। ভদ্রলোক খুব শান্ত, সংযত ও অমায়িক। ঠিক যেন যোগ্যপদের যোগ্য মানুষটি। একটু পরে শ্রীযুক্ত রেড্‌ডী ও তাঁর দলবলসহ এসে পৌঁছালেন।

প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে গোপালমন্দিরের হল-ঘরে। তাই আজ এই হলটি হয়েছে অভিনব সাজে সজ্জিত। শ্রীশ্রীমায়ের উপবেশনের পর শ্রীযুক্ত রেড্‌ডী ও শ্রীমতী রেড্‌ডী সভাপতিপদে ভূষিত হলেন। তাঁদের পাশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কুলপতি ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও বর্ত্তমান কুলপতি শ্রীকরুণাপতি ত্রিপাঠী বিরাজ করলেন। একদিকে কন্যাপীঠের মেয়েরা তাদের যোগ্যবেশে সুসজ্জিত হয়ে বসলেন। আরেকদিকে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ও সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রিত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারাও এই উৎসবের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উপবিষ্ট হলেন। কাশীর সুধী-সমাজ থেকে পণ্ডিতেরা এসে বিশিষ্ট অভ্যাগতের পদ অলঙ্কৃত করলেন।

প্রধানাচার্য্যের ভাষণের সঙ্গে কার্য্যক্রম শুরু হল। এরপর মেয়েরা সকলে মিলে বেদধ্বনি করল। তারপর কয়েকটি মেয়ে সুরভারতীর সুললিত পদেই স্বাগত গীত গান করল। নিম্নপ্রবেশিকা ও উচ্চপ্রবেশিকার ছোট মেয়েরা খুব সুন্দর ভাবে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও হিন্দী কবিতা পাঠ করল। প্রথমার মেয়েদের গীতার শ্লোকের উপর অন্তাক্ষরীও খুব মনোরঞ্জক হল। পূর্বমধ্যমার একটি মেয়ের কবিগুরুর "পরশমণি" কবিতাটির আবৃত্তি খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছিল। আচার্য্যের একটি মেয়ে এরপর ইংরেজিতে কবিগুরুর গীতাঞ্জলীর একটি কবিতার কিছুটা অংশ আবৃত্তি করল। সবাই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন। সর্বশেষে শাস্ত্রী ও আচার্য্যের মেয়েদের সংস্কৃতে বাদবিবাদ রাখা হয়েছিল। বিষয় ছিল "জগৎ কর্ত্তৃস্বরূপেণ ঈশ্বরো অভ্যুপগন্তব্যো ন বা"। এই ভাবে প্রায় একঘণ্টা মেয়েদের প্রোগ্রাম হল। প্রত্যেকটি মেয়েই খুব ভাল বলল। বিশেষ করে এখানকার মেয়েদের সংস্কৃত উচ্চারণের সবাই খুব প্রশংসা করলেন।

মেয়েদের কার্য্যক্রম শেষ হলে, কন্যাপীঠের সেক্রেটারী ও কাশীর সুপ্রতিষ্ঠিতা বিদুষী ডাঃ পদ্মা মিশ্র গত বছরের কন্যাপীঠের বিবরণ পড়ে শোনালেন। শ্রীমতী রেড্‌ডী সবাইকে পুরস্কার দিলেন। দুটি মেয়ে ভাল বলার জন্য পুরস্কার পেল। এরপর কুলপতিজীর ভাষণ। ত্রিপাঠীজী বললেন "আমি এখানে ভাষণ দিতে আসিনি কিন্তু শ্রীশ্রীমার চরণে আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি। অতএব কন্যাপীঠের মেয়েদের আশীষ প্রদানসহ আমার ভাষণ শেষ করছি।" সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ কথা।

শ্রীযুক্ত রেড্‌ডী সভাপতির ভাষণে বললেন "শ্রীশ্রীমার কৃপায় আজ আমি আপনাদের মাঝখানে আসতে পেরেছি। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ আজকের এই বর্ত্তমান যুগে ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পোষণ করে আসছে। আমি যদিও নিজে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নই তবুও এখানকার ছোট ছোট মেয়েদের পণ্ডিতের মত সংস্কৃত উচ্চারণ ও সাহস ও উৎসাহপূর্ব্বক বলার রীতিও ঢং দেখে আমি সত্যি অবাক্ হয়েছি। আজ আমি এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি ও হাজার হাজার ছাত্র-ছা ীদের উপাধি বিতরণ সমারোহে উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু আজ আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে এখানে যে প্রেরণা ও স্ফূর্ত্তি পেলাম তা আর জীবনে কখনো কোথায়ও পায়নি। শ্রীশ্রীমার কৃপায় অদূর ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কন্যাপীঠ সারা ভারতের আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশেষে আমি কন্যাপীঠের সকল মেয়েকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ্।"

শ্রীযুক্ত রেড্‌ডীর ভাষণের পর কন্যাপীঠের সংস্কৃতের অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষায় সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর সমবেত ভাবে পতিতপাবণ ভূতভাবন ভগবান ভূতনাথের একটি স্তবগান হল। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম অন্তে কার্য্যক্রমের সমাপন হল।

শ্রীশ্রীমার কৃপায় অবশ্যই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠরূপী এই বিরাট মহীরূহ একদিন বহুশাখাপ্রশাখায় সুপল্লবিত ও সুপুষ্পিত হয়ে বর্ত্তমান যুগের মানবসমাজকে স্নেহসুশীতল ছায়া প্রদানে সমর্থ হবে।

—জয় মা—

'লহ গো প্রণাম'

শ্রীমধুসূদন নন্দী

নমি মা আনন্দময়ী ! বিশ্বস্বরূপিনী—
বিশ্বময়ী মা তুমি,—শান্তি সুধাদায়িনী ;
ব্রহ্মময়ী সনাতনী জগজ্জননী
যোগেশ্বরী মহামায়া ভব ভয় হারিণী।
তমঃ হরা তেজময়ী
ব্রহ্মবিদ্যা দায়িণী
বিরাজ আনন্দ মাঝে
ওগো মা, আনন্দময়ী !
লহ গো প্রণাম মোর।

সত্য-শিব-সনাতনী চিরকল্যাণময়ী--
বিশ্বরূপা চির স্নেহময়ী—
জাগালে জগজ্জনে—"একাত্ম"—বিঘোষনে
চিন্ময়ী মা ! মহাজ্যোতির্ম্ময়ী
জ্ঞানের পরশমণি,
তুমি মা ! অমৃতখনি
বিশ্বের কল্যাণময়ী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী !
লহ গো প্রণাম।

—০০—

"মাতৃবন্দনা"

কমল লাহিড়ী

জয় জয় জয় মা, জয় মা জয় মা
আনন্দময়ী তুমি মা,
শুদ্ধা সনাতনী ত্রিলোকপালিণী
বরাভয় দায়িনী মা।

অসুরনাশিনী রিপুবিনাশিনী
জগদ্ধাত্রী তুমি মা,
তুমি দুর্গা তুমি তারা—
শিবা ভবানী তুমি মা।

তুমি স্বাহা তুমি স্বধা
সৃষ্টি স্থিতি তুমি মা,
ভীমা ভয়ংকরী বিনাশের রূপ ধরি
প্রলয়রূপিণী তুমি মা।

বিশ্বচরাচর কাঁদিছে নিরন্তর
চরণ পূজিতে তব মা,
দাও মাগো পদছায়া দূর হোক মোহমায়া
আনন্দস্বরূপিনী মা।

—•০—

শ্রীজগদীশ্বর প্রসাদ পাণ্ডিয়ার মহাপ্রয়াণ

মাতৃভক্ত সমাজের অগ্রণী ভক্তপ্রবর শ্রীজগদীশ্বর প্রসাদ পাণ্ডিয়া আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। শ্রীপাণ্ডিয়াজী গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রাত ৯টার সময় মরদেহ ত্যাগ করে পরম কারুণিক ভগবান বিশ্বেশ্বরের নিত্যলীলাধামে সানন্দে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর মাতৃনির্দ্দেশে গত দুবছর ধরে শ্রীআনন্দময়ী চেরীটেব্‌ল সোসাইটীর এডিসানাল জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত তিনি যথাসাধ্য যোগ্যতার সহিত এই সেবাই করে গিয়েছেন।

মৃত্যুর প্রায় ৬।৭ দিন আগে রাত্রেবেলায় হঠাৎ একদিন তাঁর অসহ্য বুকে ব্যথা ওঠে। ডাক্তার পরীক্ষা করে হৃদ্‌রোগ বুঝতে পারলেন। এর আগের দিন তিনি নিজে ড্রাইভ্‌ করে শ্রীশ্রীমাকে ষ্টেশনে নিয়ে যান। তাই এই সুস্থ্য সবল মানুষটির হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ দিনের মধ্যেই এই মহাপ্রয়াণ যেমন আকস্মিক্‌ তেমনই অভাবনীয়। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে পাণ্ডিয়াজীর এই অমর পথের যাত্রা সত্যিই সার্থক। তাঁর এই সুন্দর মৃত্যু দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি কত মহৎ ছিলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রী, দুই পুত্র, কন্যা ও ছোট দুই ভাই সবাই কাছে ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ শুনেই শ্রীশ্রীমা আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীদের কীর্ত্তন করতে বললেন। মাতৃনির্দ্দেশে কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী ও পরিবারের প্রত্যেকেই শান্তভাবে সারারাত জেগে মৃতদেহ স্পর্শ করে জপ ও গীতা পাঠ করলেন।

পরের দিন সকালে মৃতদেহ গোপালমন্দিরের সামনে রক্ষিত হল।

আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা কীর্ত্তন করছিলেন। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহসংস্কার সম্পন্ন হল।

শ্রীপাণ্ডিয়াজী মাতৃনির্দ্দেশে মাতৃসেবায় রত হয়ে, মাতৃসান্নিধ্যে পরম-শান্তিময় মাতৃক্রোড়ে চিরসুপ্ত হলেন। এমন সুন্দর মৃত্যু সকলেরই কাম্য। ধন্য পাণ্ডিয়াজী ধন্য তাঁর পরিবার। পরিবারের সকলের অসীম ধৈর্য্য ও শ্রীশ্রীমার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা বুদ্ধি দেখে সবাই স্তম্ভিত হলেন। যাঁরাই সান্ত্বনা দিতে গিয়াছেন তাঁরাই বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর শান্ত-সমাহিত ভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন।

আমরা শ্রীশ্রীমার চরণে এই প্রার্থনা জানাই যে শ্রীশ্রীমা পাণ্ডিরাজীর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শোক সহ্য করার জন্য অসীম ধৈর্য্য প্রদান করুন।

—oo—

শ্রীশ্রীমায়ের নববর্ষের বাণী

"ভগবৎ-প্রাপ্তি লক্ষ্যের যাত্রার নিত্যনূতন স্থিতি আসবার জন্য চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ হওয়া।"

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni "	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XX		...	61.50
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.75
Amar Vāni	...	...	6.00

BENGALI

Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVII		...	48.50
Akhanda Mahayājna " "	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	...	2.50
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha		...	2.50
Vivek Churamani— " " "		...	3.50

GUJRATI

Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		...	4.00
—Vol. II		...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	...	...	6.00
Matri Vani (Sayings)			3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Special	7.50
Mother as Seen by Her Devotees		—Do—	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	3.00
Ma Anandamayi Lila—Hari Ram Joshi		...	15.00
A Mystic Sage—Ma Anandamayi Shyamananda Banerjee		...	15.00

PHOTOS

Photos—various sizes	0.50 to 15.00

श्रीश्री आनन्द मयी चैरिटेबल सोसाइटी
ॐ मा
मातृ शरण

আনন্দবার্তা

বর্ষ ২৩ জুলাই, ১৯৭৬ সংখ্যা ৩

আনন্দবার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, *এম০এ, পি০আর০এস০, ডি০লিট্*

ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, *এম০ এ০. পি০ এইচ০ ডি০*

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ, *এম০ এ০, শাস্ত্রী*

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং (ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তায় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।
* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক কমিশন বাবদ অতিরিক্ত দুই টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউণ্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগবতানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপপ্রিণ্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	ব্রহ্মলীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ	...	ক
২।	মাতৃ-বাণী	— ...	১২৩
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	১২৫
৪।	মাতৃ-সৎসঙ্গ (১৫)	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	১৩৪
৫।	কৃপাময়ী মা	—শ্রীঅমিয় কুমার গুপ্ত	১৪৩
৬।	মাতৃকৃপার ঝরণাধারা	—শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য্য	১৪৮
৭।	মাতৃ-প্রসাদ	—মৌনী মা	১৫২
৮।	বি জি জ্ঞা সা (৫)	—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	১৫৫
৯।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	১৫৯
১০।	শ্রীশ্রীমায়ের ৮১তম জন্মোৎসব	—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১৬৩

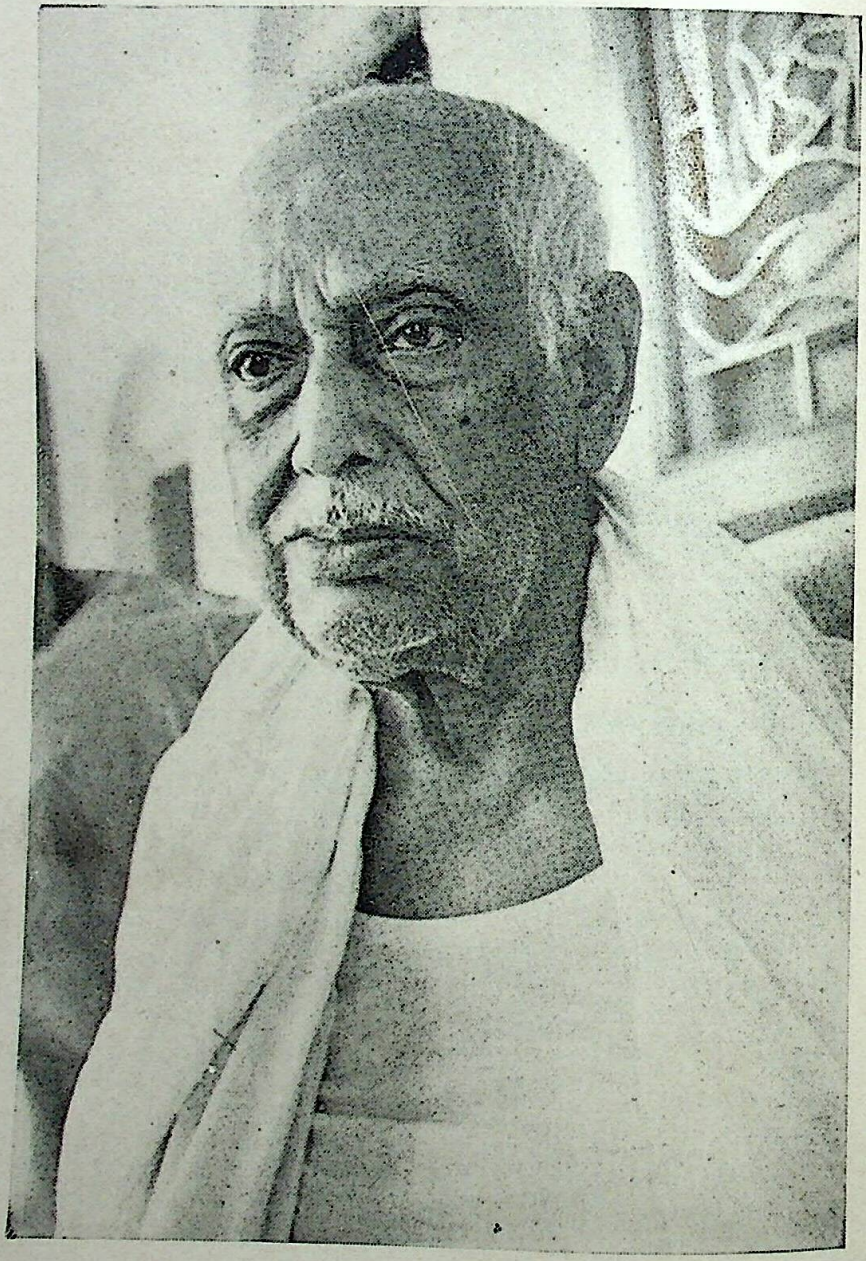

Mahamahopadhyay Pandit Gopinath Kaviraj

ব্রহ্মলীন মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ

"ব্রহ্মলীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ"

বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান, সাধক এবং তন্ত্র সাহিত্যের মর্মজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজজীর পার্থিব শরীর গত ১২ই জুন মাতা আনন্দময়ী হাঁসপাতালে বিকাল ৫টা ২০ মিনিট-এ পঞ্চতত্বে বিলীন হয়। প্রায় অর্ধরাত্রিতে মণিকর্ণিকাঘাটস্থিত চরণপাদুকার উপরে কবিরাজজীর পৌত্র শ্রীশশিশেখর দাহসংস্কার করলেন। কবিরাজজী তিন দিন উক্ত হাঁসপাতালে ভর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু দুদিন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাঁর শরীরে রক্ত দেওয়া হয় ও কয়দিন ধরেই অক্সীজেনও দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁর অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল।

দেহাবসানের সময় কবিরাজজীর কাছে তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুধারাণী দেবী, পৌত্র শ্রী শশিশেখর, পুত্রপ্রতিম শ্রী সীতারাম ভাই, প্রিয় শিষ্য কলকাতার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র পাল, গোপাল মজুমদার, শ্রীধর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীচন্দোলাজী ও অন্যান্য বহু লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। দেহত্যাগের পর মৃত শরীর সকলের দর্শনার্থে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের প্রাঙ্গণে রাখা হয়। সেখানে উপস্থিত লোকেরা মাল্যার্পণ করলেন। এদিকে কন্যাপীঠের মেয়েরা মধুর হরেকৃষ্ণ নাম ও "জয়গুরু জয় মা" কীর্ত্তন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডাঃ করুণাপতি ত্রিপাঠী কাশীর নামী পণ্ডিতদের সাথে এসে মাল্যার্পণ করলেন।

রাত্রিবেলা প্রায় পৌনে দশটায় কবিরাজজীর মৃতদেহ একটি খোলা ট্রাকে রেখে আশ্রম থেকে সোজা সিগরায় তাঁর নিজের

বাস ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সবাই শেষবারের মত দর্শন করলেন। প্রায় পৌনে এগারোটায় মৃতদেহ ট্রাকে করে চকে আনা হয় ও সেখান থেকে সবাই কাঁধে করে মণিকর্ণিকাঘাটস্থ চরণপাদুকায় নিয়ে এলেন ও সেখানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হল। দাহসংস্কারের আগে চিতার কাছে প্রমুখ নাগরিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু, "আজ" পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীশঙ্কর ব্যাস, ডাঃ ভানুশঙ্কর মেহতা, কাশীপত্রকার সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীদীননাথ গুপ্ত সংঘের পক্ষ থেকে মাল্যার্পণ করলেন।

কবিরাজজী গত আট বছর শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা এখন হরিদ্বারে আছেন। কবিরাজজীর অবস্থা খারাপ শুনে মা মৃত্যুর একদিন আগেই পানুদাকে পাঠালেন ও মৃত্যুর দিন স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী নির্ম্মলা নন্দকে একটি চন্দনের মালা সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন ও বলে দিলেন "যদি বাবার শরীর থাকে তো বাবাকে মালা পরিয়ে দিও, না হলে গঙ্গার জলে দিয়ে দিও।"

কবিরাজজীকে ভারত সরকার তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ও ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে "পদ্মবিভূষণের" দ্বারা অলংকৃত করলেন।

জীবন পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে। সেখানে তাঁর মাতামহ থাকতেন। এঁর পরম্পরাগত পৈতৃক স্থান মৈমনসিং জেলার দাঘা গ্রামে ছিল। তাঁর পিতার নাম গোকুলনাথ কবিরাজ। অতি শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মৈমনসিং জিলার অন্তর্গত কাঁটালিয়া গ্রামে মামা কালাচাঁদ সান্যাল তাঁর লালনপালন করেন। পৈতৃক

ভিটায় কেউ না থাকায় বাড়ী, জমি, পুকুর, বাগান ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও চিরকালের জন্য সেখান থেকে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

গোপীনাথজীর প্রারম্ভিক শিক্ষা ধামরাই হাইস্কুলে হয়। পরে ইনি ঢাকার জুবিলী স্কুলে ভর্ত্তি হন ও এনট্রান্স পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীর্ণ হন। ১৯০৭-এ তিনি এফ০এ০ পড়ার জন্য কলকাতায় গেলেন। কিন্তু সেখান থেকে জয়পুর চলে গেলেন। জয়পুর ষ্টেটের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী সংসার চন্দ্র সেনের কাছে প্রাইভেট্ টিউটার হিসাবে তাঁর পৌত্র ও ছোট পুত্রকে পড়াতে লাগলেন।

জয়পুরে মহারাজা কলেজে তিনি এফ০এ০ ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন। ঢাকায় অধ্যয়ন করার সময় কবিরাজজী বহু সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থের বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। জয়পুরেও বিশেষ মনোযোগিতার সহিত তারই অনুবৃত্তি যথাপূর্ব অক্ষুন্ন থাকল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিকে তিনি এই সময়েই আকৃষ্ট হন। জয়পুরের বিশাল সার্বজনিক পুস্তকালয়, কলেজলাইব্রেরী ও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশাল লাইব্রেরী, সব জায়গাতেই কবিরাজজীর অপ্রতিহত প্রবেশ ছিল।

মহারাজা কলেজে প্রবেশের সময় কবিরাজজীকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতা ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয়। ব্যাখ্যাটি এত সুন্দর হয়েছিল যে সেটি শুনে প্রোফেসার খুব প্রশংসা করলেন ও বললেন এর থেকে ভাল ব্যাখ্যা আমি নিজেও করতে পারতাম না। সেই থেকেই তিনি কবিরাজজীর ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন যা ছাত্রজীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জয়পুর থেকে বি০এ০ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। পরে কাশীতে কুইন্স কলেজে এম০এ০ পড়ার জন্য প্রবিষ্ট হলেন। পঞ্চম বর্ষ

উত্তীর্ণ হওয়ার পর কবিরাজজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও কুইন্স কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ভেনিস্ সাহেবের পরামর্শে অধ্যয়ন ছেড়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য গেলেন। সেখান থেকে সুস্থ্য হয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরী গেলেন। কবিরাজজী সুস্থ হয়ে কাশী ফিরে এলেন ও এম০এর অন্তিম বর্ষে প্রবিষ্ট হলেন। এই সময়েই তিনি আচার্য্য নরেন্দ্রদেবের সংস্পর্শে আসেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবিরাজজী এম০এ০ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। আজমির ও লাহোর কলেজে অধ্যাপনার জন্য তাঁর কাছে অনেক চিঠি পত্র এল। কিন্তু ডাঃ ভেনিসের ইচ্ছা, ইনি যে ছাত্রবৃত্তি পেতেন তাতে একটু বৃদ্ধি ক'রে দিয়ে কাশীতে থেকেই তিনি রিসার্চ কার্য্য করুন। সেই সময় "সরস্বতী ভবন" পুস্তকালয়-রূপে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ডাঃ ভেনিস সাহেবের ইচ্ছা এই যে এই পুস্তকালয়টির উদ্ঘাটনের পর কবিরাজজীকেই প্রথম লাইব্রেরি-য়ন নির্ব্বাচিত করা হোক্। কবিরাজজী প্রায় এক বছর পরিবর্ধিত ছাত্রবৃত্তি নিয়ে নিজের বিষয়বস্তু গবেষণা করতে লাগলেন। সর-স্বতী ভবন উদ্ঘাটন হওয়ার অল্পদিন পরেই এপ্রিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সেখানে কবিরাজজীকে অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হল। এই পুস্তকালয়ে সংস্কৃত ও জার্মানের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রাপ্য ছিল। তাঁর গবেষণা চলতে লাগল ও বাইরে থেকে আসা শোধ-ছাত্রদেরও নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন।

কবিরাজজী প্রথম থেকেই U. P. Historical Societyর জর্নলে লিখে আসছিলেন। কবিরাজজী প্রস্তাব করলেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ আছে তাদের গবেষণা প্রকাশনের জন্য একটি জর্নল বের করা হোক্। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে বিভিন্ন বিষয়ের হস্তলিখিত পুস্তক প্রকাশিত করার

যোগ্য অংশের সম্পাদনা করা হোক্। ফলস্বরূপ 'সরস্বতী ভবন ষ্টাডী' ও "সরস্বতী ট্রাষ্ট"—এর স্থাপনা হল। কবিরাজজী দুটোরই সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কুইন্স কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন।

কবিরাজজী অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুইন্স কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁর বিদ্বত্তায় মুগ্ধ হয়ে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। ডাঃ ভেনিসের মতই ইনিও গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার, সুপারেনণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ সংস্কৃত ষ্টাডীজ আদি পদের ভার একাই বহন করে আসছিলেন।

যোগীসম্রাট পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীজী কবিরাজজীর গুরু ছিলেন। বিশুদ্ধানন্দজী অসাধারণ যোগী ও বিজ্ঞানবেত্তা ছিলেন। তিনি কিছু বছর তিব্বতে এক আশ্রমে থেকে যোগ তথা বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রাপ্ত করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোভাবের পর কবিরাজজী নিজের গুরুদেবের নামে "বিশুদ্ধানন্দ" নামক গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত করেছিলেন। "বিশুদ্ধানন্দ বাণী" নামে সাত খণ্ডে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিষয়ে কবিরাজজী "সূর্য্যবিজ্ঞান" নামক একটি প্রবন্ধ কল্যাণের যোগাঙ্করূপে প্রকাশিত করেছিলেন, যা থেকে বিশুদ্ধানন্দজীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

অবকাশ গ্রহণ করার পর কবিরাজজী কাশীতে একান্তভাবে থেকে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক্ জ্ঞানের চর্চা করে সময় যাপন করছিলেন। কবিরাজজী দ্বারা রচিত কিছু বিশেষ গ্রন্থের নাম এইরূপ—'অখণ্ড মহাযোগ', 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা', "তান্ত্রিক বাঙময়ে শক্তিদৃষ্টি", "বিবরণাত্মক গ্রন্থ সূচী", "কাশীর সারস্বত সাধনা", "ইষ্ট ও ওয়েষ্টার্ণ শক্তি ফিলোসফি"।

এর অতিরিক্ত হিন্দী, ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর বহু শত মহত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।

কবিরাজজী গত কিছু বছর হল অসুস্থ ছিলেন ও ইদানিং গত প্রায় আট বছর শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমেই ছিলেন। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডাঃ করুণাপতি ত্রিপাঠী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের ব্রহ্মলীন হওয়ায় বলেছেন যে "সংস্কৃত বাঙ্‌ময়, সমস্ত ভারতীয় পাশ্চাত্য দর্শন, যোগশাস্ত্র, তন্ত্র, ভারতীয় সাধনা, পুরাণ এবং বেদের অপ্রতিম মর্মজ্ঞ বিদ্বান নিজের মহত্বপূর্ণ স্থান রিক্ত করে গেলেন।" কবিরাজজী একাধারে সাধক, সংস্কৃতের বিদ্বান, সন্ত, ত্যাগী ও মহামানব ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে বৌদ্ধিক সাধক-জগতের ক্ষতি অপূরণীয়।

আনন্দবার্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

ত্রয়োবিংশ বর্ষ] জুলাই, ১৯৭৬ [সংখ্যা ৩

ঃ মাতৃ-বাণী ঃ

[সংকলন ঃ ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে এই পথে যাত্রী হওয়া কঠিন, ইহা ঠিকই। তবে যাত্রী হইবার পর দোদুল্যমান মন—যাহা অকল্যাণের পথ—রাখা ঠিক নয়। মন মজবুত করিয়া তপস্যার জীবনে চলা। পরমপতি এই পথে ভগবান স্বয়ং।

* * *

"মা" হইতেই তোমার সৃষ্টি। 'মা' বলিলে তোমার মধ্যে 'পিতা' আছেই। ভগবানকে বল তো ঃ তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, সখা স্বামী—অর্থাৎ স্ব-আমিই। সবেতে সব তিনিই—ঐ "মা" মনে রেখো।

* * *

তিনি যখন তাঁর ছোঁওয়া দিবেন দিন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যাহা—তাঁহাকে ডাকিয়াই যাইব। বৃথা বাজে কথা বলিয়া—যা বাজে অর্থাৎ তাঁহার দিকে যাইতে বাজে, বাধা হয়—সেই দিকে তো যুগ-যুগান্তর কাটানো হইল। এখন ফিরে চলো বন্ধু আপন ঘরে। রাস্তায় থাকিয়া থাকিয়া রাস্তার কষ্ট আর কত সহ্য করা?

সাঁতার শিখিতে গেলে বা পিছল পথে বা মরুভূমিতে চলিতে গেলে কিরূপ হওয়া? একলক্ষ্যে চলিলে লক্ষ্যপতির দিকে যে একলক্ষ্য সেখানে তাঁহার বিধান—তিনি মঙ্গলময় মনে রাখা, শান্তিস্বরূপ দিকই নেওয়া। সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষার স্বরূপ প্রকাশ হওয়াই চাই সব ক্রিয়ার ভিতরেই।

* * *

যে যেখানেই উপস্থিত থাকুক্ না কেন, এ শরীরটা সবসময়ই তাহাদের কাছে। এ শরীরের সকলের সেবা তো আসেনা—যখন যাহা হইয়া যায়। যে যতটুকু করাইয়া লয়, নিজ-জন ভাবিয়া যাহারা যত-দিন এ শরীরটাকে আদরে সৎ ও সাধুসঙ্গ দেয়। এখানে দরজা খোলা, নিঃসংকোচে যখনই ইচ্ছা তখনই আসিবে।

* * *

সত্যই সত্যকে রক্ষা করে। শত কাজে শত বাধা। বাধার দিকে না তাকাইয়া যদি আমরা সত্যপালনের দিক্ নিয়া চেষ্টা করি, তাহলে কে কি বলিল তাহাতে সত্যব্রতীদের গ্রাহ্য থাকা নয়। যিনি সত্যকথা বলিবেন, সৎকাজ করিবেন ও সৎপরিবেশের মধ্যে থাকিবেন, ভগবানই তাহার স্বয়ং রক্ষক।

* * *

মানুষই সবদিকে জয়লাভ করিতে পারে। মনের হুস হওয়া প্রয়োজন। জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞানের দিকে পড়িয়া থাকা, সেই দিক্ই ভাল লাগা—এই দিক্টা বদলাইতে হইবে। সত্যকথা বুক ফুলাইয়া মুখ খুলিয়া বলা—ইহাতে সত্যের তেজ বৃদ্ধি হয়। সত্যই সৎপথের প্রদীপ দিক্প্রদর্শক। নিজের ব্যক্তিত্ব রাখিয়া মিষ্ট ব্যবহারে সকলের সঙ্গে জয়-যুক্ত হইয়া চলা। কাহারো হাতের মুঠির মধ্যে কবলে পড়িয়া যাওয়া নয়। নিজের সুন্দর ভাবগুলি যেরূপ আছে—নিত্য শুদ্ধ সৎচিন্তায় পুষ্ট রাখা। বিক্ষেপ যেন স্পর্শ করিতে না পারে। উচ্চ উদার মহান্ দৃষ্টি রাখা।

* — *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

সত্য উপলব্ধি করিতে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার প্রয়োজন হয় না

আমি—মা, কেহ যদি কোন একপথে সাধনা করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে, তবে অন্যপথে সাধনা করিয়া ঐ পূর্ণত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কি তাহাকে পুনরায় সাধন করিতে হয়? অর্থাৎ কেহ যদি কৃষ্ণের সাধনা করিয়া পূর্ণত্ব পায় তবে কালীর সাধনা করিয়া ঐ পূর্ণত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহা কি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়?

মা—না, কারণ পূর্ণত্বের মধ্যেই সব আছে। এ অবস্থা লাভ হইলে আর কোন দ্বন্দ্বই থাকে না তবে একটা মজা আছে। কোন কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে এরূপও শোনা যায় যে তিনি শক্তিপথে উপাসনা করিয়া আবার হনুমানের সাধনা বা অন্যকোন পথের সাধনা আরম্ভ করিলেন। ইহার কারণ এই যে কাহারও কাহারও এক পথে সাধন করিতে করিতে অন্য পথগুলিও খুলিয়া যায়। যেমন কেহ দেবীর সাধনা আরম্ভ করিল এবং ঐ সাধনা চলার পথেই তাহার নিকট আর একটি নূতন পথ খুলিয়া গেল এবং ঐ নূতন পথে সে হয়তঃ হনুমানের কিংবা রাধার সাধনা আরম্ভ করিল। যতক্ষণ সাধন চলিতে থাকে ততক্ষণ ত সাধক পথেই থাকেন। একবার যদি পূর্ণত্বে পৌঁছান যায় তবে আর সাধন কোথায়?

সাক্ষীস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ

১লা শ্রাবণ রবিবার (ইং ১৭।৭।৪৯)। বেলা ১০টায় আশ্রমে

গেলাম। দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি অনেকেই মার কথা শুনিতে আসিয়াছেন। দেবশঙ্করবাবু মাকে প্রশ্ন করিলেনঃ 'ব্রহ্মস্বরূপ এবং সাক্ষিস্বরূপ' এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা ত ব্রহ্ম বলিতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মই বুঝি। স্বাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বুঝিব?"

মা—আচ্ছা, সাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বোঝ?

দেবশঙ্করবাবু—সাক্ষী যখন বলা হয় তখন বিষয়ের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়। সাক্ষী থাকিলেই সাক্ষ্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থাতে বিষয় নাই। সেখানে এক ব্রহ্মই অসঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

মা—আচ্ছা, এই যে বলিলে যে সাক্ষী বলিলে বিষয় মানিয়া লওয়া হয় এই বিষয়ের জ্ঞানই বা কিরূপ?

দেবশঙ্করবাবু—অজ্ঞানীর নিকট বিষয় বা দৃশ্যবস্তু সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি দৃশ্যবস্তুকে মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং জানিয়াই তিনি নির্বিকার দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।

মা—এই যে দ্রষ্টা বা সাক্ষীর কথা বলিতেছ ইহাও দুই রকমের হইতে পারে। অজ্ঞানীর কথা এখানে ছাড়িয়া দিলাম। যাহারা সাধন ভজন করিয়া একটু উন্নত হইয়াছে তাহারা এই বাহ্য জগতকে মিথ্যা মনে করিয়া নিজকে ইহার সহিত না জড়াইয়া শুধু সাক্ষী ভাবে ইহাকে দেখিয়া যাইতে পারে। এই যে এখানে সাক্ষী বলা হইল ইহা কিন্তু প্রকৃত সাক্ষীর ভাব নয়। ইহাকে সাক্ষীর মত বলিতে পার, কারণ সাধক এখানে নিজকে সাক্ষী বলিয়া মনে করিতেছে। মনে করা অর্থাৎ মানিয়া লওয়া। এই ভাব মানিয়া লইলে প্রকৃত সাক্ষী অবস্থা লাভ হয় না এবং এখান হইতে সাধকের পতনও হইতে পারে। প্রকৃত সাক্ষীর অবস্থা যখন আসে তখন বাহ্যজগৎ যে অলীক বা মিথ্যা তাহা আর মানিয়া লইতে হয় না। অর্থাৎ উহা আর তখন মনের ব্যাপার নয়, উহা তখন মিথ্যা বলিয়াই

অনুভূত হয় এবং হয় বলিয়াই সাধক তখন নির্বিকার এবং অসঙ্গভাবে অবস্থান করিতে পারে। তোমাদের শাস্ত্রেও বলে না যে এক গাছে দুইটি পাখী আছে, উহার একটি ফল খায় এবং অন্য একটি বসিয়া বসিয়া উহা দেখে। যে পাখীটি এইভাবে দেখে সেই দ্রষ্টা বা সাক্ষী।

দেবশঙ্করবাবু—আচ্ছা, এই শেষোক্ত সাধককে কি জীবনমুক্ত বলিতে পারি?

মা—না, কারণ এখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে। ইহা হইল একটা অবস্থা—দাঁড়াইয়া কিছু দেখার অবস্থা। দ্বৈত বোধ থাকিলে মুক্তি কোথায়? তবে সাক্ষী-স্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ অর্থেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাক্ষীস্বরূপ সেই অবস্থারই ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায় যেখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই—যেখানে মাত্র দ্বিতীয় পাখীটিই আছে, আর যে পাখীটি ফল খায় সে নাই। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পাখীটিকে দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ বলিতে পার। উহা ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নয়। কাজেই দেখিলে যে সাক্ষীস্বরূপ কথাটি তিন অর্থেই ব্যবহার করা যায়—প্রথম, সাক্ষীর মত কিন্তু প্রকৃত সাক্ষী নয়, দ্বিতীয় প্রকৃত সাক্ষী কিন্তু এখানে দ্বৈত জ্ঞান আছে এবং তৃতীয় সাক্ষীস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই।

আকাশগঙ্গায় স্নান

২রা শ্রাবণ সোমবার (ইং ১৮।৭।৪৯)। আজ সকাল বেলা হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে আশ্রমে আজ শতাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, সেইজন্য সকালবেলা আর আশ্রমে গেলাম না। বিকালে যখন আশ্রমে গেলাম, তখন কুমারবাবু ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও পাঠে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন প্রায় পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত চলিল। ইহার পর ১৫ মিনিট মৌন থাকিতে হয়। সকলে যখন আশ্রম-চত্বরে মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বৃষ্টিও দুই এক ফোটা নয়, বেশ জোরেই আসিল। শ্রীশ্রীমা আসন ছাড়িয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া আমরাও সকলে নীরবে ভিজিতে লাগিলাম। শিশু,

যুবক, বৃদ্ধ—সকলেরই এক অবস্থা। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। ঝম্‌ঝম্ শব্দে বারিপাত হইতেছে, আর এতগুলি লোক নিঃশব্দে এবং নিশ্চলভাবে ঐ বারিধারা গ্রহণ করিতেছে এবং শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ভিজিতেছে বলিয়া সকলেই মনে মনে অতি প্রফুল্ল। মৌন যতক্ষণ ছিল, বৃষ্টিও ততক্ষণ ছিল। মৌন ভঙ্গের সঙ্গেসঙ্গেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "অনেক দিন আকাশগঙ্গার স্নান হয় নাই, আজ হইয়া গেল"। আমরা সিক্ত বস্ত্রে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

গ্রহণ বর্জন দুইয়েরই প্রয়োজন আছে

৩রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ১৯।৭।৪৯)। বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে শ্রীশ্রীমা দোতলার বারান্দায় বসিয়া চিঠি লেখাইতেছেন। এই চিঠি লেখার ব্যাপার লইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা/১॥ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কে যেন মাকে একটা মালা, কিছু ফুল এবং একটা শসা ও কয়েকটি লেবু দিয়া গেল। মা এতক্ষণ শসাটি হাতে করিয়াছিলেন, এখন শসাটি হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে শসা ভালবাসে?" কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন মা বলিলেন, "অমূল্য, তুমি এই শসা নেও।" এই বলিয়া আধখানা শসা মা আমার হাতে দিলেন। বাকী আধখানা এক বিধবাকে দিয়া দিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মায়ের হাত হইতে একটি লেবু লইলেন। নির্ম্মলাদিদি নাম্নী এক বিধবাও একটি লেবু পাইলেন। পূর্ব্বোক্ত বিধবাটিকে সঙ্গে করিয়া যখন নির্ম্মলাদিদি চলিয়া আসিতেছিলেন তখন মা বলিলেন, "এই মালাটিও বা থাকে কেন? ইহাও লইয়া যাও"—এই বলিয়া মা মালাটি নির্ম্মলাদিদির গলায় পরাইয়া দিলেন। নির্ম্মলাদিদির সঙ্গিনী বিধবাটিকে মা ফুলগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এই ফুলগুলি হইতে একটি ফুল লও।"

বিধবা—মা, তুমি একটি ফুল আমাকে দেও।

মা—লওয়ার দিকটা শিক্ষা করা ভাল, অবশ্য এ ফুলের কথা বলিতেছিনা।

ভগবানের নিকট হইতে কিছু লওয়ার চেষ্টা করাও ভাল। আবার অনেকের এইরূপ ভাবও হয় যে সে ভগবানের কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিবে। এইভাবে যাহা পাওয়া যায় তাহা রক্ষা করার চেষ্টা যেমন করা উচিত, সেইরূপ ভগবান যাহা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে ভাল জিনিষ গ্রহণ এবং রক্ষা করার চেষ্টা করাও উচিত। এই দুই ভাবই ভাল।

সংখ্যা রাখিয়া জপ

নির্ম্মলাদিদি—মা, সংখ্যা রাখিয়া জপ করা ভাল কি সংখ্যা না রাখিয়া জপ করা ভাল ?

মা—সর্বদাই ভগবানের নাম করার চেষ্টা করা উচিত। সংখ্যা রাখিয়া জপ করার একটা সুবিধা এই যে ইহাতে দৈনিক সংখ্যা পূরণ হয় এবং উহা গুরুতে সমর্পন হয়। তাহা ছাড়া সংখ্যা পূরণ করিবার জন্যও নিজকে কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখিতে হয়। এইভাবে বন্ধন গ্রহণ করিলে বন্ধন মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। প্রত্যহ জপের সংখ্যা পূরণ করিতে করিতে যে দিন বাস্তবিক সংখ্যা পূর্ণ হয়, সেই দিনই তাঁহার প্রকাশ হয়। কবে যে সংখ্যা এইভাবে পূর্ণ হইবে তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই, কিন্তু তবুও প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার জপ করা ভাল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করিয়া বাকী সময়ও সংখ্যা না রাখিয়া জপ করা উচিত। মন স্থির করার যে কথা বলা হয় তাহাও কিন্তু এ জাতীয় কর্ম হইতেই হইয়া যায়। সর্বদা ভগবানের বিষয় চিন্তা, জপ ইত্যাদি দ্বারাই মনস্থির হইয়া আসে। ইহা ভিন্ন মনস্থির করিবার আর কোন উপায় নাই। বিষয় লইয়া থাকিলে মন চঞ্চল হইতে বাধ্য। এক ভগবৎচিন্তার দ্বারাই মনের চঞ্চলতা নষ্ট করা যায় এবং একবার নামজপাদিতে অভ্যস্ত হইলে পরে দেখা যায় যে বিষয়ের আলাপ করিলে বা শুনিলে প্রাণ হাপাইয়া উঠে এবং কতক্ষণে বসিয়া ভগবানের নাম করিতে পারিব সেইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

এইভাবে মা কিছুক্ষন বলিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া

আসিলাম কারণ আকাশ এমনভাবে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় যে শীঘ্রই বর্ষণ আরম্ভ হইবে।

গঙ্গাদিদির মাতার মৃত্যু

বিকালবেলা যখন আশ্রমে গেলাম তখন শ্রীশ্রীমাকে তাড়াতাড়ি হল ঘরে যাইতে দেখিলাম ; শুনিলাম যে গঙ্গাদিদির মাতার অবস্থা খুব খারাপ। গঙ্গাদিদির মাতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। তিনি কাশীতে বাসা করিয়া ছিলেন। প্রায় ২৷৷০ মাস পূর্ব্বে মা তাহাকে একবার আশ্রমে আনিয়াছিলেন। কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া তিনি আবার বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কাজেই মা তাঁহাকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। এবার দেরাদুন হইতে আসিয়া মা আবার তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়াছেন। আজ কয়েকদিন যাবৎ তাহার অবস্থা খারাপ চলিতেছে। যাহা হউক, মার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হলঘরে গেলাম। সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদা রোগীনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে শীঘ্র মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিয়া ভূপতিবাবুসহ আমি মনোমোহনের বাসায় চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে রোগীনীর অবস্থা খুবই খারাপ চলিতেছে। শ্রীশ্রীমা রোগিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা নামকীর্ত্তন করিতেছে। মায়ের হাতে একটি ফুলের মালা। মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) মায়ের জন্য মালাটি আনিয়াছিল। রোগিণী অতিকষ্টে শ্বাস টানিতেছে, পুত্র ননী কাছে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিতেছে। ইহা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "ভিতরে গঙ্গা, বাহিরেও গঙ্গা" তখনও রোগিণীর জ্ঞান আছে। একটু পরে উহাও যেন লোপ পাইল বলিয়া মনে হইল। অতি ধীরে এবং কষ্টের সহিত তখনও শ্বাস চলিতেছে। গঙ্গাদিদি রোগিণীকে স্পর্শ করিবার জন্য মাকে অনুরোধ করিলেন। মা তৎক্ষণাৎ গিয়া রোগিণীর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন এবং সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহার

একটু পরেই দেহত্যাগ হইল। তখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মা হলঘর হইতে বাহিরে আসিয়া চত্বরে বেড়াইতে লাগিলেন। আমি মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এদিকে এক নৌকা ঠিক করিয়া উহার উপরে মৃতদেহ চাপাইয়া যজ্ঞভূষণদাদা প্রভৃতি মণিকর্ণিকার দিকে রওনা হইলেন। আমি আবার মনোমোহনের বাসায় ফিরিয়া গেলাম। সেখানে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আবার আশ্রমে আসিলাম। মা তখন নেপাল (নারায়ণ স্বামী) দাদার ঘরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় বলাই নামে ৩।৪ বৎসরের ছেলেকে মায়ের কাছে আনা হইল। সে তখন কাঁদিতেছিল। কে যেন বলিল ছেলেটি ভয় পাইয়া কাঁপিতেছে। ইহা শুনিয়া মা এবং খুকুনীদিদি ছেলেটিকে সাহস দিতে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। মা ছেলেটিকে একটু গরম দুধ দিতে বলিলেন। মৃতের চেহারা দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক ছেলেটি ভয় পাইয়াছিল। ইহার একটু পরই মা আহার করিতে উঠিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ভবিতব্যের প্রকাশ সামান্য উপলক্ষ্য ধরিয়া হয়

৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ২১।৭।৪৯)। আজ আর সকালের দিকে আশ্রমে যাইতে পারিলামনা। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন হলঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনান্তে নানাকথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় শ্রীশ্রীমা কমল (বিরজানন্দজী) দাদার মায়ের কথা তুলিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই আশ্রমেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। মা বলিলেন, "কমলের মার ছেলের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। ছেলে যে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে ইহা তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। ছেলের কথা মনে হইলেই তাহার চোখ দিয়া জল পড়িত এবং ছেলেকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিত। একবার সে বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেল, উদ্দেশ্য ছেলেকে বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়া। বিন্ধ্যাচল থাকার সময় একটি ইন্দুর তাঁহার বিছানায় ঢুকিয়া খুব জ্বালাতন

করিতে থাকে। উহার অত্যাচার সহ্য করিয়া না পারিয়া সে রাগ করিয়া ইন্দুরটিকে মারিয়া ফেলে। ইন্দুরটিকে মারিয়া তাঁহার ভীষণ অনুতাপ হয়। জীবনে সে কখনও কিছু মারে নাই। ক্রোধের বশে সে ইন্দুরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার যাইবে কোথায়? সেই জন্য তাহার এত অনুতাপ! তাহা ছাড়া সে নিজের ছেলেকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাই আক্ষেপ করিতে করিতে সে বলিত, "এই ইন্দুরেরও বাপ মা আছে, উহাও কাহারও পুত্র; আমি অন্যের ছেলেকে মারিয়া ফেলিলাম।" অর্থাৎ সে নিজের পুত্রস্নেহের ভিতর দিয়াই ইন্দুরের বাপমার কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করা যায় সে সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তে যে সব দানের কথা আছে উহা শুনিয়া সে বলিল "আমার এত টাকা কোথায় যে আমি দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব?" তখন এ দেহ খেয়ালবশে তাহাকে বলিল, যদি তুমি টাকা পয়সা দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পার তবে এক কাজ কর। তুমি বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া নিজের ছেলেকেই বিশ্বনাথকে দান করিয়া ফেল এবং আর ছেলের উপর কোন দাবী রাখিও না। সে তাহাই করিল। আমি একদিন কমলকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে সে যদি বিশ্বনাথের মন্দিরে তাহার মাকে কিছু করিতে দেখে তবে সে যেন তাহার মায়ের নিকট হইতে দীক্ষা নেয়। সেও তাহাই করিল, এইভাবে কমলের মা পুত্রস্নেহের দারুণ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিল। এই ঘটনার পর হইতেই দেখা গিয়াছে যে ছেলের প্রতি তাহার যে দারুণ আকর্ষণ ছিল তাহা অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কমলের যে সন্ন্যাসজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা পূর্ণ হইল। তাই দেখ, যাহা ঘটিবার তাহা কেমন একটা সামান্য উপলক্ষ্য ধরিয়া ঘটিয়া যায়।"

ভয়রূপে শক্তির প্রকাশ

(ছোট) স্বামী শঙ্করানন্দ - মা, সেদিন বলাই যে প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া

ভয় পাইল তাহা কি ভাবে হইল ? সে কি বাস্তবিকই প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছিল ? মা—বলাই ছেলেমানুষ, বোধহয় কেহ উহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল যে গঙ্গাদিদির মা ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহা শুনিয়াই বোধহয় ও এত ভয় পাইয়াছিল। তবে মৃত ব্যক্তি অনেক সময় দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া দেখা দেয় এবং কথা বলে, এরূপ কথা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। অবশ্য বলাই বাস্তবিক কিছু দেখিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে এ দেহ কিছু বলিতেছেনা। এই যে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর হওয়া, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হওয়া, ইহাও একরূপ শক্তির খেলা। যেখানে এইরূপ শক্তির খেলা হয় উহার প্রভাবটাও কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ঐ প্রকাশটা ভয়রূপে দেখা দেয়। এই জন্য এইরূপ বিধান আছে যে যাহারা ছেলেপেলে লইয়া শুইয়া থাকে তাহারা রাত্রিতে উঠিয়া যদি জপ করে তবে যেন বিছানা ছাড়িয়া আলাদা আসনে বসিয়া জপ করে। কারণ যদি জপের ফলে কোন শক্তির প্রকাশ হয় তবে যাহারা ঐ শক্তি ধারণ করিতে সমর্থ নয় তাহাদের নিকট ঐ শক্তির প্রকাশটা ভয়রূপে দেখা দিবে। ছেলেপেলে হয়ত ঘুম হইতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিবে। ভয়রূপে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহা এ দেহও দেখিয়াছে। বাজিতপুরে যখন ছিলাম তখন ত রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া জপ ইত্যাদি হইত। ভোলানাথ পাশে ঘুমাইয়া থাকিত। ঐ জপাদির সময় নামের গুণেই নানা শক্তির খেলা আরম্ভ হইত। যখন ঐরূপ শক্তির প্রকাশ আরও হইত তখন দেখিয়াছি যে দেহটার মধ্যে কেমন একটা ভয়ের ভাব দেখা দিত, তখনই শক্তির খেলা বন্ধ হইয়া যাইত। ভয় পাইলে যেমন শক্তির খেলা বন্ধ হয়, সেই শক্তির খেলা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ভয়ের ভাব প্রকাশ হয়। এ দেহের উপর দিয়া যখন সাধনের অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল তখন এই দুই ভাবই দেখিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

মাতৃ-সৎসঙ্গ

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

(১৫)

শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে শ্রীমতী কমলাবেন নিজের ব্যক্তিগত অনুভবের একটি কাহিনী শেষ করার পর ডাঃ পান্নালাল ও পূজ্য হরিবাবা আমাকে বলার জন্য আগ্রহ করতে লাগলেন। আমি কিছুই বলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এই দেখে হরিবাবা মাকে বললেন "মা, কান্তিভাইকে আপনি আজ্ঞা করুন।" মা বললেন "কিছু বল।" মার আদেশ হল, এখন কি করা যায়? আমি অনিচ্ছায় বলতে শুরু করলাম।

আমি এখানে যে ঘটনাটি বলতে চাইছি সেটি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের। এইটি বর্ণন করার আগে একটু পূর্বাপর সম্বন্ধ দেওয়া উচিৎ। আমার পরম কৃপালু মার প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারীতে। সেই সময়ে মা গুজরাটে নর্মদাতটে ব্যাসক্ষেত্রে নিবাস করছিলেন। আমিও সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি। মার প্রথম দর্শনেই (Love at the first sight) মার প্রতি খুব প্রেম হয়ে গেল। মা এমন তীব্র আকর্ষণ করলেন যা অবর্ণনীয়। আকর্ষণের সামনে আমার মতো ক্ষুদ্র জীব কি করে টিকতে পারে? পরিণাম এই হল যে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পয়লা মার্চ্চে আমি নিজের পরিবার সমাজ ইত্যাদি ছেড়ে দিলাম ও পরমকৃপাময়ী মা কৃপা করে নিজের চরণকমলে আমায় স্থান দিলেন। মার সঙ্গে থাকতে থাকতে আন্তরিক জগতের অদ্ভুত প্রকারের অনুভব হওয়ায় মার কাছে থাকতে খুব ভাল লাগল। কিন্তু তবুও মার বাস্তবিক স্বরূপ না বুঝে খুব চিন্তিত থাকতাম। মায়ের কোনো ভক্ত বলে "মা তো সাক্ষাৎ ভগবান।" কেউ বলে "ভগবতী", কেউ বলে "কৃষ্ণ"। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কথা

শুনতে পাই। এইজন্য একদিন আমি একান্তে মাকে জিজ্ঞেস করলাম "মা তুমি কে? কেউ বলে তুমি ভগবান, কেউ বলে তুমি দেবী। আমার যতক্ষণ স্বানুভব না হয় ততক্ষণ আমি এর মধ্যে কোনটাই মানতে রাজি নই।"

মা বললেন "তুমি যা বল আমি তাই।" মার উত্তরে আমার কোন সমাধান হল না। মনে অনেক প্রকারের বিচিত্র শঙ্কা উৎপন্ন হতে লাগল। শেষে আমি মাকে একান্তে বললাম "মা আমার মনে হয় যে সব সময়ে আপনার কাছে থাকার আগে একবার ভারতবর্ষ ঘুরে সাধুসন্তদের দর্শন করে আসি। কারণ যদি এখন থেকেই এখানে থেকে যাই তাহলে কদাচিৎ মনে এই অসন্তোষও থেকে যেতে পারে যে আমি কেমন মূর্খ! এখানেই পড়ে রইলাম। এইজন্য মা, যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি যাই।"

মা—খুব আনন্দের সহিত যাও। যেখানে তোমার ঠিক মনে হয় সেখানে থেকো। যোগ্য গুরু পেলে দীক্ষাও নিয়ে নিও।

মার সাথে এমনি অনেক কথা হল। মার কাছ থেকে প্রেমপূর্ণ বিদায় নিয়ে আমি প্রবাসের নিমিত্ত চললাম। অনেক তীর্থ-ভ্রমণ করলাম। স্বামী রামদাসজীর কাছে ১০ দিন রইলাম। শ্রীরমণ মহর্ষির আশ্রমেও ২০ দিন রইলাম। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম পণ্ডীচেরীতে প্রায় ১ মাস থাকলাম। এই রকমে ঘুরতে ঘুরতে জগন্নাথপুরী ও কলকাতা হয়ে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম। পুরী থেকে মাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। এই পত্রের উত্তর আমি শান্তিনিকেতনে পেলাম। সেই সময়ে মা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। তখন মা কোথায় ছিলেন তা মার কেবল কয়েকজন ভক্তেরই জানা ছিল। মার সমস্ত পত্র লক্ষ্ণৌর হরিরামযোশীর কাছ থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে যেত। তিনি মার অজ্ঞাতবাসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতেন। আমার চিঠিতেও কোনো ঠিকানা ছিল না। কেবল তারিখ ছিল। চিঠিতে মা কোনো বিশেষ কথাও লেখাননি। আমারও বিশেষ কিছু মনে হল না।

তবুও মনে হল মাকে একটি চিঠি লিখে দেই। চিঠি লিখেই শুয়ে পড়লাম। অকস্মাৎ মনে একটি প্রেরণা উঠল যে মা আমাকে নিজের কাছে ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠলাম ও নিশ্চয় করলাম যে এখনি আমি প্রথম গাড়িতেই মার কাছে চলে যাই। কিন্তু হায়রে ভাগ্য! কোথায় যাব? মা কোথায় আছেন তা তো কিছুই জানি না। চিঠিতেও কোনো ঠিকানা লেখা নেই। কেমন করে মার কাছে পৌঁছাব? এইরূপ মনের মধ্যে খুব সংকল্প-বিকল্প উঠতে লাগল। মার কাছে কোনো প্রকারে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো উচিৎ এইটিই বার বার মনে হতে লাগল। কিন্তু কি করা যায়? অবশেষে অন্তর্যামিনী মাই বুদ্ধি দিলেন। আমি কার্ডের উপরের ডাকখানার মুহর দেখলাম। তাতে 'সাগর সিটি' পড়তে পারলাম। তক্ষুনি পোষ্টালগাইডে খোঁজ করলাম।

সারা ভারতে ৫।৬টি সাগর আছে জানতে পারলাম। এখন মা কোন সাগরে আছেন কি করে জানব? বন্ধুদের দ্বারা শান্তিনিকেতনের ছাত্রালয়ে খোঁজ করালাম। একটি বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে এটি মধ্যপ্রদেশের 'সাগরসিটী' হতে পারে। নিশ্চিত তো কিছুই ছিলনা। অতএব স্থির করলাম যে আজই আমার সেখানের জন্য রওনা হওয়া উচিৎ। শান্তিনিকেতনে আমি নন্দলাল বসুর অতিথি ছিলাম। তাঁকে আমি বলে-ছিলাম যে আমি এখানে প্রায় সাত দিন থাকব। হঠাৎ আমার বিচারের পরিবর্ত্তন দেখে উনি আশ্চার্য্যান্বিত হলেন। তাঁর আজ্ঞা নিয়ে আমি ষ্টেশন চললাম। রাস্তায় ভাবলাম যে মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার রাস্তায় কাশী হয়ে আগে সেখানে খোঁজ করে নি—যদি মার কোনো খবর পাই। পরের দিন কাশী পৌঁছালাম। সেই সময়ে মা বেশীর ভাগ কাশীতে স্বর্গীয় নির্ম্মলকুমার চ্যাটার্জ্জীর বাগানে থাকতেন। আমিও সেখানে গেলাম। কিন্তু সেখানে মার কোনো বিশেষ খবর পেলাম না। কারণ মার কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই মা কোথায় চলে যান। তার কি ভরসা?

কাশীতেও মার কাছ থেকে আসা চিঠির উপরে 'সাগরসিটীর' মুহুর লাগা ছিল। অতএব কাশীর ভক্তরাও সাগরের কথাই বললেন। আমি তক্ষুনি প্রথম গাড়ীতেই সাগর যাওয়ার স্থির করলাম। মনে একটি তীব্র আকর্ষণের অনুভব করলাম। মনে হল মাকে ছাড়া আর আমি থাকতে পারবনা। এই প্রকার মা কোথায় আছেন তা না জেনেই আমি সাগরের দিকে রওনা হলাম। সেই রাতেই প্রায় দুটোর সময় সাগর ষ্টেশনে পৌঁছালাম। রাত্রিবেলাতে ধর্মশালায় থাকলাম। মনে কেবল একটিই চিন্তা ছিল যে মাকে কি করে পাই? সাগর বড় শহর। এত বড় শহরে মাকে কেমন করে খুঁজব? অনেক প্রকারের চিত্র-বিচিত্র তরঙ্গ মনে খেলা করতে লাগল। সকালে উঠে নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে তৈয়ার হলাম। মার একটি ছোট ফটো নিলাম যদি রাস্তায় কাজে লাগে। প্রথমে ভাবলাম মার সঙ্গে তো কেবল অভয় আর গুরুপ্রিয়াদিদি আছেন। অভয় তো সকালে তরীতরকারী কিনতে আসবেই। তাই সকালে তরকারীর বাজারেই খোজ করি। সেখানে গিয়ে খুঁজলাম, কিন্তু কোনো কিছুই খোঁজ পেলাম না। সেখান থেকে আরো আগে গিয়ে পোষ্ট অফিস্ দেখতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে এখানেই জিজ্ঞাসা করি পোষ্টকার্ডের উপরের মুহুর এখানকার কি না? পোষ্টমাষ্টারের সাথে দেখা করলাম। উনি মুহুর দেখে বললেন যে মুহুর তো এখানকারই। এই শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম। আমি বললাম যে একটু কৃপা করে কি বলবেন যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার পত্র এখানে কোন্ ঠিকানায় আসে? তিনি বললেন "এটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস। এখান থেকে পত্র বিতরণ করা হয় না। বড় পোষ্ট অফিসে খোঁজ করতে হবে।"

এইরূপে নিরাশ হলাম। পোষ্ট অফিসের কাছেই একটি ওষুধের দোকান ছিল। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে অভয় নামে কোনো ছেলে আসে কিনা? তার চেহারারও বর্ণনা দিলাম। সেও হতাশ করে দিল। তখন মনে হল যে এর আগে যদি কোনো বাঙ্গালী থাকে সে হয়তো মার খবর দিতে পারবে। খুজতে খুঁজতে একটি বাঙ্গালীর ঘরে না

জিজ্ঞাসা করেই ঢুকে পড়লাম। মার দর্শনের এত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে কারুর ঘরে আজ্ঞা নিয়ে প্রবেশ করার ব্যবহারিক নিয়মও বিস্মৃত হয়েছিলাম। তাই ঘরে ঢুকে মার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই, না জিজ্ঞেস করে ঘরে প্রবেশের জন্য সে ধমকাতে শুরু করল। আমি লজ্জিত হলাম। মার বিষয়ে কোনো খবর পেলাম না। মনে দুঃখ পাওয়ার আগেই চলে এলাম। রাস্তায় এক বাঙ্গালী উকিলের সাথে দেখা হল। ওনাকে মার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন "আমি মা আনন্দময়ীর নাম তো শুনেছি কিন্তু জীবনে কখনো তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। মা কি এখানে আছেন?" আমি বললাম "এখানেই কোথায়ও অজ্ঞাতবাসে আছেন। কিন্তু মার ঠিকানা আমার কাছে নেই। যদি প্রধান পোষ্টমাষ্টার আপনার পরিচিত হন তবে তাঁর সাথে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দিন। যদি সেখান থেকে মার ঠিকানার কোনা খবর পাই।" উকীলবাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পোষ্টমাষ্টার প্রেমপূর্বক আমায় চেয়ারে বসালেন।

সমস্ত চিঠিপত্র দেখলেন কিন্তু মার কোনো খবর পাওয়া গেল না। মার চিঠি লক্ষ্ণৌ থেকে রীডায়রেক্ট হয়ে সাগরে আসত। কিন্তু ঠিকানার খোঁজ পাওয়া গেল না, এতে মন খুব নিরাশ হয়ে গেল। "হে মা! তুমিই তোমার ঠিকানা বলে দাও।" রাস্তা নির্জন ছিল। একলা একলা মাকে ডাকতে ডাকতে চললাম। মনে অদ্ভুত অবর্ণনীয় বিরহ ভাব জাগ্রত হল। রাস্তার গাছ, পাথর, সজীব, নির্জীব সবাই আমার সামনে চৈতন্যময় হয়ে উঠল। তাদের সবাইকে মার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম। "হে বৃক্ষ, তুমি নিশ্চয়ই আমার মাকে দেখেছ। বল আমার মা কোথায় আছে? হে পাথর! নিশ্চয়ই এদিক দিয়েই আমার মা গেছেন, তুমি নিশ্চই জান যে আমার মা কোথায় আছেন? এইরূপে মা মা করতে করতে মার নামে বিভোর হয়ে চোখের জলে স্নান করতে করতে চলতে লাগলাম। যখন আমি মার জন্য অধীর হয়ে এদিক

ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়েই মা যেখানে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, 'কান্তি কান্তি' বলে ডাকছিলেন আর হাসছিলেন। সেই সময়েই গুরুপ্রিয়া দেবী মাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কোন কান্তি? গুজরাটের কান্তির কথা মনে করছ?" মা স্বীকার করলেন। এইরূপ মার লীলা চলছিল। এদিকে আমি নিরাশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি রামমন্দিরে গিয়ে পৌঁছালাম। প্রায় বেলা ১২টা। মন্দিরের পূজারীর সাথে দেখা করলাম। মার ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "এমনি কোনো মা কি এই মন্দিরে এসেছিলেন?" সে ফটো দেখে বলল "হ্যা, এই ফটোতে যিনি আছেন ঠিক তেমনি মাতাজী ও তাঁর সাথে দীর্ঘকেশমণ্ডিতা একটি স্ত্রী ও কুন্তলকেশ সমন্বিত একটি ছেলে এই তিন ব্যক্তি প্রায় ১৫ দিন আগে এখানে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ এখানে থেকে চলে গেলেন।" এই শুনে মনে অসীম আনন্দ হল। যা হোক্ "সাগর সিটী" তো এইটিই কিন্তু ১৫ দিন আগে যে মা এখানে কিছুক্ষণ থেকে চলে গেছেন তাঁকে এখন কোথায় খুঁজে পাব? একটু সময়ের মধ্যেই মার কার্য্যক্রমের পরিবর্ত্তন হয়ে যায় আর ১৫ দিনের তো কোন কথাই নেই।

এইপ্রকারে আমার প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। এখন কি করি? শেষে মনে হল ষ্টেশনে যাই মা যদি কোথায়ও যান তবে ষ্টেশন হয়েই যাবেন। আর যদি কোথায় গিয়েও থাকেন তবে এখানে হয়েই গিয়েছেন। মার ব্যাক্তিত্বই এইরূপ যে যেখানেই যান না কেন সেখানকার লোকেদের ওপরে কিছু না কিছু ছাপ থাকবেই। ষ্টেশন মাষ্টারের সাথে দেখা করলাম। তাঁকে মার ফটো দেখিয়ে বললাম "আমার মা সাগরের দিকে এসেছেন। তাঁর ঠিকানা আমার কাছে নেই। আপনি কি এইরকমের মাতাজীকে ষ্টেশন হয়ে কোথায়ও যেতে দেখেছেন?" তিনি নিষেধ করে দিলেন। আমি বললাম "এই ফটোর মাতাজীকে যদি এই ষ্টেশনে দেখেন ও যদি এই কাছেই ধর্ম্মশালাতে একটু খবর দিয়ে দেন তবে খুব ভাল হয়।" ষ্টেশনমাষ্টার বললেন "আচ্ছা, আমি যথাশক্তি চেষ্টা করব।"

এইপ্রকারে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় বেলা ২টো হয়ে গেল। কিছুই খাওয়ার ছিলনা। খাওয়ার কথা ভালও লাগছিল না। আমি কি মার কোনো খবরই পাব না? যদি মা সাগরেই না থাকেন আর আমি এখানেই থেকে যাই? আমার কাছে যা পয়সা ছিল তাও শেষ হয়ে এল। এরকমভাবে কতক্ষণ চলবে? এইভাবে অনেক বিচারেয তরঙ্গ মনে উদ্ভুত হতে লাগল। এরপর আমি বাজারে গিয়ে দুধের দোকানে বসে দুধ পান করতে লাগলাম। কাছেই একটি মোটর কোম্পানীর সাইনবোর্ডের উপরে দৃষ্টি পড়ল। তক্ষুনি আমার মনে হল হয়তো মা সাগরে না থেকে কাছেপিঠের কোনো গ্রামে আছেন। যদি ড্রাইভারদের জানাই তা হলে তাদের থেকে একটা খবর পাওয়া যেতে পারে। এই বিচার করে মোটর কোম্পানীর এক ম্যানেজার গোছের ভদ্রলোকের সাথে দেখা করলাম ও তাঁকে নিজের করুণ কাহিনী শোনালাম। মার ফটো দেখিয়ে বললাম "যদি আপনি কৃপা করে ড্রাইভারদের বলে দেন তবে খুব ভাল হয়। যে কোনও গ্রামে এই ফটোর মাতাজীকে দেখলে আমাকে যদি এই ধর্মশালায় খবর দিয়ে দেন তবে আমি চিরকৃতজ্ঞ হব।" তিনি স্বীকৃতি দিলেন। এইপ্রকারে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করে ধর্মশালায় গিয়ে নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম। মার লীলাই অদ্ভুত। বিকেল প্রায় তখন ৪টা। ইতিমধ্যে আমার নামধরে ডাকতে ডাকতে একটি লোক আমার কাছে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি ভাই কি কাজে?" "আপনি আপনার মার খোঁজ করছিলেন তো? এইরকমের মাতাজী এখান থেকে ৯ মাইল দূরে চিতোরা নামে একটি গ্রামে আছেন। তাঁর সাথে একটি অন্য স্ত্রী-লোক ও একটি বালক আছে। তবে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারছিনা যে ইনি আপনারই মা না অন্য কেউ?" আমি বললাম যে আপনি কৃপাকরে সেখানে যাওয়ার জন্য মোটরের ব্যবস্থা করে দিন। যদি সেখানে মা না থাকেন তাহলে আবার ফিরে আসব।" তার অধিকাংশ চিহ্নই মিলে যাচ্ছিল। তাতে মনে হল অবশ্যই ইনি আমার মাই হবেন। মনে অসীম আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত

হতে লাগল। মনে হল আহা আমার মা কি দয়ালু। হে পরম কৃপালু মা! তোমার জয় হোক! মনের আনন্দে নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে মোটর ষ্টাণ্ডে গেলাম ও মোটরে বসে পড়লাম। মোটর ষ্টার্ট হতে একটু দেরী হল। প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অধৈর্য্য করে তুলছিল। শেষে মোটর চলতে শুরু করল। প্রায় নয় মাইল চলার পর মোটর থামল। ড্রাইভার বলল সামনে যে বাড়ীটিকে দেখছেন ওর মধ্যেই মা আছেন। আপনি এখানেই নেমে পড়ুন। আমি তক্ষুনি নেমে পড়লাম। এই স্থানে কেবল এই একটিই ঘর আছে। আসেপাশে কোন বস্তি বা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল না। মনে আর আনন্দ ধরে না কারণ একটু পরেই আমার পরম ধ্যেয়স্বরূপা পরম কৃপালু মার শ্রীচরণে আমি পৌঁছাব। সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ ছিল। কোথা থেকে একটি শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীটির দিকে অগ্রসর হলাম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম সেখানে কেউই নেই। এই দেখে মনে গভীর দুঃখ পেলাম। আরে! একি? আরো আগে গেলাম। অন্য আরেকটি ঘরে গিয়ে অভয়কে দেখতে পেলাম। আশার সঞ্চার হল যে মা তো এখানেই। মাকে ঘরে না দেখে বাইরে খুঁজতে লাগলাম। দূর থেকে মা ও দিদিকে আসতে দেখে অসীম আনন্দ হল। আমাকে দেখে দিদি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, "আরে! তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? আজই মা তোমাকে ডাকছিলেন। মা তিনবার "কান্তি" "কান্তি" বলছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন কান্তি? গুজরাটের কান্তির কথা ভাবছ? মা উত্তর দিলেন, হ্যাঁঃ আর তুমি তো এখানে এসে উপস্থিত হলে।" মাও আমার দিকে তাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন। মা নীচে বসেছিলেন। আমি তক্ষুনি মার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলাম। হর্ষাশ্রু বইতে লাগল। দিদি আর অভয় আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে তুমি অজ্ঞাতবাসে কি করে এলে? কিন্তু আমি তো মাকে পেয়ে মার কোলে মাথা রেখে হর্ষাশ্রুর প্রবাহে এমন তন্ময় হয়ে গেলাম যে মুখ থেকে আর বাণীর উচ্চারণ হল না। মা আমার এই

অবস্থা দেখে আমাকে আশ্বাস দিলেন আর বললেন "যে খোঁজে সেই পায়।" এরপর আমি মাকে ঐতিহাসিক অন্বেষণের কাহিনী শোনালাম।

আমার কাহিনী সম্পূর্ণ হওয়ার পর পূজ্য হরিবাবা আমাকে বললেন "তুমি তো সত্যিই মার খুব কৃপাপাত্র।" এরপর মাতৃ-সৎসঙ্গ সমাপ্ত হল।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় সৎসঙ্গ

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী মাতৃভক্ত-গণের অবগতির জন্য জানান জাইতেছে যে কলিকাতায় নিম্নলিখিত তিনটি স্থানে নিয়মিতভাবে পাঠ, মাতৃ-আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। সৎসঙ্গের দিন ও সময় নীচে দেওয়া হইল।

দিন	সময়	স্থান
প্রতি মঙ্গলবার	সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা	৩০, সাউথ্ রোড সন্তোষপুর মডার্ণ ল্যাণ্ড যাদবপুর কলিকাতা-৩২ (শ্রীমুরারী মোহন দের বাড়ী)
প্রতি বৃহস্পতিবার	সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা	৪৪, হাজরা রোড কলিকাতা-১৯ (ডাঃ গোপাল দাসগুপ্তের বাড়ী)
প্রতি ইংরাজী মাসের ২৩ তারিখ	সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা	৪৩২/৪, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড কলিকাতা-৪৫ (শ্রীপ্রতিভা কুমার কুণ্ডুর বাড়ী)

কৃপাময়ী মা

শ্রীঅমিয় কুমার গুপ্ত

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের প্রসঙ্গে অনেক সময় অনেক রকম আলোচনা হয় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে। কেউ কেউ শ্রীমায়ের অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা বলেন, কেউ বা বলেন জাগতিক মায়ের মত সবার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ মধুর ব্যবহারের কথা; কেউ কেউ আবার ব্যক্ত করেন কতটা মায়ের সান্নিধ্যে তাঁহারা এসেছেন এবং কত রকম ভাবে মায়ের কৃপার অধিকারী হয়েছেন। এই সব আলোচনা সত্যিই অতীব মর্ম্মস্পর্শী এবং বেশ কিছুটা আনন্দের শিহরণ বহে যায় মনের ভিতর দিয়ে যখন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, এবং শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর বাণীর পুনরাবৃত্তি হয় কখনও কখনও টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে। আবার কিছু কিছু ভক্তের মুখে শোনা যায় এই ধরণের নৈরাশ্যের কথা—"এই তো মা অমুক জায়গায় এসেছিলেন, কিন্তু নানা রকম সাংসারিক বাধাবিঘ্ন এসে আমাকে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে। এই সব বাধা এসে না পড়লে নিশ্চয়ই মায়ের শ্রীচরণপদ্ম দর্শন লাভ করতে পারতাম"—তার স্বভাবজাত ধারণা যে এই দর্শনেই হয়তো শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাবারি বর্ষিত হোতো তাহার উপর এবং মায়ের চাক্ষুষ দর্শন না পাওয়ার জন্যই তাহা বিঘ্নিত হয়েছে। এই ভাবধারা হয়তো একটা বিরুদ্ধ ভাবের উৎস হয়ে সব সময়ই আমাদিগকে বিচলিত করবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা যে শ্রীশ্রী মাকে ধীর, স্থির ও একনিষ্ঠভাবে ডাকতে পারলে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যায় দুর থেকেও। কারণ, আপাতদৃষ্টির এই দূরত্ব মায়ের কাছে অতীব উপেক্ষণীয়। ভক্তপ্রবর ডাক্তার গোপাল দাসগুপ্তের কলিকাতাস্থ হাজরা রোডের বাসভবনে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এক মাতৃসঙ্গ ও মৌনমিলনের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত। এই অনুষ্ঠানে গীতাপাঠ, মাতৃসঙ্গীত এবং মাতৃ আলোচনা প্রভৃতি শোনবার সৌভাগ্য আমার প্রায়ই হয়। এই মিলন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কি আনন্দের প্রস্রবন বহিয়ে দেয় তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। কৈ, তখনতো মাকে চাক্ষুস না দেখার অভাবের অনুভূতি হয়না, আলোকচিত্রের মাধ্যমেই যেন শ্রীশ্রীমা মূর্ত্ত হয়ে দেখা দেন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে। অতএব মায়ের উপদেশাবলীর ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করে সেইভাবে নিজেদের জীবনের গতিকে যদি অনুপ্রাণিত করিতে পারি তবেই তো পাবো অফুরন্ত তৃপ্তি, যে তৃপ্তি জাগতিক জীবের পক্ষে অন্য কোন বিষয়বস্তু উপভোগের মাধ্যমে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। সত্যিকারের ভক্ত হতে পারলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রীশ্রীমা শত শত যোজন দূর থেকেও দেখতে পান তাঁর ভক্তকে অতীব নিকটে। কারণ তিনি যে জগৎজননী; সমস্ত জগতের ক্রীড়াভূমির সবই তো তাঁর দৃষ্টিপথে রয়েছে। শুনেছি, কোন কোন ভাগ্যবানের এমন অভিজ্ঞতাও আছে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকাকালিন্ অবস্থায় কৃপাময়ী মা তাঁহাদের চাক্ষুষ দর্শন দিয়েছেন—তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহাভ্যন্তরে মূর্ত্ত হয়ে। করুণাময়ী মাতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত মুখনিঃসৃত সুমধুর বাক্যালাপের ভিতর দিয়ে এইরূপ পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছেন কখনও কখনও। তিনি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেছেন অনেক ভক্তের কৃতকর্ম্মের, ভাবের এবং গতির বিবরণী বিষদভাষায় যদিও মা ভক্তের লৌকিক দৃষ্টির অনেক বাইরে বহু যোজন দূরে অবস্থান করছিলেন তখন। সূর্য্যের আলো কি এক জায়গায়

সীমাবদ্ধ থাকে! সে যে ব্যপ্ত হয়ে দীপ্ত হয় বিশ্বজগতের সর্বত্র। তবে হ্যাঁ যদি অর্গল দেওয়া বন্ধ ঘরে থাকা হয় তবে কেমন করে দেখবে সূর্য্যের আলো? কর অর্গল মুক্ত নিজেকে, ছুটে যাও কুজ্‌ঝটিকা থেকে বাইরে, ঘুচে যাবে সব কুহেলিকা, দেখতে পাবে আলো আর আলো। তবেই তো মা তোমাকেও দেখবেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে যদি অবস্থান কর তবে কেমন করে পাবে মায়ের কৃপা? সাংসারিক কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবী কোন বাধার জন্য কিংবা কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা না করে মায়ের সন্নিকটে আসা সম্ভব নাও হ'তে পারে কোন কোন সময়। এ হেন পরিস্থিতিতে ভাবতে হবে যে যেটুকু সুযোগ পূর্ব্বে আমি পেয়েছি মাকে চাক্ষুষ দেখার সেইটুকুই আমার প্রাপ্য, এর বেশী আশা করলে মনটাই শুধু চঞ্চল হবে, এবং মনের পবিত্রতা নষ্ট হবে। অধিকন্তু, এইরূপ ক্ষোভপূর্ণ মনোভাব পোষণ করলে সেটা মায়ের কৃপাপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে মনে কিছু কিছু বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভবে।

কিছু কিছু ভক্তকে আবার আপত্তিসূচক ভাষায় বলতে শোনা যায় কোন কোন সময় যে "মা বড়লোকের মা। তিনি বড়লোকের বিশেষভাবে আপ্যায়ন করেন এবং সঙ্গতিহীন ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতে অনেক সময় সুযোগ পায়না।" এটা ঠিকই যে কিছু কিছু মায়ের ভক্ত আছেন, যাঁরা বেশ অবস্থাপন্ন এবং অনেক সময় দেখা যায় যে শ্রীশ্রীমা তাঁদের দর্শন দিয়ে থাকেন একটু অধিক তৎপরতার সঙ্গে, যে দর্শন হয়তো জনসাধারণের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়না অতটা তৎপরতার সঙ্গে। এই দেখেই যদি আমরা শ্রীশ্রীমাকে বিচার করতে উদ্যত হই তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রভূত ভুল কোরবো এবং মায়ের কাছে অপরাধী প্রতিপন্ন হব। আমার অনুভূতিতে মায়ের আচরণের এই পার্থক্যের একটা যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পেয়েছি। শ্রীশ্রীমাতো সত্যিকারের জগৎজননী, তাঁর কাছে আবার গরীব বড়লোক আছে নাকি? তিনি তো সবার উপরই কৃপাবারি বর্ষণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন সদাসর্ব্বদা। তবে

প্রশ্ন, কেন তিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন কিছুটা পক্ষপাতিত্বের ভঙ্গি নিয়ে, কোন কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে কেন তিনি অপেক্ষমান অনেকানেক দর্শনার্থীর আপাত অধিকার গ্রাহ্য না করে সেই ব্যক্তিকে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে দর্শন দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন। আমার অনুভূতিতে এইটাই মনে হয় যে মা যে সব ব্যক্তিকে এই ভাবে দর্শন দিয়ে থাকেন তাঁরা হয়তো এইরূপ বাহ্যিক আপ্যায়নের অভাব হ'লে মায়ের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন এবং তাতে তাঁদের আত্মিক উন্নতির ব্যঘাত ঘটাবে। শ্রীশ্রীমা যে চান সবারই ভাল হোক। কারণ তিনি তো কারুর একার মা নন, তিনি যে বিশ্বজগতের সবারই মা এবং প্রত্যেক সন্তানের উপরই যে তাঁর নজর রয়েছে। তাই তো তিনি যার সঙ্গে যেরূপ আচরণের প্রয়োজন তার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করে থাকেন। চিকিৎসক যেমন একই রকম রোগে বিভিন্ন রোগীকে ভিন্ন রকম উপসর্গ ও লক্ষণ অনুসারে প্রয়োজন মত অনুপাতিক স্বতন্ত্র প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে শ্রীশ্রী মাও সেই একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন প্রণালীতে তাদের অসুস্থ ও অচেতন মনোবৃত্তির চিকিৎসা করতে সদাই আগ্রহী। যার প্রতি যেরূপ বাহ্যিক ব্যবহারের প্রয়োজন সেইরূপ ব্যবহারই তিনি করে থাকেন। শ্রীশ্রী মায়ের অন্তর্দৃষ্টিতে তো সবাই ধরা দেয় তাদের অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তির গতি নিয়ে। সুতরাং মাঝে মাঝে শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আচরণের বৈশিষ্ট আমাদের বিচলিত করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। আমরা যদি শ্রীশ্রীমাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করতে পারি মার চরণতলে নিজেকে মনন শক্তিকে জাগ্রত করে, তবে তিনি কার উপর কিরূপ ব্যবহার করলেন সে সম্বন্ধে বিচার করবার ঔদ্ধত্য কেন হবে আমাদের? আমাদের ভাল মন্দ সব কিছুর জন্য যদি নির্ভরশীল হই তাঁহার উপর তবে এই সব চিন্তাধারা আমাদের মনকে বিচলিত করে অপবিত্র করবার অবকাশ পাবেনা।

সুতরাং চেষ্টা করে যাও সংসারের মাঝে থেকেও মনটাকে পবিত্র করে শূন্য করে দিতে, আবার পূর্ণ কর নিজেকে সৎচিন্তায়। তবেই তো পাবে

অনাবিল আনন্দ। মায়ের চাক্ষুষ দেখা পেলে কি না পেলে, কিংবা মা কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কচ্ছেন সে সব ভাবনা তোমার আমার হবে কেন? ভাবনা শুধু হবে একই, কি করে শ্রীশ্রী মায়ের অনুগ্রহ লাভ করবো এবং তাঁর করুণাসাগরে অবগাহন করে তৃপ্ত হব। ডাকার মত যদি ডাকতে পারি মন প্রাণ সঁপে দিয়ে এবং মনে পবিত্র চিন্তার প্রস্রবন বহিয়ে তবে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রী মা "ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালিনী মেয়ের মত ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দরজার বাইরে থাকবেন না," শুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়ে অবশ্যই মা আসীনা হবেন আনন্দের শিহরণ সৃষ্টি করে। সে কথা তো শ্রীশ্রীমা অনেক সময় ব্যক্ত করেছেন সুস্পষ্ট ও সুমধুর ভাষায়। ভক্তি শ্রদ্ধার এবং ভক্তের চিত্তশুদ্ধির অভাব হ'লে যে মা "উপবাসী" থাকেন এবং বিমর্ষিতা হয়ে তিনি যে দৃষ্টির এবং অনুভূতির বাইরে অবস্থান করেন। তাই বলছিলাম আমাদের আর ভাবনা কি। শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে. কেবল মাতৃনাম স্মরণ, আর সৎপথে থেকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য করে যাওয়া। এতেইতো মায়ের পরম তৃপ্তি। এর অধিক তো তিনি আর কিছুই চাননা আমাদের কাছে। পরম কারুণিক মা তো আমাদের চলার পথ এবং চেতনা প্রাপ্তির উপায় দেখিয়ে দিয়েছেনই। সত্যিকারের ভক্তের আর্তস্বর ও আকুলি বিকুলি মায়ের কাছে পৌছোবেই তা তিনি যত দূরেই থাকুন না কেন। দেখার মত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইলেই দেখতে পাবে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণপদ্ম তোমার হৃদয়ে আসীনা; দেখবে জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই মায়ের প্রতিবিম্ব বিরাজমান। তখন ঘুচে যাবে সব আফ্‌শোষ, খুঁজে পাবে সব প্রশ্নের সমাধান, ভুলে যাবে অহংভাব, সংসারের জটিলতা কুটিলতা, থাকবেনা আর দুঃখের অনুভূতি—অনাবিল আনন্দে মন ভরপূর হয়ে জাগতিক সকল দুঃখের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে দেবে।

জয় মা।

মাতৃ-কৃপার ঝরণাধারা

শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য্য

গানে আছে :-

"নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র আপনি বিলায়
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।"

গানটা আমরা সকলে করি, প্রাণ দিয়ে করি, একলা কত সময় করি, করতে করতে ভাবি মহাপ্রভুর কৃপার কথা। তাঁকে দেখিনি, তাঁর জীবনী পড়েছি, কত বড় বড় পণ্ডিতের লেখা তাঁর সম্বন্ধে পড়েছি—কিন্তু দেখিনি। ছবিতে চেহারা দেখলে বিভোর হয়ে যাই। নাম ছিল গৌরাঙ্গ কারণ সোনার মত রং ও পরম সুশ্রী চেহারা।

তাঁকে না দেখলেও একজনকে আমরা দেখেছি দেখছি। তাঁর কৃপা অযাচিতভাবে বর্ষণ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর শ্রীমুখেই এই গান শুনে আমরা পাগল হয়ে যাই। তিনি হলেন আমাদের মা—সকলের—"মা আনন্দময়ী"। তিনিও ত কলসে কলসে প্রেম-নাম বিলিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর অহেতুক কৃপা, তাঁর অযাচিত ভালবাসা, স্নেহ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে যাচ্ছেন মৌমাছির মত তাঁর কাছে যাবার জন্যে লোক ছুটছে—তাঁর মুখের থেকে মধু পাবার জন্য।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে শ্রীশ্রী মা যোধপুর পার্কে ভাগবৎ সপ্তাহ পারায়নে এসেছিলেন। কে জানত মা যোধপুর পার্কে এই রকম করে হাজার হাজার লোককে উদ্ধার করে দিয়ে যাবেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেকের ধারণা তিনি এখন বড়লোকের মা। কিন্তু সেই মা যে কার উপর কখন কৃপা করে ফেল্লেন—কাকে ডেকে বলে দিচ্ছেন "বসে পড়, আজ, আজই দীক্ষা নিয়ে নিয়ে নাও।" যাকে বলছেন, সেত তৈরী হয়ে আসেনি, সেত কল্পনা করেনি

যে মা তাকে ঐ দিনে উদ্ধার করবেন। সে বলছে "মা আমাকে বলছ?" ক—বার যে প্রশ্ন করল। মা বলছেন "হ্যাঁ তোমায় বলছি? দীক্ষা নেবে ত বসে পড়।" সে বল্লে "কিছু উপকরণ আনি নাই ত।" মা বল্লেন শীঘ্র বাসায় গিয়া লইয়া আস ও এইখানে বসে পড়বে।" উঃ তার কাছে সেই দিনটা কত স্মরণীয়; চোখের জলে তার কাপড় ভিজে গেল। বল্ল "কত আশ্রমে, কত মঠে, কত সাধুদের দোরে গত ১০ বৎসর ধরে ঘুরেছি, সবাই বলে সময় হয় নাই; আর আজ শুধু তাঁকে দর্শন করতে এসে তিনি আমায় কৃপা করলেন।" মাতৃ-মন্দিরে যে স্থানে পূজা, মন্ত্র উচ্চারণ হয়েছে, সে স্থানটি তাঁর কাছে কাশী গয়ার থেকেও বড় তীর্থক্ষেত্র। প্রত্যেক মাসের ২৩শে মাতৃমন্দিরে আমাদের কীর্ত্তন, পাঠ, মার কথা হয়। তারা দুই মহিলা, পাশাপাশি বাড়ীতে থাকেন, দুজনে নিয়ম করে এসে বিভোর হয়ে মায়ের নাম কীর্ত্তন শোনেন। বলেন বাড়ী থেকে দীক্ষা নিতে মানা করেছিল—বলেছিল "কিসের বড়লোকদের মধ্যে যাইতেছ?" তারা প্রতিবাদ করে এসে মায়ের চরণে স্থান নিলেন। "গুরুকৃপাহি কেবলম্।" মা স্বয়ং সামনে বসে; স্বামীজীদের দিয়ে দীক্ষার কাজ করাচ্ছিলেন। প্রত্যেক দিন ৬০-৭০-৮০ জন করে দীক্ষা হয়েছে। এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়তে পারে!

যোধপুর পার্কে ভাগবতের প্যাণ্ডেলে যেমন ভীড়, লোক ধরত না, তেমনি অফিস ঘরে দীক্ষা নেবার জন্য সেকি ভীড়, তাদের নাম লেখাবে। কত লোকের কত সমস্যা কত ঘটনা; কত যে লোক ধন্যা দিয়ে দাঁড়িয়ে—কিসের জন্য? দীক্ষা হবে।

আরও একটি মহিলা বর্দ্ধমান থেকে বিকাল ৪টার সময় এসে আমায় নাকি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তার পর ৫৷৷টার সময় আমায় দেখতে পেয়ে বল্লেন "আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।" আমি ত অবাক্! অপরিচিত! আমায় খুজছেন! বল্লেন আনন্দময়ী মা এসেছেন আর এখানে নাকি দীক্ষা হচ্ছে? এক মহিলা আজ দীক্ষা নিয়ে ফিরে গিয়ে বলেছে তাই আমি ছুটে এসেছি,

আমায় ব্যবস্থা করে দিন, আপনাকে ধরলে নাকি ব্যবস্থা হবে।" উঃ সে কি আকুলতা! বোধহয় পার্থিব জিনিষেও এত আকুলতা হয় না! ক্ষণেক তার মুখটা দেখে বুকের ভিতর মোচড় দিল—মা জননীর খেলা কত রূপে হচ্ছে। অফিসে নিয়ে গিয়ে বল্লাম "বড় কষ্ট করে বর্দ্ধমান থেকে এসেছে নামটা দীক্ষার লিষ্টে লিখে নিতে ও কবে হবে সেটা বলে দিয়ে সাহায্য করতে।" অফিসে বল্ল ভীষণ ভীড়, প্রচুর নাম হয়ে গোছ! বল্লাম নামটা লিখে রাখুন তার পর দেখুন না! ওকে বল্লাম আপনি কাল এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন, দেখুন না কি হয়, যদি মা জননী কৃপা করেন।

মা আমার কৃপাময়ী, কত কৃপা, কত করুণা—যখন সময় হয় বলে গুরু স্বয়ং আসেন—সাধু বাক্য শুনেছি! কি চমৎকার ঘটনা!

পরের দিন ৩টার সময় মা প্যাণ্ডেলে যাচ্ছেন আমিও যাব বলে দাঁড়িয়ে আছি পেছন থেকে দেখি কে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বল্লাম আরে ২ কর কি? কাঁদছ কেন? বল্ল আপনার জন্য আজই আমার দীক্ষা হয়ে গেছে! উঃ ভাগ্যিস্ আপনার কথা মত ভোর ৫টা থেকে এইখানে দাঁড়িয়ে—তার পর সব নাম ডাকছে। হঠাৎ মা বল্লেন আমায় তুমি দীক্ষা নেবে? আমি ত কেঁদে ফেলেছি, বল্লাম আপনি কৃপা করুন। তখনই বসে পড়তে বল্লেন। তার পর বেলা ১টার সময় দীক্ষা মন্ত্র পেলাম। জড়িয়ে ধরে বল্লাম যখন হবার তখন এই রকম করেই কৃপা পাওয়া যায়। তোমার এত আকুতি—বর্দ্ধমান থেকে ছুটে এসেছ মা জননী তাঁর সন্তানকে কোলে টেনে না নিয়ে কি পারেন। জয় মা, জয় মা!

ভোর থেকে সব আসত ৭টা/৮টার সময় সব দীক্ষার উপকরণ নিয়ে বসত, পূজা হত, সব সারতে কত দেরী, রোদ এসে পড়ত তাদের মুখে, সব ধৈর্য্য ধরে বসে আছে। মা এদিকে নানাভাবে ব্যস্ত। মায়ের খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই—শুধু ছিল নাম বিলিয়ে যাওয়া—জীবে উদ্ধার করে যাওয়া—এমন ভাবে দীক্ষা আমি দেখিনি কখন।

ভাগবৎ সপ্তাহ হয়ে যাওয়ার পর সেই রাত্রে মা আমায় ডেকে বল্লেন "মাগো যা তোমরা এবার করেছ, এমনটি ভাগবত পাঠ আর হয়নি, এমনটি আর হবে না। তোমরা ত অনুভব করতে পার নাই, স্বয়ং তাঁর প্রকাশ নানা ভাবে. নানা রূপে! কত নিষ্ঠার পাঠ।" শ্রীযুক্ত মাননীয় নারায়ণ গোস্বামীর পাঠ! মার যে তিনি বিশেষ ভক্ত, কত বড় বিদ্বান, কত বড় পণ্ডিত, মা যে প্রথমেই তাঁর নাম বলেছিলেন। মা বল্লেন "লক্ষ্য করেছ, একাসনে বসে বইয়ের পাতা না উল্টাইয়া ব্যাখ্যা করে যায়!" মাকে বল্লাম, 'মা স্বয়ং তুমি সকল ভার বহন করেছ তাই ত এমন শৃঙ্খলা ভাবে কাজ হয়ে গেল। কত বাধা, কত বিপত্তি, কত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। রাত্রে প্রায় চিন্তা এসে দাঁড়াত, সব মঙ্গল মত হয়ে যাবে ত? তোমার কোন কষ্ট হবে না ত! তোমার দৃষ্টি যেখানে, সেখানে কাজ না হয়ে পারে?" মা বল্লেন "মাগো এ যে দেশের কাজ, এ ত তোমার একলার কাজ নয়! তাই অত ঝড় উঠেছিল।"

বল্লাম "মা তুমি এবার কলকাতায় কত লোককে দীক্ষা দিলে—যা ভাবতে পারা যায় না।" মা বল্লেন "আহা ওদের কত ব্যথা, সেত তোমরা জান না। কত চিঠি যায়, কত সবাই শরীরটাকে চায়, সকলেত যেতে পারে না।"

মা জননীকে পত্রে লিখেছিলাম, মা তুমি ভাগবৎ সপ্তাহ করে চলে গেছ সারা যোধপুর, যাদবপুর, সেলিমপুর, ঢাকুরিয়া যেন কল্পনা করতে পারেনি যে এমন করে ওরা তোমায় পাবে। তারা যতটা পারে ২৩শে প্রতি মাসে কীর্ত্তনে মাতৃমন্দিরে আসার চেষ্টা করে।

মা উত্তরে লিখে পাঠিয়ে দিলেন ঃ

"ভগবান যে রূপে প্রকাশ, সেই ভগবানকেই সর্বক্ষণ স্মরণ। কীর্ত্তন আনন্দে সকলের আনন্দ। আনন্দের কথা। ভগবৎ আনন্দ সকলকেই দিয়েছে, সকলে নিয়েছে, ভগবানের কৃপা।"

জয় মা

মাতৃ-প্রসাদ

(প্রথম খণ্ড)

মৌনী মা

(১)

কি একটি বৃহৎ স্বপ্ন দেখিলাম ভাই,
জাগিয়া দেখি দ্বিতীয় কেহ নাই।
নাহি কোন অধীনতা, নাই ইষ্ট দেবতা
আপনা আপনি আছে আত্মভোলা।
লীলায় থাকিব বা মোক্ষে যাব
নাই এই ভাব
আল্‌গা হইতে হইতে আসিল বিশ্রাম।
সংসার ঘুরিয়া সাধন বিভাগে ঘুরিলাম
সবই স্বপ্ন দেখিলাম।
যেখানে নাই দেখা দেখি।
সেখানেই আছি কিন্তু আমি।

(২)

কি একটি ফুলবাগান দেখিলাম ভাই
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া গেল, মালি এখন নাই।
ফুলবাগানের মালি ছিল সরস।

ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া গেল
রইল এক রস।
বিরাগী বৈরাগী হইয়া ছিলাম অনেক কাল,
গুরু এনে দিলেন জ্ঞান অজ্ঞানের পর,
গুরু কৃপা ভারি চমৎকার।

(৩)

রূপগুণে বদ্ধ আমি নই
আলগা হ'য়ে রই।
খাসমহলে বসে আছি
উদাস আমার ঠাই।
যেখানে আছি সেখানে থাকি
যাওয়ার ফাঁক নাই,
আত্ম ভোলা তাই।

(৪)

এমন একটি আছে জায়গা
আপনে আপনে অশ্রু ঝরে, আনন্দের ধারা,
বাক্য মন ফিরে আসে, মুখে বলা যায় না।
প্রাণ কিছু নাহি চায়
কেবল উদাস পথে ধায়।
প্রাণ ছিলনা কার কাছে
কেবল ছিল উদাস পথে
মা ধরাইয়া দিলেন তাই
আমি বুঝিতে পারি নাই।
আকর্ষণ শূণ্য—

অস্ত্র থাকে যদি হাতে
কাটতে কাটতে কেটে যাবে
বাধা দিবে কোন জনে।
না জানিয়া নিজ তত্ত্ব, কান্দিয়াছি অবিরত।
সুখে দুঃখে কান্দিয়াছি এত
মায়ের কাছে পৌঁছিয়াছে, মা বলিয়াছেন কত।

(৫)

সাধকের জমি ছিল উর্ব্বরা।
ফুল ফুটেছে বাগান ভরা
তুলবে কে বলনা ?
মালি এখন নাই বাগানে
আপন ঘরে বিশ্রাম করে।
আপনি আপনি চল্‌ছে ভোলা আপনি রসময়
আপন ভোলা কয়।
আপন রসে বাদাম তুলে,
বসে আছে আপন ভোলা
তরী বাইতে হয় না।

(ক্রমশঃ)

বি জি জ্ঞা সা

(৫)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রঃ—ইষ্ট দেবতা ও তাঁর রহস্য কি ? বুঝাইয়া দিন।

উঃ—তোমাকে একটি গুহ্য বিষয় বুঝাইয়া বলিতেছি। বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সাধক যখন উপাসনার পূর্ব্বে তাহার ইষ্ট দেবতা নিরুপণের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হয় তখন সদ্‌গুরু এই গভীর রহস্য বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহার তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিত হইল।

সাধকের বর্ত্তমান সময়কার রুচি অনুসারে ইষ্ট দেবতা নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। বিভিন্ন উপায়ে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে দুই একটি মর্মকথা বর্ণনা করিব। সাধকের কে ইষ্ট তাহা সাধক জানে না। কারণ সে অজ্ঞানী। শ্রাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহারা সূক্ষ্মদর্শী নহেন। এ বিষয়ে দুইটি নিয়ম দৃষ্টিগোচর করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধকের নিজের কুলদেবতা কি তাহা জানা তাহার পক্ষে কঠিন। পরম্পরাগত শ্রুতি সাহায্য করিতে পারে বটে কিন্তু তাহা অব্যর্থ নয়।

কিন্তু কুলদেবতা অপেক্ষা তাহার ব্যক্তিগত দেবতা নিরুপণ করা অধিকতর আবশ্যক। সাধক নিজের পূর্বজন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহে কোন্ দেবতার উপাসনা করিয়াছে এবং কি মাত্রায় ঐ উপাসনা সম্পন্ন হইয়াছে তাহা না জানিতে

পারিলে সাধকের পক্ষে জন্মান্তরের সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান সাধনার সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হয়। এই জন্য সদ্‌গুরু শক্তিশালী হইলে নিজে চেষ্টা করিয়া পূর্বজন্মের উপাসনার সংস্কারটা জানিয়া লইতে পারেন এবং ঐ উপাসনার ধারা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে জীবনে অগ্রসর হইতে পারেন। লৌকিক সংস্কার এই মার্গে সুফল প্রসব করে না। সেই জন্য অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা পূর্বজন্মের সংস্কারটা দেখিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধমণ্ডলীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। আমি একটি সাধারণ ক্রম এইখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধক যোগমার্গে নিষ্ণাত হইলে পূর্বজন্মের সাধনার সংস্কারটা নিজেই দেখিয়া লইতে পারেন।

সদ্‌গুরুও সেইজন্য যোগমার্গ অবলম্বনে পূর্বজন্মের সংস্কারটা বুঝিতে চেষ্টা করেন। যোগী সাধক যোগে আরূঢ় হইয়া ভাবী শিষ্যের সত্তাতে অভিনিবিষ্ট হন। ইহার ফলে পরিপক্ক সমাধি অবস্থার প্রভাবে পূর্বজন্মের ধারাটি প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইতেই ইহা সম্ভবপর হয় এবং যিনি ইহা করিতে পারেন না তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়রূপে জানাও সম্ভব নহে সাধকের পূর্বজন্মে কি প্রকার সাধনা ছিল। এই অবস্থায় যিনি পারঙ্গত তিনি প্রাচীনকালে ঋষিপদবাচ্য হইতেন অর্থাৎ ঋষিভাব প্রাপ্ত হইলে সাক্ষাৎভাবে স্বভাবটা জানিতে পারা যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই জন্য ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। সদ্‌গুরু এই প্রকারে পূর্বজন্মের সাক্ষাৎকার দ্বারা ঐ সময়কার সংস্কার এবং উপাসনা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারেন। ভাবী শিষ্য তাহার পূর্বজন্মের ইতিহাস জানে না কিন্তু গুরু সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তখন সেই পূর্বাবস্থাটি চিত্তে অপরোক্ষভাবে উদিত হয়। দেবতা, মন্ত্র, বীজ—সবই এইভাবে জানা যায়। এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে সাধকের সাধনধারা সম্বন্ধে গুরুর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই সাধন ধারাটি অবগত হইলেও শিষ্যকে ইহা অর্পন করা এবং ঐ পথে

চালিত করা অতি দুরূহ কার্য। এই বিষয়ে দুইটি মার্গ প্রচলিত আছে। একটি যোগসিদ্ধ জ্ঞানী মহাপুরুষ সম্বন্ধে আর অপরটি জাগতিক গুরুজন সম্বন্ধে।

যোগী সদ্‌গুরু সমাধি অবলম্বন করিয়া সাধকের সত্তাকে অবলম্বন করার ফলে সাধকের ইষ্টদেবতার স্বরূপ জানিতে পারেন এবং উহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন। সমাধিতে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে ইহা ঘটে। সমাধি ভাঙ্গিবার ফলে গুরু পূর্বজন্মের সংস্কারাদি সাক্ষাৎকার করিতে পারেন বটে এবং সমাধি হইতে উত্থান লাভ করিয়া উহা তাহার জ্ঞানগোচর থাকে, ইহাও সত্য। কিন্তু সমাধি অবসানে উহা কি প্রকারে সাধককে অর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ জানাইতে হইবে তাহা একটি সমস্যা। কারণ গুরু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান তাহা সমাধির সমকালীন অবস্থা ব্যুত্থান অবস্থায় উহা নিজের জানা থাকিলেও সাধককে সাক্ষাৎভাবে সহজে বলিতে পারেন না। গুরু ভাবী শিষ্যের বা সাধকের পূর্বজন্মের সংস্কারটা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিলেও সাধককে জানাইতে পারা একটা কঠিন বিষয়। কারণ গুরু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহা গুরুর পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেও শিষ্য বা সাধক কিছুই ধরিতে পারে না কি প্রকারে সে অভ্যাস করিবে। এইজন্য কোন সিদ্ধআসন প্রভৃতি যদি গুরু অবলম্বন করিতে পারেন তবে উহাকে অবলম্বন করিয়া ভাবী শিষ্য সব রহস্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। ভাবী শিষ্য এই সিদ্ধপীঠ অথবা বস্তুবিশেষ অবলম্বন করিয়া ইষ্টদেবতার নাম ও মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। তখন উহাই অবলম্বন করিয়া সাধক শিষ্য নিজের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

সিদ্ধসম্পদ কিছু না থাকিলে গুরুর পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অর্পণের ভার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। সেইরূপস্থলে পশ্যন্তী ভূমিতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, (নাম, মন্ত্রাদি) তাহা শিষ্যের বৈখরী অবস্থায় সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ স্থলে গুরুদত্ত সাধনার

উপায়ের দ্বারা লৌকিক বা বৈখরী অবস্থায় ক্রিয়া করিতে করিতে অনাহত ধ্বনির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি মধ্যমা অবস্থার উদয় হয়। মধ্যমা অবস্থায় পশ্যন্তী অবস্থার আভাসটি নাদকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠে। তখন আর মধ্যমাভূমিতে স্থিতি থাকে না। বৈখরী অবস্থাতেই শিষ্য অভ্যাসের কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপ না করিতে পারিলে পশ্যন্তী অবস্থা হইতে বৈখরীর ভূমিতে জ্ঞানকে নামাইয়া আনা কঠিন। একবার বৈখরীতে নামিলে তাহার পর শিষ্যের পক্ষে অভ্যাস করা সহজ হয়।

—:::—

"তোমরা সকল কর্ম্ম যে ভাবে করিয়া যাইতেছ সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মেও কিছু সময় দিও। এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা, অন্ততঃ দশ মিনিট সময় তাঁহার কাজে দিও। দিনে ২৪ ঘণ্টা সময় হইতে অন্ততঃ দশ মিনিট সময় তাঁহার ভগবানের কাজে দেওয়া এমন কিছু নয়। তোমাদিগকে আমি স্থান অস্থান বিচার করিতে বলি না, কোন নির্দ্দিষ্ট আসনাদিও করিতে বলি না। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন, অন্ততঃ দশ মিনিট সময় তাঁহার নাম প্রত্যহ লইও। ইহাই আমার অনুরোধ।"

—শ্রীশ্রীমা

পরশন

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(১৪)

নিশান্তের পাখী যেন পুবের আকাশে আলোর ছটা দেখে ডেকে-ডেকে উঠল। গঙ্গার ওপারে বিজলী আলোর সারি, তার প্রতিটি আলো অর্থময় চাহনির মতো ঠেকছিল। এপারে একাকার নীরবতা, কান্তবাবুর প্রতিটি কথা আলোকপাত করতে লাগল।

কান্তবাবু বললেন, ধর্মের নামে এসব আজগুবি ভাবনা—এমন কথা বলতে পারছিনে। সেই আগরপাড়ার সবই মনে আছে, কিন্তু সে আগরপাড়া কই? আগের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে মেলাতে পারছিনে। গঙ্গার তীরে ভিড় ক'রে গাছের দল, গঙ্গায় সত্য নেয়ে উঠে তীরে-দাঁড়ানো ঘাট, গাধাবোটকে বিদায় দিয়ে তার দিকে চেয়ে-থাকা জেঠি, নির্বিকার সাহেবকুঠি—সব যে দেখছি জীবন্ত! এরা যেখানে আছে সেখানে যে কেবল চোখ মেলে আছে তা নয়, এক গঙ্গাধারা ধ'রেই যে যার কাজে আছে। দাঁড়ের আওয়াজ, লঞ্চের শব্দ, ষ্টীমারের ভোঁ—এদেরও যে স্পষ্টমূর্তি আছে তা কারও না দেখে উপায় নেই! কেমন করে জানিনে, এই সব যেন কোন সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে—আশ্চর্য!

বিস্ময়ে তিনি বলে চললেন, এসব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অথচ যা দেখছি ভাষায় তা বলা যাচ্ছে না!

এ'সব কি তার তবে সত্য-দর্শন?

তার কথাগুলি, সাবধানে নিতে চাইলাম। শ্রীশ্রীমা বলেন, "নিজের অবস্থাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে আমার এই অবস্থায় ভগবানেয় শুদ্ধ প্রেরণা আসা সম্ভব কি না? এটি খাঁটি ভগবৎ প্রেরণা, না, মনেরই একটা ধারণা মাত্র? এই সব বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার।"

কান্তবাবু আশ্চর্যবৎ বলতে লাগলেন, আমি আশ্চর্যবৎ শুনতে লাগলাম। তার মুখের চেহারা কেমন হয়েছে, আবছায়ায় তা দেখার উপায় নেই। কিন্তু ঘাটের উপর নতভঙ্গিতে আসীন মানুষটি যে সেই কান্তবাবুই, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

প্রতিবাদী যেন মুখিয়ে উঠলেন, এ তো রূপকথা বলছেন।

এ অপরূপ-কথা, কান্তবাবু বললেন, কিন্তু একবিন্দুও মিথ্যেকথা নয়। কল্পনাও নয়। যা দেখতাম, তা দেখছিনে।

বক্তা ক্ষোভ জানালেন, আপনাকে বরাবর বাস্তববুদ্ধির মানুষ বলে জানি। যা বলবেন তাতে তো বস্তু থাকা চাই।

কান্তবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, বস্তু থাকা চাই। কিন্তু বস্তুরও নিরেট যে-ভার থাকা চাই, সেই ভার আমি কোথাও দেখছিনে—কাজের-কথাগুলি কিভাবে যে সুরমাখা হয়ে যাচ্ছে ; এ তো আকার-রূপ-মূর্তি সব ছবি হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয়, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে ভাসছে—বলতে চাইলেও বলা হচ্ছে না, কথা বললেও কিছুটা যেন আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা শ্লেষ করলেন, আপনি আছেন তো ?

কান্তবাবু বললেন, হ্যাঁ, আছি। যেমন গঙ্গার ঐ বিপুল ধারার পরে ঐ 'বয়া'টা ভেসে আছে। ও যেমন স্রোতগুলিকে ধরে রাখতে পারছে না, আমার ভাবনা-চিন্তার স্রোতগুলিকেও ধরে রাখতে পারছিনে—তারা নিজেরাই উঠছে, ছুটছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার টেনে আমাকে ভাসিয়ে নিতেও পারছে না। তাদের সঙ্গেও যেমন আছি, তাদের ছেড়েও তেমন আছি।

"সকলেই যার যার নির্দিষ্ট কর্মপথে বিশ্বপিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করে উন্নতির পথে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। বিরাট জগৎটি খণ্ড-খণ্ড ভাবে না দেখে সমষ্টিরূপে দেখ্, তাহলে এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই স্থান পাবে না।"

ঘাটের পাশেই গাছটিতে যে ফুল ফুটেছিল তা নামে 'চাঁপা' হলেও, এখন আর তার গন্ধ চাপা ছিল না। একবিষয়ে আমারও আর সন্দেহ রইল না, সে কথা পরে বলছি।

কান্তবাবু বললেন, যা দেখছি তা অবিশ্বাসও হচ্ছে না।

সংসারে অবিশ্বাস তবু তো আছে। সমুখে আসীন অবিশ্বাসের মূর্তিটি বললেন, ওঃ, এ'সব আপনি মনে মনে অনুভব করছেন—মনে-মনে ? তবে তো প্রমাণাভাবাৎ এ সবই অসিদ্ধ।

বক্তার ন্যায়শাস্ত্র বর্ণে-বর্ণে পড়া থাকা অসম্ভব নয়। তার জজিয়তির পরও কথা চলে না। কান্তবাবু মগ্নভাবে বললেন, এই দেখা অসিদ্ধ হয়ও যদি, তবু প্রাণে যে আনন্দ বইছে, আবেগের যে পুলক-শিহরণ গলিয়ে আনছে, তা ভুলে যাই কি করে! চোখের পলকে যা দেখছি তাতে চোখের পলক পড়তে চায় না।

বিদ্যের আদালতে অসুবিধে দেখে কান্তবাবু যেখানে আপিল করলেন তা হৃদয়ের দরবার, যার পর আর কথা চলে না। কথারাও আর বসে থাকলেন না। ভগবান 'কী বস্তু' তা তাদের জানা আছে জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাড়াতাড়িই গেলেন।

"বিশ্বাস এলে অবিশ্বাস থাকে না।"

আমি বললাম, তর্কেরা যে আপনার আশা ছেড়ে গেলেন, তাই আপনার আশা।

কান্তবাবু তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, ওরা চলে গেলেন। ও-ঘাট থেকেও সব ঘরে ফিরছেন। রাত হচ্ছে। অসমাপ্ত কাহিনী নিয়ে এক-একটা জীবন যেন ঘুমোতে চলে যাচ্ছে। তবু নদী বইছে, নৌকো চলছে, দাঁড়ের শব্দ উঠছে—এ প্রবাহ কোনদিন থামবেও না। আসলে প্রবাহটা শুধু নদীর নয়, তাও বুঝছি।

"প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখ্। প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ বুঝিয়ে দেয় যে, জন্ম মৃত্যু ব'লে কিছু নেই. এবং এক পরম-পুরুষই নানাভাবে নানারূপে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র।"

কান্তবাবুর কণ্ঠস্বরে গায়ে আমার কাঁটা দিচ্ছিল। ভাবছিলাম, এসব কি উনি দেখতে পাচ্ছেন ? ওঁকে যা মনে হচ্ছে, উনি কি তাই ? তা যদি হয়,

তবে ওর সঙ্গে চলে ওরই সঙ্গে মাতৃসঙ্গ লাভ করতে হবে।

গোধূলিতে শিশু-জোছনার হাসি ফুটেছিল, তখন চোখ ফোটেনি। এখন ভরা গঙ্গার কানায়-কানায় আলোর ঝিকিমিকি—পূর্ণপাত্র পূর্ণ করে রঙ। সেই গহীন গাঙের বুকের আলোয় জোছনা এক শিল্পীর মতো চরাচরে গভীরতার ছবি এঁকেছে। সৃষ্টির যত পৃথক পৃথক রূপরেখা আকার-আকৃতি সব মুছে গিয়ে জোছনায় সব অনন্ত হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, তার রহস্য অনন্ত। সেই অনন্ত কথা বলে হাসছিল না, নীরব হাসি দিয়ে কথা বলছিল। সুদূর এক মৌন লোকে পৌঁছবার আনন্দে।

"পথের কথা পথেই চলে। পৌঁছলে কথা নেই।"

আশ্রমের দু'টি মালী ঘাটের পাশ দিয়ে ডেরায় ফিরছিল। একজন ভাষ্যকার হয়ে অপরকে বলতে বলতে গেল, বাবুরা এত রাতেও মায়ের আশ্রমে সিন্-সিনারী দেখতে বসে আছে।

তাদের মনুষ্যকণ্ঠ নিঃশব্দতায় মিলিয়ে গেল। ওধারের নাটমন্দিরের কীর্তনাদি আর শোনা যায় না। যখন গঙ্গাস্তব করতে-করতে ও-ঘাটের শেষ-মানুষটিও চলে গেলেন, তখন মুহূর্তে সব নীরব হয়ে গেল। সে নীররতা শূন্যতা নয়। আশ্রম, নদী, এপার-ওপার, মাথার পরে আদিগন্ত আকাশ—এই প্রকাণ্ডতা জোড়া একটা আনন্দময় প্রাণস্পন্দন গঙ্গার নিঃশব্দ স্রোতের মতো প্রাণে-মনে বয়ে চলল। সঙ্গোপনে একটা মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামার মতো। তাকে বোঝানো যায় না, কিন্তু বোঝা যায়ঃ

"আমাদের এই প্রাণবায়ু তাহাই তো বিশ্ব জুড়িয়া আছে। এই শ্বাস-বায়ুর সঙ্গেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ আছে। সাধু, মহাত্মা যাহাই বলো, সকলের সহিতই সকলে প্রাণবায়ু রূপে যুক্ত।"

ঘাটলায় নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম দুইজন নয়। আশ্রমভবন, জপকুঠি, নদী -- সব মিলিয়ে একজনই যেন জেগে রইলাম। আপন নীরবতার ভাষা-বিহীন আপনি সাক্ষী হয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমায়ের ৮১তম জন্মোৎসব

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

এবারের জন্মোৎসব শ্রীশ্রীমায়ের ৮১তম আবির্ভাব উৎসব। স্থান কন্‌খল যেখানে ভগবান দক্ষ প্রজাপতির মন্দির—চত্বর। চার পাঁচ বছর আগে এখানে এসেছিলাম ২৫তম সংযম সপ্তাহ উপলক্ষ্যে। তখন পরমারাধ্যা দিদিমার মন্দির নির্ম্মানের কাজ চলছিল। এই ক'বছরের মধ্যে এ জায়গার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। তিনতলা উচ্চ বিশাল দীর্ঘ গেষ্ট হাউস মণ্ডপ হল ইত্যাদি তৈরী হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি। কাজ চলছে। শ্রীশ্রীমায়ের এত বড় জায়গা নিয়ে কেন্দ্র এখনও আর হয়নি।

এবারকার জন্মোৎসবে সবদিকেই যেন একটা স্বাভাবিক আনন্দের আবেষ্টনী। শ্রীশ্রীমা বেশ শারীরিক সুস্থতা দেখাচ্ছেন। অনেকদিন পরে মাকে এরকম সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও তার প্রভাব। অনেকদিন নানারকম দীর্ঘ রোগভোগের পর দিদিকে আবার সুস্থ দেখাচ্ছে। প্রতিবারের মত দিদি এসে আবার মায়ের পেছনে বসছেন। সবটাই আনন্দের।

২ তারিখে সকালে এসে পৌছে স্নান ইত্যাদি সেরে মাকে প্রণাম করতে গেলাম। আনন্দময়ী আনন্দের হাট বসিয়ে তাঁর ঘরে বসে আছেন। সামনে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী। তাঁদের নিবিষ্টতার বিঘ্ন না ঘটিয়ে মাকে প্রণাম

করে চলে আসতে গেলাম। স্মিতহাস্যে মা বললেন "এসে গেছ, আগিয়া।" মায়ের মুখের কল্যাণবর্ষী হাসি আর দেববন্দিত মধুর স্বরের স্নেহ আহ্বানের সুরের রেশ "কানের ভিতর দিয়া মরমে নিয়া" ভাসতে ভাসতে চলে এলাম। সকালে খানিক বাদে মা এসে হল ঘরে বসলেন। গীতা চণ্ডী উপনিষদ পাঠ হল। তারপর মা একজন ভক্তিমতীকে ডেকে গান করতে বললেন। তিনি যে কি সুন্দর তিন চারখানা নাম গান করলেন তা আর বলার নয়। যেমন বানী তেমন গলা তেমন সুর, মনে হচ্ছিল শ্রীশ্রীমা যেন নিজে ওই কণ্ঠে ভর করেছেন। সন্ধ্যাবেলা তিনতলা গেষ্ট হাউসের একতলার একখানা ঘরে এসে মা বসলেন। সেখানে আধ ঘণ্টা ধরে নির্ব্বানানন্দজী মায়ের আরতি করলেন।

দশ তারিখে সকালে নিয়মিত রামলীলা দল মহাপ্রভুলীলা সুরু করলেন। রামলীলা শেষে মহামণ্ডলেশ্বর প্রকাশানন্দজী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন বিম্ব আর প্রতিবিম্ব নিয়ে। বিম্ব একমাত্র তিনি, প্রতিবিম্ব সব জাগতিক জীব। জগৎ মানে গতিশীল। প্রতিবিম্ব নিয়ে বিম্বের চলমান খেলার নাম জগৎ। দোষসহিত অন্তঃকরণের নাম চিত্ত আর দোষরহিত অন্তঃকরণের নাম সত্ব। এর পরে ব্রহ্মানন্দজী এই বিম্ব আর প্রতিবিম্বের মাধ্যম দর্পণ এবং দর্পণের মাধ্যমে খেলার ব্যখ্যা প্রসঙ্গে গল্প বললেন। নগরপালকের সভায় ঠিক হল যে রাস্তায় যে সব বেমালিক কুকুর ঘুরে বেড়ায় তাদের দৈনিক ত্রিশটি করে মেরে ফেললে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নগরপাল মনে ভাবলেন কুকুরদের হত্যা করার চেয়ে এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে ওরা নিজেরাই হত হয়ে যায়। তাই তিনি একটি দর্পণঘর তৈরী করালেন যার ছয়দিকেই দর্পণ এবং সেই ঘরে কুকুরদের ধরে এনে ভাল ভাল খাবার জল ইত্যাদি দিলেন। কুকুরগুলো যেইমাত্র সেই ঘরে ঢুকল সাথে সাথে ভাল ভাল খাদ্য পানীয় ছেড়ে দর্পণে নিজ নিজ প্রতিবিম্বকে প্রতিদ্বন্দীকে মনে করে আঁচড়ে কামড়ে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেখানকার খাবার সেখানেই ফেলে

রেখে নিজে নিজেই হত হতে লাগল। অজ্ঞানে মন আবৃত থাকায় দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেও নিজেকে চিনতে পারল না। সেই নগরেরই বাইরে এক তপস্বী বাস করতেন। সেই তপস্বী একটি কুকুর পালতেন। প্রতিদিন সকালে তপস্বী নিজে স্নান করে কুকুরটীকেও স্নান করাতেন, দর্পণে নিজে তিলক একে কুকুরটীর কপালেও তিলক এঁকে দর্পণে কুকুরটীকে নিজের মুখ দেখাতেন এর ফলে কুকুরটা দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একদিন রাস্তায় একলা ঘোরার সময় সেই কুকুরটীও যথারীতি ধরা পড়ল কিন্তু ঐ ঘরে গিয়ে সে মনের আনন্দে ভাল ভাল খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে দিনে দিনে পুষ্ট হতে লাগল। যখন মোটামুটি নগরপালিকার কাজ প্রায় শেষ তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে তপস্বীর ওই কুকুরটী দিব্যি সুন্দর নধর কান্তিতে বিরাজিত। অনুসন্ধানে জানতে পারল যে ওই কুকুরটী তপস্বীর কৃপায় প্রতিদিনের অভ্যাসবশতঃ বিম্ব আর প্রতিবিম্বের দর্পণের মাধ্যমে পরিচয়ে অভ্যস্ত থাকাতে ওই মহাপ্রলয় থেকে মুক্ত রয়ে গেল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বললেন যে এই যে শ্রীমা ইনিও তাঁর জন্মোৎসব পালনের মাধ্যমে আমাদের সব নানারকম সৎজ্ঞান প্রদান করে মহাপ্রলয়রূপ ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেন, জন্মোৎসব পালনের মাধ্যমে বিম্ব, প্রতিবিম্ব, দর্পণ এই সবের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

এদিন সন্ধ্যাবেলায় মা দেখালেন তাঁর এক লীলা। রোজ সন্ধ্যায় গেষ্ট হাউসের নীচের ঘরে তাঁর আরতি হয় সন্ধ্যা ৭টার সময়। আজও নির্ব্বানদা এবং অন্যান্য সকলে সেখানে তৈরী। সাতটার সময় মা যথারীতি মহাত্মাকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। আমরা সকলে অপেক্ষা করছি মা এবার ফিরে এসে ওই ঘরে যাবেন। সকলকে বিস্মিত হতচকিত করে মা তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চললেন আশ্রম বাড়ীর দিকে। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লেন যেখানে ছোট্ট ঘরে পরমানন্দ স্বামী থাকেন সেখানে। একেবারে একটী বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসে

পড়লেন। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সকলে আরতির সব দ্রব্য সামগ্রী সেই ঘরে নিয়ে এল। ওই ছোট্ট ঘরের মধ্যে মায়ের আরতি হল। মা ওই ঘরে বসে রইলেন রাত সাড়ে ন'টারও পরে পর্য্যন্ত ওই এক আসনে।

পরদিন সকালে মহাপ্রভুলীলা দিয়ে দিন শুরু। তারপর প্রকাশানন্দ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সকালে প্রবচন দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব প্রসঙ্গে প্রকাশানন্দজী মহারাজ বললেন ধর্মরক্ষার্থ ঈশ্বর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা যে চব্বিশ অবতারের কথা জানি এ ছাড়াও বহু সময়ে বহুরূপে শ্রীভগবান ধরাতলে অবতরণ করেন কখনও রামকৃষ্ণ, কখনও শঙ্করাচার্য্য কখনও মা আনন্দ ময়ী, কখনও আরও কিছু। এঁরা আসেন ধর্মরক্ষার্থ, ভক্তি, পূজা, পাঠ-এর ধারা রক্ষার জন্য। পূজা পাঠ ইত্যাদিতে অধিকারগুন জন্মে। ঈশ্বরের নিকটে যাওয়ার অধিকার জন্মে। অধিকারীর দল সিদ্ধি হয় আর অনধিকারীর কর্ম বিফল হয়। কাপড়ে সাবান লাগিয়ে জলে না ধুলে সাবান নতুন ময়লারূপে কাপড়ে জমে যায়। তেমনই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারগুণ না জন্মালে আসক্তি জন্মে। উপাসনা, পূজা, ভক্তি সব জলের কাজ করে। অন্তঃকরণ হন বস্ত্র, সাবান হন কর্ম্ম, আর উপাসনা এবং ভক্তি হন জল। কর্ম্মের ফল ভোগে নষ্ট হয়, একমাত্র ফল যা নষ্ট হয়না তা হল ভগবান প্রীতির কর্ম্ম। অন্তঃকরণ নিষ্পাপ হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা হল পদার্থের প্রতি অনাসক্তির উদয়, মুমুক্ষার উদয়। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বললেন অবিদ্যার অধীন যে সে জীব আর অবিদ্যাকে যে অধীন রাখে সে হল শিব-ঈশ্বর। জীব আর ঈশ্বরে প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু উপাধিতে উপাধির রূপ হল অবিদ্যা। অবিদ্যার আবরণ দূর করার পথ দেখায় সৎগুরু। বিকেলে প্রায় পৌনে পাঁচটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত মৌন হল মাতৃসমীপে। পাঁচ থেকে সাত প্রবচন দিলেন বিদ্যানন্দজী এবং মহামণ্ডলেশ্বর সদানন্দজী। সাত থেকে সাড়ে সাত পর্য্যন্ত হওয়ার কথা মায়ের আরতি। হঠাৎ দেখলাম মা মোটরে করে চলে গেলেন ব্রহ্মকুণ্ডে। সোয়া আট থেকে ২'টা পর্য্যন্ত বললেন বিষ্ণু আশ্রমজী। খুব সারগর্ভ সহজ ভাষণ

দিলেন বিষ্ণু আশ্রমজী। কিন্তু অধিকারী গুণ জন্মায়নি তাই ধরে রাখতে পারলাম না। তিনি বললেন ফুলের সঙ্গে রংএর নিত্য সম্বন্ধ কিন্তু আত্মার সঙ্গে দেহের নিত্য কোন সম্বন্ধ নেই। আত্মা নির্গুন নিরাকার দেহ সগুন সাকার। নিরাকারের এর সঙ্গে সাবয়ব এর কোনও সম্বন্ধ নেই। আকাশ নিরাবঘর মাটি সাবঘর। আকাশের মধ্যে লাঠি মারলে কিছুই হয়না। শরীর ক্ষেত্র আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। তিন অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন, আর সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থা সত্বপ্রধান, বুদ্ধির অধিকারে, স্বপ্নাবস্থা রজঃপ্রধান, মনের অধিকারি, সুষুপ্তি তমঃপ্রধান, অজ্ঞানের অধিকারে। আবার জাগ্রত স্বপ্ন অবস্থা, স্বপ্নজাগ্রত অবস্থাও আছে। প্রথম অবস্থায় দেবমন্দিরে বসেও কুচিন্তা করে আর দ্বিতীয় অবস্থায় ঘুমের মধ্যেও মন দেবমন্দিরে যায়, মাকে প্রণাম করে।

পৌনে ন'টা নাগাদ মা এলেন ব্রহ্মকুণ্ড থেকে, ন'টা থেকে সুরু হল মাতৃ-সৎসঙ্গ। মা শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কীর্ত্তন গাইতে বললেন। দু'খানা কীর্ত্তন গানের পর মাকে প্রশ্ন করা হল অন্তঃকরণ কি করে বাসনাশূন্য করা যায়। মা বললেন সাধুমহাত্মারা যে সব ভাষণ দিচ্ছেন তার মধ্যেই সব সব নির্দ্দেশ আছে। সেই নির্দ্দেশগুলি ধারণ করার পালন করার চেষ্টা কর। এর পর মায়ের হঠাৎ খেয়াল হয়ে গেল। আধঘণ্টার ওপর অনর্গল বলে গেলেন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি. বুদ্ধি, মন ও প্রান সম্বন্ধে বললেন। বেশীর ভাগই লক্ষ্য সাধু মহাত্মাগণ কাজেই আমার বিশেষ বোধগম্য হলনা শুধু শ্রবণইন্দ্রিয় কর্ণ পবিত্র এবং তৃপ্ত হল। মায়ের এই অনর্গল বলার মধ্যে শুধু একটা মাত্র কথা বিদ্যুৎ ঝলকের মত এসে মাথায় আটকে গেল। বিভিন্ন কথার মাঝে মা বললেন, ভগবানের সব যন্ত্র এই জীব, এরপর সমবেত জনতার দিকে হাত দেখিয়ে এবং হাত ঘুরিয়ে বললেন "আমার হাতের সব যন্ত্র আছে না?" ব্যস্ ওই পর্য্যন্তই। যার যা বোঝার বুঝে নিন। এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথার তুবড়ীর মাঝে উত্তরকাশীর জন্মোৎসবের এক রাত্রে সৎসঙ্গে মা নিজের পরিচয় দিয়ে ওই রকম একটা ইঙ্গিতের ঝলক দিয়েছিলেন মনে পড়ল।

এর পর মা নিজের খেয়ালে সন্ধ্যেবেলার কাহিনী বলতে লাগলেন। এই ছোট্ট মেয়েটা কোনওদিন গঙ্গামাএর কাছে যায়না পূজো করেনা কিচ্ছু করেনা তাই গঙ্গামা আজ জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে গেছেন ব্রহ্মকুণ্ডে। ওখানে সরকারী তরফ থেকে বিরাট আয়োজন হয়েছে গঙ্গামায়ের পূজোর। গভর্ণর, মিনিষ্টার, পুলিশ, কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট সব বড় বড় অফিসার এসেছে, বিরাট প্রবন্ধ হয়েছে। সেখানে যাবার পর সকলে বলল গঙ্গামায়ের পূজো দেবার জন্য। আরতি হল পূজো হল। এর মধ্যে হয়েছে কি আমার খেয়ালে এসেছে একখানা বস্ত্র দেবার জন্য। রামভাই (রাম পাঞ্জোয়ানী) কে বললাম একখানা বস্ত্রের জন্য। রামভাই ত দৌড়ে গাড়ীর কাছে এল কিন্তু দেখল যে এই বিরাট জনসমুদ্র ভেদ করে কাপড়ের দোকানে পৌছাতে বহু সময় লেগে যাবে। এক মিনিট ইতস্ততঃ করে মায়ের আজ্ঞা পালন করার জন্য গাড়ী নিয়ে রওনা হয়ে গেল। এদিকে আমার মনের অবস্থা যে যত দেরী হয় পূজো শেষ হতে ততই ভাল। ভাবছি আর একটু দেরী হোক, আরও একটু দেরী হোক। কিন্তু আবার ভাব্‌ছি দেরী চাইলেই ত দেরী হয়না দেরীর ও একটা সীমা আছে। এরই মধ্যে দেখি রামভাই বস্ত্র নিয়ে এসে হাজির। বস্ত্র দেওয়া হয়ে গেল। পূজোর পরে ওরা আমাকে নিয়ে বসাল একটা জায়গায়। সেখানে লোকের পর লোক মালার পর মালা দিতে লাগল। মালার পাহাড় হয়ে গেল। এদিক ওদিক মালাগুলো ছড়িয়ে দিতে লাগলাম। এদিকে হয়েছে কি সন্ধেবেলা যখন এখান থেকে যাই তখন পরমানন্দ নির্ব্বান নির্ম্মল আর অমর যেতে পারেনি। ওদের যেতে বলেছিলাম কিন্তু ওদের কাজ থাকায় যেতে পারেনি। ভাস্কর গিয়েছিল। তাই চারটে মালা রেখে দিয়েছিলাম। মা এই সময় উদাসজীকে ইসারা করতে উদাসজী সেই মালা চারটে নিয়ে এলেন। সামনে বসে নির্ম্মলানন্দ আর তন্ময়ানন্দকে মা ২টো মালা দিলেন। বাকী ২টো উদাসজীর হাতে রয়ে গেল নির্ব্বানানন্দ আর পরমানন্দ স্বামীজীকে দেবার জন্য।

পরদিন মহাপ্রভুলীলা চলার সময় কপালে তিলক আকার অর্থ জানতে

পারলাম। তিলক আঁকার অর্থ শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রতীক ধারণ। প্রকাশানন্দ স্বামী জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে প্রবচন দিলেন। তিনি বললেন প্রাতঃকাল থেকে সুষুপ্তি অর্থাৎ জন্ম থেকে মরনাবধি সমস্ত কর্ম্ম যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তির অর্ঘ্যরূপে প্রদান করা যায় তবে সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপে বন্ধনমুক্তির কারণ হবে। দুই হাত দুই পা থাকলেই জীব মানুষ হয় না। মানুষ হল সে যে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় চালিত হয়। শাণ্ডিল্য আর নারদ মহামুনিদ্বয় ভক্তি-সূত্র লিখেছেন প্রেমের ধারা যদি পুত্র কলত্র আর শরীরের পোষণের দিকে প্রবাহিত হয় তবে তার নাম মোহ আর যদি পরমাত্মার দিকে প্রবাহিত করা যায় তবে তার নাম ভক্তি। ভক্তির দুই লাভ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

ঠিক এই সময় মা এসে মণ্ডপে ঢুকলেন। প্রকাশানন্দজীর সামনে এসে তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরলেন। স্বামীজীর ভাষণ প্রসঙ্গ দিক পরিবর্ত্তন করে মায়ের দিকে ধাবিত হল। মায়ের চারদিকে সুগন্ধি, সুপুষ্টি। যে কাছে আসবে সেই তার স্বাদ পাবে। কাছে আসার রকমভেদ আছে। স্থুল শরীর ষোল ঘণ্টা বসলেও তত ফল হয়না যত হয় যদি মন মায়ের শ্রীচরণে নিবেশ করা যায়। রামলীলার তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বললেন গার্হস্থ্যজীবনে এত প্রপঞ্চের মধ্যে থেকেও যদি মনকে সমাহিত করতে পার তবে তাঁর পদে বিলীন হয়ে যাবেই। মায়ের সামনে গুরুকৃপা তোমাদের চারপাশে ঘিরে রয়েছে। অভ্যাসকৃপা বা আত্মকৃপা দরকার তপসা—মনকে নিরোধ করার সাধনা প্রয়োজন। গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা আর আত্মকৃপা তিনটে মানুষের জীবনে প্রয়োজন। কালের প্রবাহ যাকে নষ্ট করতে পারেনা সে-ই গুরু। অনুগ্রহ আর নিগ্রহকে যে সমান দেখে সে প্রকৃত সাধক। আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য বলেছেন আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য মোক্ষ সাধনের সহজতম পথ ভক্তিমার্গ। দূর থেকে মাকে গুরুরূপে দেখ। মাকে ছোঁবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করোনা। তাতে দিব্যশক্তির সঞ্চার হবেনা। নিতান্ত আকস্মিকভাবে তা

হলেও সেটা নিয়ম নয়। দূর থেকে ভক্তিপূর্ণভাবে মাকে গুরুরূপে দর্শন করো। সৌম্যদৃষ্টিতে মায়ের ভ্রূমধ্যে বিন্দুর প্রতি দর্শনের চেষ্টা করো। ঠিক ঠিক দৃষ্টিপাত হলে ভেতর থেকে শক্তির স্ফুরণ হবে। আজ স্বামীজি যে রকম তন্ময় হয়ে মা-ময় হয়ে মায়ের পরিচয় আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন এ রকম এ পর্য্যন্ত কোনওদিন শুনেছি বলে মনে পড়েনা। মা এই সময় নির্ব্বিকার উদাসীন হয়ে কোন লোকে চলে যান কে বলতে পারে।

ব্রহ্মানন্দজী বললেন ভক্তির সূত্রপাত দ্বৈতরূপে সমাপ্তি অদ্বৈতে। প্রথমে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি না করলে প্রেমের সৃষ্টি হওয়াতে বিঘ্ন হয়। এইখানে যেমন অনেক লোক আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কারুর পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় ততক্ষণ তার সম্বন্ধে interest জন্মে না। যে কোনও রূপে এই সম্বন্ধ হওয়া। যেমন তুজনেই বোম্বে থেকে এসেছে। পরমাত্মাত আকাশে আমিত পৃথিবীতে কি করে সম্বন্ধ হয়? ত্ব মেব মাত চ পিতা ত্ব মেব ইত্যাদি। এটাই সম্বন্ধ জোড়ার পথ। মাতা ত সাক্ষাৎরূপে এখানে বসেই আছেন এঁর সাথে সাধারণ বুদ্ধি না নিয়ে পরমাত্ম বুদ্ধিতে সম্বন্ধ জোড়ার চেষ্টা। আত্মারূপে যে পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন যেই মূহূর্ত্তে সেই আত্মার প্রতি ব্রহ্মভাব আরোপ করা যায় তখনই শ্রেষ্ঠ ভক্তিমার্গ অনুসরণ। জীব গাঢ়নিদ্রার সময় প্রতিদিন পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। নিদ্রার আবরণ থাকতে পরমাত্মার সঙ্গে পরিচয় হয়না। এই আবরন একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের নিজ কৃপাতেই দূরীভূত হতে পারে। পরমাত্মাকে যদি হৃদয়ে অবাঞ্ছিত অন্তর্য্যামীরূপে চিন্তা করা যায় তাহলে সে একাদশীরূপে পরিচিত হয়ে সম্বন্ধ স্থাপন করতে সুবিধে হয়। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ লাগাম যেই মূহূর্ত্তে পরমাত্মার পদে সমর্পন করা যায় তখন উদয় হয় জ্ঞান বা মোক্ষ।

বিদ্যানন্দজী বললেন পরমাত্মার সাক্ষাৎই বন্ধনমুক্তির একমাত্র পথ। সাক্ষাতের চেষ্টায় ১/৪ বছর শ বছর কেটে যেতে পারে। কিন্তু যতদিন না সাক্ষাৎ হয় ততদিন মুক্তি হবেনা। সর্ব্বস্ব ত্যাগের আগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকা

সম্ভব নয়। জ্ঞানের উদয় বিনা সর্ব্বস্ব ত্যাগ সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবার পরেও জীবদেহ জগতে থাকতে পারে, যদিও সে মুক্ত। কারণ তাঁরা অধিকারী পুরুষ। যেমন বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীমা। এঁরা ৫০/১০০ বছর জীবন ধারণ করেন লোককল্যানের জন্য। পরমাত্মা পরমপুরুষ বিধাতা এই সব অধিকারী পুরুষরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন লোক কল্যানরূপ কর্ম্মের জন্য। যে সব বিদ্যা সংসারে আছে তাদের নাম অপরাবিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবগত হওয়া যায় তার নাম পরাবিদ্যা। অবিদ্যার আবরণ নষ্ট হয় যখন পরমাত্মাকর বৃত্তির উদয় হয় তখন "আমি আনন্দময় ব্রহ্ম" এই অনুভূতির উদয় হয়, এটাই সব চেয়ে উচ্চ অবস্থা। সময়ের পরিবর্ত্তনে মিত্র শত্রুতে পরিণত হয়। যতদিন পদ্মফুলের গোড়ায় জল আছে ততদিন সূর্য্য তার পোষক। যখন জল থাকবেনা তখন এই সূর্য্যই কমলের মৃত্যুর কারণ হবে। জীবের মনোবৃত্তি যখন পরমাত্মার দিকে প্রবাহিত হয় তখন যদি সংসারবৃত্তিরূপ জল না থাকে তবে সে ব্রহ্মবিদ্যার দিকে যায়—তার অবিদ্যার নাশ হয়।

গুরুমণ্ডল আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী রামস্বরূপ বললেন: ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসুর পক্ষে সর্ব্বপ্রথম নিজের বানী নিজের বাক্যের উপর সংযম প্রয়োজন। সাধককে সর্ব্বদা সাবধান হয়ে ব্রহ্মচিন্তা করতে হবে। কখনও মনে করবেনা আমি সব জানি। হয়ত জানতে পারো কিন্তু পরিপাক করতে শিখতে হবে। এই শিক্ষার জন্য মহাপুরুষদের চরণে গিয়ে বসা অভ্যাস করতে হবে। এইটেই সর্ব্বপ্রথম পর্য্যায়। এক মূহূর্ত্তের চঞ্চলতা জীবকে কত নীচে নামিয়ে আনতে পারে কঠোপনিষদে নচিকেতা তার দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম ত আছেনই ব্রহ্মলোকে তিনি নিরাকার। কিন্তু সাকার ব্রহ্ম আমাদের সামনে বসে আছেন। ওঁর কাছে বসলেই প্রাপ্তি হয়না, সর্ব্বক্ষণ থাকলেও কিছু হয়না। ভাবজগতে মনের শক্তি-দ্বারা ওঁকে কাছে টানলে অন্তরে পাওয়া যায় সর্ব্বক্ষণ তখন, বাইরের পাওয়া গৌণ হয়ে যায়।

আজ মায়ের সন্ধ্যা আরতি আবার গেষ্ট হাউসের একতলায় ছোট্ট ঘরে হল। মা আজ গানের তালে তালে বসে বসে দুলে দুলে তালি বাজালেন নিজের দুখানা কমল কর বুকের কাছে একত্র করে।

সন্ধ্যায় দণ্ডীস্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী বললেন জাগ্রত এবং স্বপ্ন অবস্থায় আত্মা এক জায়গায় থাকলেও আত্মার প্রতিবিম্ব দূরে দূরে চলে যায়। সুষুপ্তিতে এরা দুজন এক জায়গায়ই থাকে। বেদ অধ্যয়ন করলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়না, অনেক গ্রন্থ ধারণ করা বুদ্ধিতে বা মেধায়ও হয়না। অধিকারী যখন আত্মাকে বরণ করে অথবা স্বয়ং পরমাত্মা যখন কারুর ওপর কৃপা করে তখন আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। দুশ্চরিত্রতা এবং পাপ (চুরি, হিংসা ও পরস্ত্রী সম্বন্ধ) যতক্ষন নিবৃত্ত না হবে ততক্ষণ হবে না।

মাতৃসৎসঙ্গে একটী মাত্র জোরাল প্রশ্ন ছিল। নিত্যই অনুভব হচ্ছে যে আত্মা আছে অথচ তার স্বরূপ জানা নেই এদিকে স্বর্গলোকের বিবরণ জানা আছে কিন্তু বিন্দুমাত্র অনুভব নেই। এর কারণ কি? মা অনেক কিছু বললেন যেটুকু ধরতে পারলাম তা হল, কেন জানা যায়না সেই প্রশ্নের ওপর খোঁজা সুরু কর তারপর দেখ কি হয়। মনমানি রাজ্যে যে নিবাস করে সে হল আত্মা আর যে ভোগ করে সে হল মন, আর এই আত্মা আর মনকে যে দূরে রাখে তার নাম দুর্ভোগ। এর ওপর প্রশ্ন হল "স্বরূপকে যে জানতে পারা যায়না তার কারণ কি?" মা বললেন পথ ত মহাত্মারা বলে দিচ্ছেন আবরণ দূর করা দরকার। তারই জন্য সৎসঙ্গ। পরমার্থচিন্তন ছাড়া বৃথা সময় ব্যয় করবেনা, গুরু উপদেশ পালন করবে। ভগবৎকৃপা আর ভগবৎশক্তির প্রকাশে এই প্রশ্ন তোমার মনে এসেছে। ভগবানের কৃপা হচ্ছে, গ্রন্থের কৃপা হচ্ছে, মহাত্মার কৃপা হচ্ছে কিন্তু আত্মকৃপা হচ্ছে না তাই অভাব থেকে যাচ্ছে। তুমি যেটুকু পার নিষ্ঠার সঙ্গে কর বাকীটুকু তিনি নিজেই করবেন।

পরের দিন রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ষণ তথা হরণলীলা দেখান হল। প্রকাশানন্দজী বললেন মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য শাশ্বত সুখপ্রাপ্তি।

পরিবর্ত্তনশীলের নাম অল্প। মৃত্যু, শরীর এরা সব অল্প। অবিনাশীর নাম ভূমা। আত্মা হচ্ছেন ভূমা। যে কোনও সাধন পথে রজোগুণ ও তমোগুণকে দমন করাই হল প্রথম পর্ব্ব। সেবাবৃত্তি ভক্তির প্রথম সোপান। ভক্তির দুই সন্তান, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর কাহিনী উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন যে একবার গায়ত্রী পুরশ্চারন করতে খুব কম করেও আড়াই বছর লাগে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী চব্বিশবার গায়ত্রী পুরশ্চারন করেছিলেন। জন্মগত সংস্কারে তিনি গায়ত্রীর অধিকারী ছিলেন না কিন্তু চব্বিশবার পুরশ্চারন করেও যখন তিনি ভগবানের দেখা পেলেন না তখন জীবননাশের সংকল্প নিয়ে নদীর দিকে রওনা হলেন। পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি আবার ঘরে ফিরে আসেন এবং সেখানে এসে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ পান ঘরের মধ্যে। কিন্তু প্রচণ্ড অভিমানভরে তিনি শ্রীভগবানকে বলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। ভগবানও যাবেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি চোখের জলে ভেসে ভগবানকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং কেবল শ্রীভগবানকে বলতে লাগলেন যে এখন আর তাঁর আসার কোনও দরকার নেই-তাঁকে দর্শন দেবার জন্য। দীর্ঘ চব্বিশবার তিনি পুরশ্চরন করেছেন তবু ভগবান প্রীত হননি ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীভগবান তখন শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকে বাইরে এসে দেখতে বললেন যে কেন এতদিন তিনি আসেন নি। বাইরে এসে শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে ঘরের ভেতর তাকিয়ে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী দেখলেন ঘরের মধ্যে চব্বিশটা আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। কিছুই বুঝতে না পেরে শ্রীভগবানকে জিগেস করে জানতে পারলেন যে তাঁর সংস্কারে ২৪টা ব্রহ্মহত্যার পাপ রয়েছে এবং সেই জন্যই এতদিন শ্রীভগবানের দর্শন মেলেনি।

সকালবেলা মায়ের নির্দ্দেশে কনখল এবং হরিদ্বারের বিভিন্ন মন্দিরে পূজো দেওয়া হয়। মন্দিরগুলো হল দক্ষেশ্বর মহাদেব, গঙ্গামন্দির, সতীমন্দির, হনুমানজীর মন্দির, গণেশ মন্দির, কালভৈরব মন্দির, দুর্গাজীর মন্দির, দরিদ্র-ভঞ্জন মহাদেব, তিলতাণ্ডেশ্বর মহাদেব, পতিত পাবনেশ্বর মহাদেব, পিণ্ডকেশ্বর

মহাদেব, গৌরীশঙ্কর মহাদেব, নীলেশ্বর মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, হরিহর মন্দির, হনুমানগঢ়ী, মনসামন্দির, চণ্ডীদেবী, অঞ্জনাদেবী, শীতলা মা, মায়াদেবী, শিবমন্দির (বাঘাট হাউস)।

দুপুরে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হল। প্রতিজনকে নারায়ণজ্ঞানে মাথায় ফুল দিয়ে পূজো করে তারপর খাবারের প্যাকেট এবং কাপড় দেওয়া হল। মা সেইখানে বসে, ফুলগুলো এবং প্রতিখানা কাপড় মাকে ছুঁইয়ে তারপর দেওয়া হল।

বিকেলে বিদ্যানন্দজী বললেন "বিচার" কথার শাস্ত্রীয় অর্থ কি? এর অর্থ হল শ্রবন, মনন, এক্ নিদিধ্যাসন। এরা হল আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় অর্থাৎ সাধন পথ। মায়ের সামনে রোজ শ্রবণ ত হচ্ছেই, মনন করা হচ্ছে কি না সেটা চিন্তা করা দরকার। চারঘণ্টা এখানে বসে শ্রবণের পর বাইরে বেরোন মাত্র কেউ যদি এমন কোনও একটী কথা বলে যাতে রাতের ঘুম নষ্ট হয় তাহলে শ্রবণ হল না। যেই শ্রবণের পর মনন না আসে সেই শ্রবণ বন্ধ্যা। শ্রবণের পরিপাক অবস্থায় মনন অত্যাবশ্যক। ধ্যান করতে বসলে সংসার চিন্তায় মন ছুটাছুটি করে কেন? মনের স্পন্দন বন্ধ করে দেওয়া দরকার। সেই অবস্থায় সংসার ত দেখা যাবেই না এমন কি নিজের শরীরও দেখা যাবে না। বিবেক ও মনন দ্বারা মনকে বুঝিয়ে তার স্পন্দন বন্ধ করা দরকার। কি মনন করবে, না, যা শ্রবণ করলে তাই মনন করবে। দেহাকার বৃত্তি দূর করে অহমাত্মা বৃত্তির অহোরাত্র প্রবাহের নাম নিদিধ্যাসন। একান্তে বসে যাও। পরমাত্মাতে চিত্তনিবেশ কর, পরমাত্মার অপরোক্ষ অনুভব কর। মানবদেহ কেবল কর্ম্ম করে। অন্যান্য দেহ ভোগযোগী, একমাত্র মানুষ শরীরেরই কর্ম্মে অধিকার, স্বর্গে অধিকার, এবং নরকে অধিকার। অন্য দেহে এ অধিকার নেই।

গোবিন্দপ্রকাশজী বললেন যখন প্রাণীদেহে পুণ্য একত্র হয়ে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে তার একটা লক্ষণ সৎসঙ্গলাভ। সৎ কে, না, যে তিনকালে

একই রকম থাকে। সেই সৎব্যক্তির সামনে বসে শাস্ত্র শ্রবণ করা একরকম সৎসঙ্গ। শাস্ত্রগ্রন্থ স্বাধ্যায় আর একরকম সৎসঙ্গ। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র সমাহিত চিত্তে জপ করার নাম আর একরকম সৎসঙ্গ। জপে জিহ্বা কাজ করবেনা, কণ্ঠ কাজ করবে। যেখানে কণ্ঠ এবং জিহ্বা স্তব্ধ হয়ে জপ হয় তার নাম অজপাজপ যার আর এক নাম সমাধি। আহারে বিহারে আচারে বিচারে সত্য অনুসরণ আর একরকম সৎসঙ্গ।

আরতির সময় মা আবার কাউকে কিছু না বলে শ্রীযুক্ত নিতাই বসু-মল্লিকের সেই ছোট্ট ঘরে গিয়ে হাজির। সেই চেয়ারখানায় গিয়ে বসলেন, আমরা দিদিমার সমাধি মন্দিরের জানালা দিয়ে নির্নিমেষ নয়নে মায়ের দৈবীরূপ অনুভবের চেষ্টা করলাম।

মাতৃসৎসঙ্গে মা বললেন পূর্ণ আত্মসমর্পন যখন হয় তখন তার লক্ষণ নিজে নিজেই প্রকাশ পায়। আর একটী প্রশ্ন "গুরুর কৃপা আর প্রেমের বেগ কি করে বাড়ান যায়।" মা বললেন "মহাপুরুষরা যা বলছেন তা ঠিক ঠিক পালন করাই এর উপায়।"

পরদিন প্রকাশানন্দজী বললেন, "আজ এই গঙ্গার তীরে বসে মায়ের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করছি তিনি এখন আরও ২৫ বছর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর এইভাবে কল্যান বর্ষন করেন।" তিনি আরও বললেন, "মায়ের কাছে প্রসাদ নেবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করোনা। মা সব জানেন। তোমাদের ছোট বড় সব ইচ্ছাই মা জানেন। শুধু অপেক্ষা কর যেটুকু তিনি দেন সেটুকু যেন ধারণ করতে পারো। মায়ের হাত একবার মাথায় লাগলে সারাদিন শরীর ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে।" তিনি যখন এই সব বলছিলেন মা তখন নির্ব্বিকার উদাসীনভাবে বসে আছেন। এসব কথা যে তাঁর কানে যাচ্ছে এরকম কোনও লক্ষণেরই প্রকাশ নেই। প্রবচনের শেষে প্রকাশানন্দজী সংকীর্ত্তন করালেন শ্রীমন্ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। সাথে সাথে মায়ের সেই উদাসীন নির্লিপ্ততা ফুৎকারে উড়ে গেল। নামের সাথে সাথে হাতে তাল দিতে লাগলেন।

সাধারণতঃ সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত প্রবচন হত। তারপর মহাত্মারা চলে যেতেন, মাও উঠে যেতেন আর আমরা দৌড়াতাম ভোজনশালার দিকে প্রথম ব্যাচে বসবার জন্য। এইদিন মা প্রবচনের শেষে হঠাৎ রান্নাঘরে গিয়ে হাজির। সেখানে সব পরিদর্শন করলেন না দৃষ্টিস্তব্ধ করে প্রসাদ করে দিলেন কে জানে? এরপর গেলেন ভোজনশালায় যেখানে একসাথে প্রায় তিনশো লোক খেতে পারে। সাথে সাথে রন্ধন এবং ভোজন পরিচালনার যোগ্যতম সাধু স্বরূপানন্দজী। ভোজনশালায়ও বোধ হয় আনাচ কানাচগুলো পর্য্যন্ত পরিদর্শনের নামে দৃষ্টিস্তব্ধ করে দিলেন মা। স্বরূপদার সাথে দু'চারটে কথা হল চলতে চলতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আমাকে ওইদিন ভোজনশালায় ভোজন পরিবেশনের ব্যবস্থাপনায় থাকতে হয়েছিল। মনে মনে জানি যে ওইদিন মায়ের ১০৮ কুমারী পূজা। কিন্তু ভোজনশালায় আটকে থেকে মনটা খুঁতখুঁত করছিল যে এবার আর কুমারী পূজা দেখা হল না। ভোজনার্থীর সংখ্যা সেদিন একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ২টোর আগে রেহাই পেলাম না। রান্না খাবারে যে কি করে কুলিয়ে গেল এটাও একটা বিস্ময় আমাদের কাছে। তারপরে মনে হল যে এই জন্যই বোধ হয় ভোজন আরম্ভ হওয়ার আগে মা এসে রন্ধনশালায় রাঁধা খাবার দাবারের ওপর দৃষ্টিপাত করে গিয়েছিলেন। যাই হোক কাজ করছি ভোজনশালায় মনটা পড়ে রয়েছে কুমারীপূজোয়। সাধারণতঃ বারটা থেকে একটার মধ্যে কুমারীপূজো হয়। কাজেই এবার কুমারীপূজো দেখা হলনা সাব্যস্ত করে মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে মায়ের কুমারীপূজা যেমন দেখতে পেলাম না তেমন মায়েরই নারায়ণ সেবার কাজে ত লেগে রইলাম। তাহলেই হোল। দুটো সোয়া দুটোর সময় এদিকের পাট চুকিয়ে রোজকার মত নিজের আস্তানায় ফেরার উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম বিশ্রামের জন্য। চলতে চলতে হঠাৎ কি যে মনে হল জানিনা, কেমন করে যেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম যেখানে আমার উচিৎ পাশের দরজা দিয়ে উঠানে পড়ে রাস্তায় যাওয়া। দোতলায়

রাত্রে মাতৃসঙ্গ হল। একজন প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চেয়ে গুরুকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? মা বললেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে পরিচয় করিয়ে দেয় গুরু, সেইজন্য।

একজন জিগেস করলেন বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম্মের সংসার, ঋষি পত্নী, ঋষিবালক এসব কথার অর্থ কি? মা বললেন, যে সব কিছু ধারণ করে আছে এবং ভগবানের দিকে চালিত করছে সেই ধর্ম্ম। যেই ভগবান ধারণ করে রেখেছেন, পরমপথ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া করা দরকার, তা পালন করা সংসারের নাম ধর্ম্মের সংসার। সৎকথা বলো, সৎপথে চলো, সত্যে প্রতিষ্ঠ হও।

একজন প্রশ্ন করলেন, ছলিয়া অনেক হাসায় অনেক কাঁদায়। এসবের শেষ কবে হবে? মা বললেন, গুরুকৃপা যেদিন হবে।

একটী প্রশ্ন। পাপ ত সকলেই বোঝে কিন্তু তবুও কেন পাপপথে যায়। মা বললেন, যখন পাপ বোঝার স্থিতি আসে তখন সে আর পাপপথে যায়না। স্থিতি না আসা পর্য্যন্ত যায়।

এরপরে মাকে অনুরোধ করা হল একটী গানের জন্য। এই বিশ্বময়ী জগৎজননীর তখন সে এক অপূর্ব্ব শিশুরূপ। একে ওকে তাকে জিগেস করেন কি গাইবেন কি করবেন। সেই জিজ্ঞাসার মধ্যে মুখের যে প্রকাশভঙ্গী তা কি বর্ণনা করা যায়। আমি ত কিছু জানিনা, এখন কি করব, কি গাইব, কি চায় এরা, তোমরা বলে দাও। আমি ভক্তের বাঁধনে বিপদে পড়েছি, কি করব, এই হল ভাব। আশ্রমিক মেয়েরা ধরলেন "ধরলও"। মায়ের অতি সৌম্য অতি প্রসন্ন মুখমণ্ডল। মুখখানা নীচু করে কোলের ওপরে ডান হাতখানা স্থির। বাঁ হাতখানা কোলের ওপর রেখে খেলা করছেন হাতখানা নিয়ে আর গান করছেন। গান করতে করতে শেষে এলেন, "হরিবোল"। মায়ের ভঙ্গী তখনও সেই একই রকম। ঠিক যেই মুহূর্ত্তে মনে হল যে মায়ের নাভিব্রহ্ম থেকে "হরিবোল" উঠছে ঠিক সেই সময় মা হঠাৎ জোরে জোরে হাতে তালি

বাজিয়ে হরিবোল গাইতে লাগলেন। বার কয়েক গানের পরেই অবশ্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমরা প্রণামমন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম আর মা সোজা হয়ে বসে করুনাবর্ষী দৃষ্টিতে মৃদু মন্দ দুলতে লাগলেন।

প্রণাম মন্ত্রের পর সাধারণতঃ মাও চলে যান মহাত্মারাও চলে চান। এইদিন হঠাৎ মা নিজের থেকে বলতে লাগলেন "আত্মসমর্পন" সম্বন্ধে। ২।১ দিন আগে সৎসঙ্গে কেউ প্রশ্নটা জিগেস করেছিল। মা বললেন, সেদিন বলার খেয়াল হয়নি, ভেতর থেকে আসেনি। আজ এসেছে তাই বলছেন। যা বললেন তা সবই উচ্চস্তরের বোধগম্য তত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকেনি।

পনের তারিখে প্রকাশানন্দজী বললেন, মা শব্দের দুই অর্থ। এক বাচিক দুই লক্ষ্যিক। ইন্দ্রিয় গৃহীত ব্যাপার বাচিক, অন্তর গৃহীত ব্যাপার লক্ষ্যিক। যেমন কাউকে ডাকা হল—এ বায়গন। বাচিক অর্থ বেগুন কিন্তু লক্ষ্যিক অর্থ বেগুনওয়ালা। তেমনই এ ট্যাক্সী। বাচিক অর্থ ট্যাক্সি, লক্ষ্যিক অর্থ ট্যাক্সিওয়ালা। মাকে বাচ্যার্থে বিচার করলে কষ্ট পেতে হবে, লক্ষ্যার্থে বিচার করলে আনন্দ পাওয়া যাবে। এক হল গুণাতীত, লোকাতীত, দুই হল স্থুল।

বিষ্ণু আশ্রমজী বললেন, নিজের থেকে ভাল বক্তা কেউ থাকলে তার প্রবচন শোনো। তা নয়ত নিজে নিজেই কীর্ত্তন করো। আর উভয়ের অভাবে ভগবানের লীলা স্মরন করো। এইভাবে যে ভগবানের সেবা করে সে সংসারের গমনাগমন থেকে মুক্তি পায়। যেমন কাশ্মীর বেড়াতে গেলে সঞ্চিত ধনের থেকে কিছু নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে খরচের জন্য তেমনই সংসারে আসার সময় জীব সঞ্চিত কর্ম্মের ফল সাথে সাথে নিয়ে আসে এরই নাম প্রারব্ধ। তিনি বললেন পাখাহীন পাখীর নাম অপযশ। বর্ষাবিনা যে নদী বাড়ে তার নাম তৃষ্ণা আর ধূমবিহীন যে অগ্নি জ্বলে তার নাম চিন্তা।

রাত দশটা থেকে একটা সর্য্যন্ত রাসলীলা দল দেখালেন মহারাসলীলা। হলঘর একেবারে লোকে লোকারন্য। সকলেই একটা পর্য্যন্ত বসে দেখলেন

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা রাসপূর্নিমার রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোপিনীদের সাথে এই মহারাসলীলা করেছিলেন। দেবী মহামায়াকে ডেকে বললেন যে যোগমায়া দ্বারা ব্রজের পুরুষদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে যাতে তারা জেগে না ওঠে এবং গোপিনীদের অভিসারের কথা জানতে না পারে। এরপর রাস-লীলা সুরু হল এবং শেষ হবার পর শঙ্কর মহাদেব আর মহর্ষি নারদের কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেল যে এই রাসলীলা সাধারণ নরনারীর ক্রিয়া নয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে এক সময় ঋষি বালকগণ ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ক্রীড়ার সুখ আস্বাদনের। এই ঋষিবালক-গণ আবার ছিলেন শাপভ্রষ্ট দেবতাকুল। শ্রীভগবান সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। ভক্তের ভগবান সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ওই নরলীলায় অবতরণ করেছিলেন। এই হল রাসলীলার পূর্ব্ব কাহিনী।

রাত দেড়টায় রাসলীলা শেষ হল। মা এই এতক্ষণ ঠায় বসেছিলেন হলঘরে। প্রকাশানন্দজী এবং আরও ২।৩ জন মহাত্মাও ছিলেন। রাস-লীলার শেষে মায়ের আর এক খেলা। মা মঞ্চের ওপরে গিয়ে কৃষ্ণ এবং গোপীগণকে মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। সে এক দৃশ্য, এক পরিবেশ। কি যে যাদু মা জানেন। আমাদের চোখে ওই রাসলীলা পার্টির বালক কৃষ্ণ হয়ে গেল, গোপীরা বৃন্দাবনের গোপী হয়ে গেল আর রাত ২টোর সময় কনখলের হলঘর হয়ে গেল বৃন্দাবনের পূর্ণিমা নিশি। ভাবের ঘোরে সমবেত জনতা তন্ময় হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন সমস্তদিন মায়ের এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। সমস্তদিন এখানে ওখানে বারান্দায়, ঘরে সিঁড়ির মুখে, হলঘরে, একতলায় সর্ব্বত্র কল্যানময়ী মূর্ত্তিতে বসে শত শত লোকের প্রণাম আর মালা আর পূজা গ্রহণ করছেন। সকলেই তৃপ্ত, পূর্ণ—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের পূর্ণ সংস্পর্শে এসে। সকালের দিকে মা গেলেন দক্ষমন্দিরে। দক্ষেশ্বর শিবের অভিষেক করলেন সোয়া মন দুধ দিয়ে। মাকে সাজান হল ফুলের সাজে। চারধারে শত শত ভক্তবৃন্দ, ছোট্ট সে মন্দির।

আমি পৌছাতে পারলাম না জায়গামত। যখন পৌছালাম তখন মা গঙ্গা-মন্দিরে পূজো এবং আরতি করছেন। চারধারে ঘিরে কত ভক্ত। মা আর ভক্তরা সব একাকার। কিন্তু ওর মধ্যেই স্বকীয় পবিত্রতায়, জ্যোতিতে স্বতন্ত্ররূপে ভাস্বর মা ওই জনতার মাঝে। ওখান থেকে এলেন দিদিমার মন্দিরে সামনে যেখানে সাতদিন ধরে যজ্ঞ হচ্ছে। পূর্ণাহুতি দিলেন মা।

বিষ্ণুআশ্রমজী বললেন আত্মাতে দুঃখের কারণ কি, না, শরীরের কারণে আত্মা দুঃখ পায়। যেমন পেট ব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি। শরীরের মধ্যে আত্মার অবস্থিতিই আত্মার দুঃখের কারণ। শরীর কেন মেলে আত্মার সাথে, না, কর্ম্মের জন্য। অন্ন চুরি করলে মূষিক জন্ম হয়। মনুর মতে। জল চুরি ভেক জন্ম হয়। দুধ চুরি করলে কাক জন্ম হয়। রস চুরি করলে কুকুর জন্ম, রেশমী বস্ত্রে তিতির জন্ম, ফলমূলে বানর আর জুতা চুরিতে ঘোড়া জন্ম। রাগ ও দ্বেষ হল কর্ম্মের কারণ। এরা আত্মার মধ্যে আসে অহঙ্কার ও অভিমান থেকে। অভিমানী ব্যক্তি অভিমানকে ছাড়ে না কিন্তু অভিমানের দরুন সমস্ত রকম দুঃখ স্বীকার করে। অভিমানের জন্ম অবিবেক থেকে, অবিবেক অজ্ঞান থেকে, অজ্ঞান অবিদ্যা থেকে, আর অবিদ্যা মূলা বিদ্যা থেকে। অজ্ঞানের নাম অনাদি। এ না সৎ, না অসৎ। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে এসে তোমরা যা কিছু করছ সবই এই অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য।

প্রকাশানন্দজী বললেন, নাম থেকে যখন নামীকে পাওয়া যায় তখনই পূর্ণাহুতি। জীবনের লক্ষ্য হল নিজের সৃষ্ট সঙ্কট থেকে নিবৃত্তি। শ্রীভগবানের চরণে একটি প্রণামে দশটী অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায়। যিনি দশটী অশ্বমেধ করেছেন তিনি আবার জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামী মোক্ষপ্রাপ্ত হন। তিনি বললেন, আজ এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে, এই পূন্যতোয়া গঙ্গাতটে ভূতভাবন, ভূতেশ্বর, দক্ষেশ্বর; গৌরীশঙ্করের শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন এই মা এই নরদেহে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ তাঁর ১২৫ বছর আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অবাধে অবস্থান করেন।

প্রকাশানন্দজীর প্রার্থনার আবেগে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, গায়ে রোমাঞ্চ জাগে। উল্লেখযোগ্য দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর নরদেহে এই ধরাধামে অবস্থান করেছিলেন।

সেইদিন দুপুর থেকে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল চেনারেড্ডি সাহেব সপরিবারে আশ্রমে এলেন। সন্ধ্যার সময় তিনিও দু'চার কথা বললেন।

এর পর আগের দিনের মত হলঘরের মঞ্চের উপর মায়ের আরতি হল সমবেত জনতার সামনে, মায়ের সেই রূপের ছটা বর্ণনা অযোগ্য কিন্তু ভোলবার নয়। আরতির পর খানিকক্ষণ কীর্ত্তন চলল। ন'টার পরে মাতৃসৎসঙ্গ হওয়ার কথা কিন্তু সেদিন সেই সময়ে মায়ের যা অবস্থা তাতে কি আর সৎসঙ্গে বসার মত অবস্থা? সারাদিন ধরে মা আজ পৃথিবীর লোককে যুক্তকরে প্রণাম আর স্মিতহাস্যে মালাগ্রহণ করে অভিবাদন করেই দিন কাটালেন। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা কোনও ভেদাভেদ নেই। আনন্দময়ীর আনন্দের হাট পৃথিবীর লোকের জন্য উন্মুক্ত। এই অবস্থায় ন'টার পরে সমবেত জনতা একটু চঞ্চল হলে উঠল মাতৃসৎসঙ্গের আয়োজনের অভাবে। এক বিচিত্র লীলা দেখালেন লীলাময়ী মা। লোকে লোকারন্য সারাটা গেষ্ট হাউস। হলঘর ফেটে পড়ছে লোকের ভিড়ে। এর মধ্যে কেমন করে স্বচ্ছন্দে ত্বরিত গতিতে লীলায়িত ভঙ্গীতে নিজের পথ করে নিয়ে অকস্মাৎ এসে বসে গেলেন সৎসঙ্গে যেখানে রোজ বসতেন। এমনি দিনে সাধনা করে অনুরোধ করে গান গাওয়াতে হয় আর তাও শিশুর মত এদিকে ওদিকে অসহায় দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করেন কি গান গাইবেন। তারপর পুষ্পদি অথবা অন্য কেউ গান ধরেন এবং খানিকবাদে মায়ের খেয়াল আসে। আর আজ একেবারে মা নিজের থেকে এসে বসে গান গাইতে লাগলেন আর সমবেত জনতাকে মাতিয়ে দিলেন নাম সংকীর্ত্তনে। সংকীর্ত্তন বেশ যখন উঁচু পর্দ্দায় উঠে গেছে একেবারে ছোট্ট মেয়ের মত শরীর-খানা একটু বাঁকিয়ে খাটের ওপর থেকে নেমে ভেতরে চলে গেলেন সকলের অলক্ষ্যে। মা চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে সকলে বুঝতে পারল যে মা

চলে গেছেন।

যথারীতি মাইকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল হলঘর খালি করে দেবার জন্য। হলঘর সাজান হবে। লোকেরা সব এদিক ওদিক চলে গেল।

রাত তিনটের সময় সমবেত জনতা অপেক্ষমান। নির্ব্বানদা পূজার সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত। মঞ্চসজ্জা তৈরী। মা এলেন ভাবময়ীরূপে। কোনও রকমে এসে শয্যার ওপর বসলেন। চারিদিকে হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করলেন। সারি দিয়ে মহাত্মারা বসে আছেন। মা তারপর শয্যাগ্রহণ করলেন আর সাথে সাথেই সমাধি। অপরূপ, অপার্থিব পরিবেশে পূজো হল অবর্ণনীয়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় পূজো শেষ হল। সকলে লাইন করে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিল আর প্রসাদ পেল। পরদিন বিকেল আড়াইটে নাগাদ মায়ের সমাধি ভঙ্গ হল। সেই থেকে মা প্রায় মৌন হয়ে গেলেন।

রাত্রিবেলা মাকে প্রণাম করে বরাভয়দায়িনী শ্রীহস্তের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে হরিদ্বার ছাড়লাম কোলাহলমুখর কর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্যে।

—:::—

"আসল সরকারের 'নৌকর' হও। সেই মূল সরকার থেকেই ত এই সরকার। যেমন মন দিয়ে সরকারী কাজ নিয়মিত কর, সেই রকম মূল সরকারের দিকেও একটি চিন্তাধারা রাখা উচিত। সেবাবুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। লক্ষ্য থাকে তিনিই। তবে সেই সেবাবুদ্ধিতে লিপ্ত থাকার জন্য—যেমন ঘড়িতে দিনে একবার করে দম দেবার চেষ্টা করা—মানে একটু সময় স্থিরভাবে বসে তাঁর জপ ধ্যান করা।"

—শ্রীশ্রীমা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজজী গত ১২ই জুন ১৯৭৬ অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীধামে মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হইয়াছেন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আনন্দবার্ত্তার পরবর্ত্তী একটি সংখ্যা "শ্রীগোপীনাথ স্মৃতি সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত করা হইবে।

যাঁহারা শ্রীগোপীনাথজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনবেদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ এবং অগাধ জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের জ্ঞাত বিষয় আমাদের লিখিয়া জানান। কবিরাজজীর সম্বন্ধে বিশেষ রচনাও সাদরে গৃহীত হইবে। সমস্ত রচনা ১৯৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। জয় মা। ইতি—

সম্পাদক

আনন্দবার্ত্তা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদৈনী।

বারাণসী—২২১০০১

ਉਲਝਦੀ ਸਾਹਜ਼ਦੀ

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni „	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XX		...	61.50
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.75
Amar Vāni	...	—	6.00

BENGALI

Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVII		...	48.50
Akhanda Mahayājna „ „	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	...	2.50
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha		...	2.50
Vivek Churamani— „ „ „		...	3.50

GUJRATI

Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		...	4.00
—Vol. II		...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	...	...	6.00
Matri Vani (Sayings)			3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Special	7.50
Mother as Seen by Her Devotees		—Do—	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	3.00
Ma Anandamayi Lila—Hari Ram Joshi		...	15.00
A Mystic Sage—Ma Ananandamayi Shyamananda Banerjee		...	15.00

PHOTOS

Photos —various sizes	0.50 to 15.00

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 4727/57

আনন্দবার্তা

বর্ষ ২৩ অক্টোবর, ১৯৭৬ সংখ্যা ৪

আনন্দবার্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

ত্রয়োবিংশ বর্ষ] অক্টোবর, ১৯৭৬ [সংখ্যা ৪

পরামর্শ-পরিষদ্

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ, পি০আর০এস০, ডি০লিট্

ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম০ এ০. পি০ এইচ০ ডি০

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড
অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং
(ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী ও আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তায় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।
* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক কমিশন বাবদ অতিরিক্ত দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউণ্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগবতানন্দ দ্বারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও *অনুপ প্রিন্টার্স*, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	— ...	... ১৮৫
২।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	... ১৮৭
৩।	মাতৃ-সংসঙ্গ (১৬)	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	... ১৯৭
৪।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	... ২০৫
৫।	মাতৃ-প্রসাদ	—মৌনী মা	... ২১০
৬।	মাতৃ-স্মরণ	—অধ্যাপক সনৎ কুমার সেন	... ২১৪
৭।	মাতৃ-কথামৃত	—শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ২২৬
৮।	চিন্ময়ী	—শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়	... ২৩১
৯।	ধন্য হ'ল জন্ম মম পূর্ণ হ'ল অন্তর	—শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য	... ২৩৩

: মাতৃ-বাণী :

[সংকলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

সত্যানুসন্ধানীর বাসনা ভগবান পূর্ণ করেন। যেরূপ চাওয়া হয় সেইরূপই প্রকাশিত হয়ে তিনি যা করবার করেন। মনের বাসনা জাগ্রত তিনি করেন, পূর্ণও তিনিই করেন। মানুষের কর্ত্তব্য প্রাণময় করিয়া ভগবানকে স্মরণ, জপে ধ্যানে নিত্যকর্ম্মে নিয়মিত মনটা তৎপরিবেশে সুরক্ষিত রাখা। সৎসঙ্গে সৎপরিবেশে স্থিত থাকার জন্য সৎক্রিয়ায় নিত্য মনকে ব্রতী রাখার চেষ্টা হওয়া।

* * *

বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভগবানেরই সর্বরূপ। স্বরূপ প্রকাশের যাত্রায় চলা।

* * *

স্বরূপ প্রকাশের জন্য দ্রুতবেগে রাস্তা খোলার দিক্ নেওয়া। জগতের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ—জীবন যাত্রার দিক্ না হওয়াই। বিশ্বজগতের অন্তর্গত কিরূপ পরিবেশ পাঁতি পাঁতি করে তো দেখা হয়েছে—আর ওদিকে মন রাখার দিক্ না নেওয়াই। অসার সংসার আসা যাওয়া বারবার, কেউ নহে কার—তবু কি চাওয়া বারবার ?

* * *

ভগবানের দিকে যত অগ্রসর ততই সমগ্র ক্লেশদায়ক ক্রিয়া শিথিলের দিক্—ইহা মনে রাখা। জগতের ক্রিয়ায় সাময়িক আনন্দ—আর ক্লেশদায়ক দুঃখ পিছনে ছায়ার মতন। নিজেকে পাওয়ার যাত্রী হওয়া।

ভগবৎবুদ্ধিতে সেবা—তাহাতে ভগবানের সেবা হয়। সবই ভগবানের সৃষ্ট—ভগবান এইভাবে সেবা নিচ্ছেন।

*　　*　　*

খুব বেশী সময় বসিয়া জপধ্যান করিতে না পারিলেও স্মরণে যেন তাঁহাকে রাতদিন ২৪ ঘণ্টা আপ্লুত করিয়া টানিয়া রাখে—জগতের সবকিছু আকর্ষণ হইতে। এইটিই সাধকের প্রয়োজন।

*　　*　　*

অতীত সর্ব্বাতীত প্রকাশের জন্য যে যেখান হইতে তাঁর উদ্দেশ্যে যা করে তাঁর কাছে সবই পৌঁছে। তিনিই করেন, করান—তিনিই মন্ত্র ও লক্ষ্য স্বয়ংই তো। যেমন করনেওয়ালা, করানেওয়ালা, ক্রিয়া লক্ষ্য একই। ঐ প্রকাশই চাই, তিন পুঁটলী অর্থাৎ ত্রিপুটীনাশের জন্য।

*　　*　　*

যে দিন যায় সে তো আর আসেনা। অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। দিন থাকতে দীননাথের দিকে। তৃতীয় বয়সে অলসে অবশে হয় না হরিনাম বলা—কালের কর্ম্ম, কি করা যায় সেই বেলা?

*　　*　　*

বাহিরে আদর না দেখাইয়াও যে "মা"—সেই খাঁটি "মা" আছে ও থাকবে। তাঁকে সরাইয়া দিতে চাহিলেও সে যায়না।

*　　*　　*

মানুষেরই সাধনায় উপাসনায় মনের আবরণ দূরীভূত করার জন্য যাহা গুরু দেন—সেই ধারায় চলার গতিতে ব্রতী থাকাই।

*　　*　　*

বিশ্বব্যাপক এক আত্মা তো। সেই প্রকাশ স্পর্শের জন্য যাত্রী হওয়া।

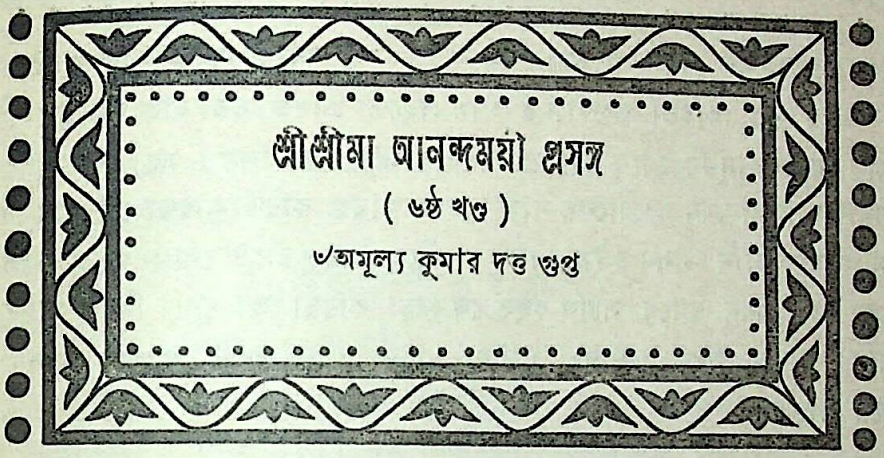

একান্ত নির্ভর ভাবই শক্তির প্রকাশের সহায়ক

নেপালদাদা (নারায়ণ স্বামী)—তুমি যখন রাত্রিতে বসিয়া নাম জপ করিতে তখন কি ভাবে নাম হইত ?

মা—উহার ত কতরকম আছে। কখনও কখনও দেখিতাম যে মুখ দিয়া উচ্চারণ না করিলেও শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অতি স্পষ্টভাবে নাম হইয়া যাইতেছে। কখনও কখনও ভিতরে আপনা আপনি নাম চলিত, আমি শুধু বসিয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতাম। এইরূপ কতপ্রকার যে হয় তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়!

নেপালদাদা—আচ্ছা, আসন ইত্যাদি কি ভাবে হয় ?

মা—এ দেহের আসন আপনা হইতেই হইত। বাজিতপুর ত ততটা নিরিবিলি ছিলনা ; বিদ্যাকুটে যখন ছিলাম তখন সন্ধ্যা হইলেই ভগবানের নাম করিতে বসিতাম। ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতাম, কারণ উহা মন্দির কিনা। ঐখানে বসিয়া ভগবানের নাম করা হয়। সন্ধ্যাবেলা নাম করিতে বসিয়া নিজেকে একেবারে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দিতাম। ভগবানের হাতে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া না দিলে ত ভগবান্ গড়িয়া নিতে পারেন না। যদি পেছন হইতে কোন টান বা আকর্ষণ থাকে তবে নাম করিতে

গিয়া ভগবানের পরশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখনই সমস্ত আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ভগবানের নাম লইতে আরম্ভ করা যায় তখনই দেখা যায় যে ভগবান্ কি ভাবে আসিয়া সাধককে গড়িয়া তোলেন। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত শরীর ছাড়িয়া যখন ভগবানের নাম করিতে আরম্ভ করিতাম তখন দেখিতাম যে আপনা আপনি আসন হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে শরীরটা সোজা হইয়া উঠিত এবং উহা এমন ভাবে সটান হইত যে ইচ্ছা করিয়া উহা ঘুরান ফিরান যাইত না। আবার যখন ঐ ভাবটা চলিয়া যাইত তখন শরীর আপনা আপনি নুয়ে পড়িত।

নেপালদাদা—নামের গুণে এই সব হয়, না নিজেকে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দেওয়ার ফলে এইরূপ হয় ?

মা—দুই কারণেই হইতে পারে। নামের শক্তি ত আছেই। তাহা ছাড়া বেপরোয়াভাবে নিজেকে ভগবানের কাছে ঢালিয়া দিলেও নামের শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। দুইটি ভাব প্রায় এক সময়েই চলিতে থাকে। নামের শক্তি যখন প্রকাশ হয় তখন শরীরের বা মনের উপর কাহারও হাত থাকে না। আবার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়া নাম করিতে পারিলেও নামের শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নেপালদাদা—কোন স্থানে মহাপুরুষ বসিয়া যদি তপস্যা করে তবে ঐ স্থানের প্রভাব কি ভাবে বুঝা যায় ? প্রভাবটা কি মাটির না উপরের ?

মা—প্রভাবটা স্থানের ও হইতে পারে অথবা মাটির উপরেরও হইতে পারে। সকল সময় যে প্রভাবটা মাটিতেই সংযুক্ত থাকে তাহা নয়। এই প্রভাবের পরিচয় নিজে নিজেই পাওয়া যায়। কোন স্থানে গেলে মনটা যে চঞ্চল হয়, আবার কোন স্থানে গেলে মনটা স্থির হয় ইহা ঐ স্থানের প্রভাবের জন্যই। আমরা যে ভাবে থাকি, যাহা কিছু দেখি বা চিন্তা করি

ঐ ঐ ভাবেই আমাদের সত্তার অংশ ছড়াইয়া থাকে এবং এ অবস্থায় থাকিয়াই প্রভাব বিস্তার করে।

রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া মা উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজনীয়তা

৬ই শ্রাবণ শুক্রবার (ইং ২২।৭।৪৯) সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে বলিলেন, আজ মনোরঞ্জন (সরকার) বাবুর সঙ্গে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, যে ভাবে আজকাল শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে লোকের আর শ্রদ্ধা থাকে না। কাজেই ঐ ভাবে শ্রাদ্ধ না করিয়া ঐ অর্থ দ্বারা অন্য কোন সৎকাজ করাই ভাল। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।

মা—(গঙ্গাদিদিকে) শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে ?

গঙ্গাদিদি। যাহা শ্রদ্ধার সহিত করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা শব্দ হইতেই শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

মা—যমুনাদাস বাজাজ কিছুদিন রায়পুরে থাকিয়া শেষে ওয়ার্দাতে ফিরিয়া গিয়া আমাকে ঐখানে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তখন আমার ঐদিকে যাইবার কোন খেয়াল হইল না। পরে যখন খেয়াল হইল তখন শুনিতে পাইলাম যে বাজাজের মৃত্যু হইয়াছে। এ দেহের কাছে বাঁচিয়া থাকা বা মরিয়া যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই বাজাজের মৃত্যুর পর ওর্য়াদাতে গেলাম। তখন বাজাজের স্ত্রী আমাকে বলিয়াছিল "মাতাজী, মহাত্মা গান্ধী শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন কি হইবে ? আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমরা যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিও," অবশ্য সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে শ্রাদ্ধ করা উচিত কি না। যদি করিত তবে কি বলিতাম তাহা এখন বলিতে পারি না। যাহা হউক

আমি ওয়ার্দা হইতে ফিরিবার পথে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বাজাজের পুত্র কমলনয়ন শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ করিতে যাহা যাহা করিতে হয় সে ঠিক্ ঠিক্ তাহাই করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি খুকুনীকে বলিলাম, "উহারা করিবেনা বলিতেছে কিন্তু আমি যে তাহার ছেলেকে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিতেছি।"

তোমরা এইমাত্র বলিলে না যে শ্রদ্ধার সহিত যাহা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। দুর্গাপূজা, নারায়ণপূজা, এগুলি ত শ্রদ্ধারই কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হইলেও নারায়ণপূজা যেভাবে করা হয় দুর্গাপূজা সেভাবে করা হয় না, প্রত্যেক কার্য্যের বিধিই ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ শ্রাদ্ধের বিধিও ভিন্ন। লোকে বহুদিন হইতে যাহা যে ভাবে করিয়া আসিতেছে তাহা তাহারা সেই ভাবে করিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করে। সেইজন্য মুসলমান, খৃষ্টান তাহাদের নিজ নিজ প্রথা অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। আবার তোমরাই বল না যে ঋষিদের মুখ হইতে যে সব মন্ত্র বাহির হইয়াছে উহার অর্থ না বুঝিয়া যদি আবৃত্তি করিয়া যাওয়া যায় বা কাহাকেও আবৃত্তি করিতে শুনা যায় তাহা হইলেও ফল হয়। সেই হিসাবে শ্রাদ্ধাদির অর্থ না বুঝিলেও যদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উহা করা যায় তাহা হইলেও ফল পাওয়া যায়। এরূপ কত কথাই ত শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রেত নিজে দেখা দিয়া বা স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে গয়ায় পিণ্ড দিতে বলে। (মনোরঞ্জনবাবুকে) তুমি বলিতেছিলে যে, যে ভাবে আজকাল শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাতে শ্রদ্ধা থাকে না। যাহাকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইলে শ্রদ্ধা হয় সেইরূপ লোক দিয়াই শ্রাদ্ধ করান উচিত। তবে এ কথাও সত্য যে, মন্ত্র এবং ভাব দ্বারা যেরূপ পূজা হয় সেইরূপ ভাব দ্বারাও শ্রাদ্ধ হইতে পারে।

মহাপুরুষের দীক্ষা এবং সাধারণ দীক্ষা

৭ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২৩।৭।৪৯)। আজ বেলা ১০॥০ টার সময় আশ্রমে গেলাম, মা তখন হলঘরে বসিয়াছিলেন। একটি মহিলা (নির্ম্মলা দিদি) দীক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, মা, আমি জানিতে

চাই যে যদি কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা না লইয়া সাধারণের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া যায় তবে কি আবার মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হয় ?

মা—দীক্ষাই যদি একবার লওয়া হইয়া থাকে, তবে আবার দীক্ষা কি ? আলোচনা এইভাবে আরম্ভ হইল সত্য কিন্তু মা কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। শ্রীমান কুসুম ব্রহ্মচারীও (নির্ব্বানানন্দ) দীক্ষার প্রশ্নটি অবলম্বন করিয়া উহাকে বিশদ করিবার জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহা-পুরুষের দীক্ষা, সাধারণ লোকের দীক্ষা, এবং পুস্তক হইতে কোন মন্ত্র নিজেই বাছিয়া লইয়া উহা জপ করা—এই তিন প্রকার অবস্থার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি ?" কিন্তু মার কথা অনবরত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, "আজ কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছি যে সবই যেন 'গায়েব' হইয়া যাইতেছে, একথা খুকুনীকে বলিয়াছি। খুকুনী সেদিন ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া মুখে দিল, পরে যখন তরকারী মুখে দিল তখন দেখি যে পূর্ব্বের ডাল ভাতের স্মৃতি একেবারেই নাই। আজকাল যে খুকুনী কিংবা অন্য কাহারও সহিত কথা বলা হয় উহা যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়া বলা হয়। তাহা না হইলে সবই তলাইয়া যায়। তোমরা যে প্রশ্ন কর তাহার উত্তর দিতে গিয়াও মাঝে মাঝে এই অবস্থা হয়। পূর্ব্বে শুনিয়া রাখিয়া এখানে ত কিছু সাজান গুছান নাই যে কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে উহা তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরিব। প্রশ্নের সঙ্গে ভাব এবং ভাষা সবই যে নূতন হইয়া তৈরী হয়। ভাল ভাবে প্রশ্নের জবাব আসে, আবার কখন কখন কথা সব ভাঙ্গিয়া যায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—এরূপ হয় কেন ?

মা—তোরা বাজাইয়া নিতে পারিস না তাই এরূপ হয়। যাক্ এখন কথা উঠিয়াছে যে, যাহার মন্ত্র চৈতন্য হয় নাই সে যদি দীক্ষা দেয় তবে ঐ দীক্ষার কোন ফল হয় কি না ? বাস্তবিক এমন একটা অবস্থা আছে যখন মনে হয়

আমি ওয়াঁদা হইতে ফিরিবার পথে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বাজাজের পুত্র কমলনয়ন শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ করিতে যাহা যাহা করিতে হয় সে ঠিক্ ঠিক্ তাহাই করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি খুকুনীকে বলিলাম, "উহারা করিবেনা বলিতেছে কিন্তু আমি যে তাহার ছেলেকে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিতেছি।"

তোমরা এইমাত্র বলিলে না যে শ্রদ্ধার সহিত যাহা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। দুর্গাপূজা, নারায়ণপূজা, এগুলি ত শ্রদ্ধারই কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হইলেও নারায়ণপূজা যেভাবে করা হয় দুর্গাপূজা সেভাবে করা হয় না, প্রত্যেক কার্য্যের বিধিই ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ শ্রাদ্ধের বিধিও ভিন্ন। লোকে বহুদিন হইতে যাহা যে ভাবে করিয়া আসিতেছে তাহা তাহারা সেই ভাবে করিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করে। সেইজন্য মুসলমান, খৃষ্টান তাহাদের নিজ নিজ প্রথা অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। আবার তোমরাই বল না যে ঋষিদের মুখ হইতে যে সব মন্ত্র বাহির হইয়াছে উহার অর্থ না বুঝিয়া যদি আবৃত্তি করিয়া যাওয়া যায় বা কাহাকেও আবৃত্তি করিতে শুনা যায় তাহা হইলেও ফল হয়। সেই হিসাবে শ্রাদ্ধাদির অর্থ না বুঝিলেও যদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উহা করা যায় তাহা হইলেও ফল পাওয়া যায়। এরূপ কত কথাই ত শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রেত নিজে দেখা দিয়া বা স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে গয়ায় পিণ্ড দিতে বলে। (মনোরঞ্জনবাবুকে) তুমি বলিতেছিলে যে, যে ভাবে আজকাল শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাতে শ্রদ্ধা থাকে না। যাহাকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইলে শ্রদ্ধা হয় সেইরূপ লোক দিয়াই শ্রাদ্ধ করান উচিত। তবে এ কথাও সত্য যে, মন্ত্র এবং ভাব দ্বারা যেরূপ পূজা হয় সেইরূপ ভাব দ্বারাও শ্রাদ্ধ হইতে পারে।

মহাপুরুষের দীক্ষা এবং সাধারণ দীক্ষা

৭ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২৩।৭।৪৯)। আজ বেলা ১০॥০ টার সময় আশ্রমে গেলাম, মা তখন হলঘরে বসিয়াছিলেন। একটি মহিলা (নির্ম্মলা দিদি) দীক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, মা, আমি জানিতে

চাই যে যদি কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা না লইয়া সাধারণের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া যায় তবে কি আবার মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হয় ?

মা—দীক্ষাই যদি একবার লওয়া হইয়া থাকে, তবে আবার দীক্ষা কি ? আলোচনা এইভাবে আরম্ভ হইল সত্য কিন্তু মা কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। শ্রীমান কুসুম ব্রহ্মচারীও (নির্ব্বানানন্দ) দীক্ষার প্রশ্নটি অবলম্বন করিয়া উহাকে বিশদ করিবার জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহা-পুরুষের দীক্ষা, সাধারণ লোকের দীক্ষা, এবং পুস্তক হইতে কোন মন্ত্র নিজেই বাছিয়া লইয়া উহা জপ করা—এই তিন প্রকার অবস্থার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি ?" কিন্তু মার কথা অনবরত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, "আজ কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছি যে সবই যেন 'গায়েব' হইয়া যাইতেছে, একথা খুকুনীকে বলিয়াছি। খুকুনী সেদিন ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া মুখে দিল, পরে যখন তরকারী মুখে দিল তখন দেখি যে পূর্ব্বের ডাল ভাতের স্মৃতি একেবারেই নাই। আজকাল যে খুকুনী কিংবা অন্য কাহারও সহিত কথা বলা হয় উহা যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়া বলা হয়। তাহা না হইলে সবই তলাইয়া যায়। তোমরা যে প্রশ্ন কর তাহার উত্তর দিতে গিয়াও মাঝে মাঝে এই অবস্থা হয়। পূর্ব্বে শুনিয়া রাখিয়া এখানে ত কিছু সাজান গুছান নাই যে কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে উহা তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরিব। প্রশ্নের সঙ্গে ভাব এবং ভাষা সবই যে নূতন হইয়া তৈরী হয়। ভাল ভাবে প্রশ্নের জবাব আসে, আবার কখন কখন কথা সব ভাঙ্গিয়া যায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—এরূপ হয় কেন ?

মা—তোরা বাজাইয়া নিতে পারিস না তাই এরূপ হয়। যাক্ এখন কথা উঠিয়াছে যে, যাহার মন্ত্র চৈতন্য হয় নাই সে যদি দীক্ষা দেয় তবে ঐ দীক্ষার কোন ফল হয় কি না ? বাস্তবিক এমন একটা অবস্থা আছে যখন মনে হয়

যে এ জাতীয় দীক্ষা হইতে কোনই কাজ হয় না, আবার এমনও দেখা যায় যে, গুরুর নিকট যে মন্ত্রের চেতন হয় নাই উহা আবার শিষ্যের নিকট চেতন হইয়া গিয়াছে। বারদীর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও এইরূপ কথা শুনা যায়। তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলেন অথচ গুরু নিজে অজ্ঞান রহিয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই এক আত্মা বা এক সত্তা, তিনি কাহার নিকট কি ভাবে প্রকাশিত হইবেন তাহা কি বলা যায়? অনেক সময় দেখা যায় যে কেহ একজনের নিকট দীক্ষা নিল, কিন্তু কিছুদিন জপাদি করিয়া কোন ফল না পাইয়া অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হইল। এখানে তোমরা দেখিতেছ যে একজনই ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট যাইতেছে; কিন্তু গুরুশক্তি যখন তাহার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে তখন সে বুঝিবে যে একমাত্র গুরু যিনি তিনিই তাহাকে বার বার কৃপা করিয়াছেন। দীক্ষা পাইয়া কিছুই হইল না বলিয়া যে ব্যাকুলতা আসে ইহা হইতেই বুঝা যায়—দীক্ষাটা বৃথা হয় নাই। দীক্ষা না হইলে হয়ত ব্যাকুলতা আসিত না।

গাছের জন্য তোমরা ত বীজ বপন কর, বীজটিকে ত মাটিতে চাপা দিয়া রাখিলে, মাটির নীচে থাকিয়া ঐ বীজ কি ভাবে বৃক্ষ হইয়া উপরে উঠিবে তাহা কিন্তু সে নিজেই ঠিক করিয়া নেয়। আবার দেখ এক সময় কতকগুলি বীজ বুনিলে, এক সময় সকল গাছ সমান ভাবে হয় না, কোনটি সবল হইয়া উঠে আবার কোনটি দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। আবার কিছুদিন পর ঐ দুর্ব্বল চারাটিই সবল হইয়া অন্যান্য চারা গাছকে ছাড়াইয়া যায়। কাজেই কখন কি ভাবে যে কাহার বীজ কাজ করিবে তাহা বলা যায় না। তোমরা অনেক সময় বল যে বীজ পুরাতন হইলে উহা হইতে গাছ হয় না, সেই জন্য গাছ করিতে নূতন বীজের খোঁজ করা হয়। সেইরূপ বলা হয় যে সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট বীজ পাইলে উহা চেতন বলিয়া সহজেই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কুলগুরু বা সাধারণ লোকের নিকট হইতে কোন বীজ পাইলে উহাতে কোন ফল হয় না কারণ ঐ সব বীজের হয় ত এককালে চেতন ছিল কিন্তু কালক্রমে উহার শক্তি

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে মনে রাখিও যে এই জাতীয় বীজ নষ্ট হয় না। কারণ ইহা যে নিত্য বস্তু। এখানে যে বীজরূপে ভগবান্‌ই বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ কি নষ্ট হইবার জিনিষ? আর মাটিতে বীজ বুনিলে যাহা নষ্ট হইতে দেখা যায় তাহা কি বাস্তবিকই বৃথা যায়? বৃথা কিছুই যায় না। ঐ বীজ মাটিতে পচিয়া সার হইয়া থাকে। যদি দেখ যে ঐ বীজ পিপড়ায় খাইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলেও বলা যায় যে উহা নষ্ট হয় নাই। ভগবান্‌ই বীজের শক্তিটা উঠাইয়া নিয়া উহা পিপড়ার পুষ্টিসাধনে লাগাইয়া দিয়াছেন। এই ভাবে দেখিলে কিছুই নষ্ট হয় না এবং কিছুই বৃথা যায় না। তোমরাই ত বল যে নাম নামী অভেদ। যদি তাহাই হয় তবে সকল নামেই যে ভগবানের পূর্ণ-শক্তি আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে অনেক সময় দেখা যায় যে কোন কোন নাম জপ করিয়া কেহ কেহ শীঘ্র ফল লাভ করে। আবার কাহারও বিলম্ব হয়। এই যে শীঘ্র এবং বিলম্ব হওয়া যাহা কিছু দেখ তাহা তোমরা কালের মধ্যে আছ বলিয়াই দেখ, তাহা না হইলে শক্তি হিসাবে সবই সমান।

কুসুম ব্রহ্মচারী—মহাপুরুষের নিকট হইতে কোন চেতন মন্ত্র লাভ করা আর কুলগুরু বা সাধারণ লোকের নিকট হইতে কোন মন্ত্র লাভ করা এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই?

মা—কিছু পার্থক্য আছেই বলিতে হইবে। তাহা না হইলে লোকে পার্থক্য করে কেন? তবে তোমরা ইহাও দেখিতে পাও যে এক মহাপুরুষের অনেক শিষ্য থাকে। তাহারা সকলে এক গুরুর শক্তি লাভ করিলেও সকলে সমানভাবে উন্নতি লাভ করে না। মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা লাভ করিয়া কাহারও হয়ত এ জীবনে ভাল করিয়া ধর্ম্মভাবই ফুটিয়া উঠে না।

আমি—তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে কেহ হয়ত একজনের নিকট দীক্ষালাভ করিল কিন্তু অন্য একজনের শক্তিলাভ করিল, ইহাতে বুঝা যায় যে প্রত্যেক মন্ত্রেই শক্তি থাকে না।

মা—হাঁ, লোকের আলাদা আলাদা জ্ঞান থাকে বলিয়াই এরূপ মনে হয়। কিন্তু গুরুশক্তি যদি মাত্র এক হয় তবে আর আলাদা ভাব কোথায়? একজনের কাছে দীক্ষা নিয়া যে আবার অপরের কাছে কেহ কিছু লাভ করিল বলিয়া মনে করে এখানেও কিন্তু সে একই শক্তির খেলা হইতে পারে, কারণ পরে সে যাহা কিছু লাভ করিল তাহা যে তাহার দীক্ষার জন্যই নয় তাহা কে বলিতে পারে? আবার এমনও হয় যে কেহ দীক্ষার পর অপরের নিকট গিয়া এমন কোন উপদেশ লাভ করিল যাহাতে তাহার গুরুনিষ্ঠাই বাড়িয়া গেল। এইরূপ কতই হইতে পারে, কাজেই অজ্ঞান অবস্থায় যাহা আলাদা আলাদা মনে হয় জ্ঞান হইলে দেখা যায় উহা এক গুরু শক্তিরই কাজ। কাহারও হয়ত দেখিলে যে সে সাধন ভজনে উন্নতি লাভ করিয়া এমন একটি অবস্থায় পড়িল যাহাতে পড়িয়া সে বেশ ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ইহা মনে হয় যে তাহার জীবনটাই বুঝি বৃথা গেল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। এই যে ঘুরপাক খাইতে দেখা যায় তাহাও কিন্তু গুরুর ইচ্ছাই হইতেছে এবং ইহার দরকার আছে বলিয়াই হইতেছে। আবার হঠাৎ একসময় এই অবস্থা হইতেই ইষ্টের সাক্ষাৎকার হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য বলা হয় যে একবার গুরুর আশ্রয় লাভ করিলে তিনি নিরাশ করেন না।

আমি—পুস্তক হইতে কেহ যদি নিজে নিজে কোন মন্ত্র বাছিয়া নিয়া জপ করিতে আরম্ভ করে তবে কেমন হইবে?

মা। অনেক সময় বলা হয় যে গুরুবাক্য লাভ না করিলে কিছু হয় না। সেইজন্য দীক্ষা লওয়ার অর্থই হইল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। এখানে দীক্ষা লইয়া সে যে গুরুর আশ্রয় পাইয়াছে এই ভাবটাই বড় হইয়া উঠে এবং ইহাই তাহাকে পরমপদ প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। সাধারণ লোকের মধ্যে জীবভাব প্রবল বলিয়া সে নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। সে আজ হয়ত মনে করিল যে সে একটি বিশেষ মন্ত্র লাভ

করিয়াছে এবং উহাই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র; কিন্তু কিছুদিন পর তাহার নিজের উপর অবিশ্বাস আসিবে। সে হয়ত তখন মনে করিবে যে ঐ মন্ত্র ত সে নিজেই বাছিয়া নিয়াছে কাজেই তাহাতে যে ফল হইতেছে না উহা আর আশ্চর্য্য কি? আমার কাছে আসিলে আমি অনেককে বলি যে তাহাদের যে নাম ভাল লাগে সেই নাম যেন তাহারা করে। ইহাতে অনেকেই বলে, "মা, তুমি ত কোন নাম বলিয়া দিতেছ না। আমার নাম যে আমাকেই ঠিক করিতে বলিতেছ।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জীবভাবের জন্য লোকের দুর্ব্বলতা সহজে যায় না।

আবার দেখ, পুঁথিতে যে মন্ত্র আছে উহাও কোন মহাপুরুষের বাক্য। কাগজে উহা লেখা আছে বলিয়াই উহা কাগজ নয়। উহাও শক্তিযুক্ত বাক্য। সাক্ষাৎভাবে কোন মহাপুরুষের বাক্য লাভ এবং পুঁথি হইতে কোন মন্ত্র লাভের মধ্যে পার্থক্য এই যে পুঁথি হইতে মন্ত্রলাভ করিলে উহা সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট হইতে লাভ করা হইল না। এখানে মহাপুরুষ ও তাঁহার বাক্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে এই ব্যবধান ব্যবধানই নয়। সে পুঁথি হইতে মন্ত্র লাভ করিয়াই মনে করে যে, সে সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট হইতে উহা লাভ করিয়াছে। এরূপ যাহার হয় তাহার ঐ ভাবেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। এ দেহের কাছেও অনেকে আসিয়া বলিয়াছে, "মা, এই মন্ত্র জপ করিতে চাই, ইহাতে কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না?" ইহার উত্তরে এ দেহ হয়ত কখন কখন বলিয়াছে, "হাঁ, হইবে।" এগুলি কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা। সাধারণতঃ এইরূপ বলা বড় হয় না।

স্বপ্নের দীক্ষা সম্বন্ধেও এই জাতীয় কথা শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে স্বপ্নের দীক্ষা লাভ করিলে ঐ দীক্ষা ততক্ষণ কার্যকরী হয় না যতক্ষণ না ঐ দীক্ষামন্ত্র কোন জীবিত গুরুর মুখ হইতে লাভ করা যায়। আবার এমনও

হইতে পারে যে গুরুর নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে দীক্ষা লাভ করিলে যে শক্তিলাভ হয় উহা পূর্ণভাবে স্বপ্নেও হইতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে আবার গুরুর মুখ হইতে ঐ স্বপ্নের মন্ত্র লইতে হইবে। এ দেহ ত কিছুই ফেলিতে পারে না। এ দেহ বলি কেন? বাস্তবিক পক্ষে কিছুই মিথ্যা নয়। সবই যে সত্য। সব সত্য বলিয়াই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা এইবার উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

(ক্র ম শ ঃ)

গুরুপূর্ণিমা, ১৯৭৬

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী

❀

" পরম পথের রাস্তায় জয়জয়কার হওয়ার চেষ্টা করা। "

মাতৃ-সৎসঙ্গ

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

(১৬)

এ বছর সংযম সপ্তাহ মহাব্রত সপ্তর্ষি আশ্রমে পরম পূজণীয়া শ্রীশ্রীমায়ের পরম পুণীত উপস্থিতিতে, ১২ই নভেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হল। শ্রীমান ত্যাগমূর্ত্তি গোস্বামী গণেশ দেওজীর কৃপা ও প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের দ্বারা পরিচালিত সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের ষষ্ঠ অধিবেশন শ্রীশ্রীমার কৃপায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হল। এই অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত হয়েছিল সপ্তর্ষি আশ্রম, যা গঙ্গাতীরে অবস্থিত, সাধন ভজনের একান্ত অনুকুল স্থান। এই স্থানেই প্রাচীনকালে সপ্তঋষি অর্থাৎ বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, অত্রি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ ও জমদগ্নি তপশ্চর্য্যা করে ছিলেন। এমন সুন্দর স্থানে মার কৃপায় মাতৃসান্নিধ্যে ধ্যান ও ভজনের এই স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত সকলেই পেলেন। সে সময়ে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমার মুখে যে পরম মধুর কথামৃত শোনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল তাই আমি এখানে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। যথাসম্ভব মার শব্দ যথাযথ রাখারই আমি চেষ্টা করেছি। যেমন গঙ্গার পূতপ্রবাহ থেকে লোকেরা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে গঙ্গাজল নিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনই মার কথামৃতের গঙ্গাপ্রবাহ থেকে আমি আমার স্বল্প শক্তি অনুসারে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি ততটুকুই লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব ত্রুটির জন্য শ্রীশ্রীমার চরণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১২ই নভেম্বর সৎসঙ্গ আরম্ভ হল। সেদিন মা একটু কীর্ত্তন করলেন ও কথাপ্রসঙ্গে আগের দিনের রাত্রির একটি ঘটনা বললেন। মা বললেন "কাল রাত্রে ২টো থেকে ২॥০ টার মধ্যে সূক্ষ্মশরীরধারী তিনজন ব্যক্তি এই শরীরের কাছে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে একটি গুরু ও দুজন শিষ্য। গুরু যতটা উন্নত শিষ্যও ঠিক ততটাই উন্নত। এমন বলা হয় গুরু যতটা উন্নত স্থান প্রাপ্ত হন শিষ্যও ঠিক ততটাই উন্নত স্থানে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। আমি তাদের বললাম "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।" এর পর তাদের ঊর্দ্ধগতি হয়ে গেল।

১৩ই নভেম্বর-এ কেউ বললেন, "এই তোমার সংযম ব্রতে"...ভদ্রলোকের প্রশ্ন অসমাপ্তই রইল, মা বাধা দিয়ে বললেন, "তোমার সংযম ব্রত মানে ?"

প্রঃ কঃ—আমার সংযম ব্রত, ভগবান আমার পিতা, মাতা, সখা, বন্ধু সব একই সময়ে কেমন করে হতে পারে ?

মা—হ্যাঁ, সব আছে। তুমিই তো সব।

প্রঃ কঃ—তত্ত্বদৃষ্টিতে তো ঠিকই আছে।

মা—অতত্ত্বের কথা কোথায় আছে ? "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি" যেখানে, সেখানে তুমি পিতা, মাতা, সখা সব কিছু হতে পারো।

প্রঃ কঃ—এতো লীলার কথা নয়। কেউ তোমাকে বাবা বলে না, সকলে মা বলেই ডাকে।

মা—কেউ গোরখপুরে এই শরীরকে বাবা বলেও ডেকেছে। জ্যোতিষবাবুর ছোট ভাই-এর শ্বশুর এই শরীরকে বাবা বলে ডেকেছিল। ওদের ঘরে সবাই 'মা মা' কীর্ত্তন করছিল. তাতে সে সবাইকে বকে বলল "ম্যা ম্যাঁ কি করছ ?" ঘরের লোকেদের ইচ্ছা হল যে তাকে মার দর্শন করানো হোক। তাই ঘরে রেবতীবাবুর কীর্ত্তন করানো হল। সেখানে

এই শরীরকেও নিয়ে গেল। সে এই শরীরকে দূর থেকে দেখে সবাইকে বলল "স্ত্রীরা কি আবার সাধু হতে পারে?" এর পর এমন ঘটনা ঘটল যে সে একটি বেড়াল সাথে নিয়ে শুতো। সেই বিড়ালটি তাকে খুব খামচালো। পরে সে এই শরীরের সাথে প্রাইভেটে কথা বলল। তাতে সে বলেছিল যে "সবাই তোমাকে মা বলে, আমি তোমাকে বাবা বলব।" তুমি বুঝতে পেরেছ? তোমার প্রশ্নের সমাধান হল কি না?

প্রঃ কঃ—লীলা-দৃষ্টিতে পার্থক্য আছে। কেউ কৃষ্ণকে বাবা বলে সম্বোধন করেনি, রাধাকে মা বলেনি ও শঙ্করকে সখা বলেনি। লীলা-দৃষ্টিতে মাতা-পিতার পার্থক্য রাখতেই হয়। তত্ত্ব-দৃষ্টিতে তো পিতা মাতা একজনই। এই জন্যই লীলাবাদে একটু অসুবিধা হয়।

মা—তোমার কোন্ কথায় অসুবিধা হয়? আমি তো তোমার ছোট্ট মেয়ে, পিতা, মাতা সব একই।

প্রঃ কঃ সংযম সপ্তাহে লীলার কথা থাকে?

মা—তত্ত্ব প্রকাশের জন্য ধ্যান, জপ ইত্যাদি যার যা অনুকুল হয় সে তাই করে।

প্রঃ কঃ—লীলা না থাকলে ধ্যান কেমন করে হবে মা?

পঃ সুন্দরলাল—সবাই মাকে দেখছে স্তব্ধ হয়ে, ইহাই লীলা।

মা—তোমার কথাও ঠিক আর ওঁর কথাও ঠিক। যে যা বলে তাই ঠিক।

পঃ সুন্দরলাল মা পাকা গুরু। (সবাই হাসলেন)।

মা—যে যা বলে তিনিই, তিনিই তিনিই।

প্রঃ কঃ—আত্মস্বরূপের জন্য ব্রহ্মের বেদান্তে বিচার করা হয়েছে, কিন্তু ভাগবতে প্রথম শ্লোকে জন্মাদ্যস্য' থেকেই সব লীলার কথা দেখতে পাওয়া যায়।

মা—ভগবানের যা কর্ত্তব্য তাই লীলা।

পঃ সুন্দরলাল—ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে খেলা নয়।

প্রঃ কঃ—দেব মানে দ্যোতনা অর্থাৎ ক্রীড়া। যেখানে স্বরূপের প্রকাশ, যেখানে ক্রিয়া, সেখানেই লীলা।

মা – ভগবানের যা ক্রিয়া তাই লীলা।

প্রঃ কঃ—ক্রিয়ার দৃষ্টিতে মা, পিতা-মাতায় পার্থক্য আছে।

মা –ভগবান স্বয়ং খেলা করছেন। পিতা রূপে মাতা রূপে, পুত্র রূপে—সব রূপে ভগবানই আছেন। একের জন্যও সব আছে, সবার মধ্যে সব আছে, আর এক, তাই সব আছে। ভগবৎ-প্রকাশ পাওয়ার জন্য চেষ্টা কর। ভগবানকে পেলে সব পাবে, তাই সব এক। কি বাবা, এ কি মিথ্যা কথা ?

প্রঃ কঃ—আমি বুঝি নাই।

পঃ সুন্দরলাল—চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রে শোনা যায় যে তিনি কোন পুরুষকে মা বলে ডেকেছিলেন তাতে তার স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হয়েছিল।

মা—বাবা বুঝুক, আর নাই বুঝুক, যা বলেছি তা ঠিক হয়ে গেছে, কারণ যেখানে বোঝা হয়ে গেছে সেখানে তো প্রশ্নই থাকে না।

১৪ই নভেম্বর।

প্রঃ কঃ—সবকিছু ভগবানই, এই তত্ত্ব বুঝেও ভ্রান্তি কেন হয় ? এই ভ্রম থেকে কি করে নির্গত হওয়া যায় ?

মা—গোঃ গণেশদওজী আকর্ষণ করে এখানে এনেছে। সপ্তঋষির স্থান। রাস্তা তো ভগবান বলেই রেখেছেন। তুমি তো চাও এই ভ্রম থেকে নির্গত হতে, এর কৌশল সৎসঙ্গ থেকে প্রাপ্ত হয়। আর অমর কথা শোনা, যে কথা শুনলে মৃত্যুর কথা থাকে না। মহাত্মারা, যা বলেন অথবা গুরু যা বলেন তেমন করে চললে ভ্রম দূর হওয়ার জন্য চিত্তের অবস্থা অনুকূল হয়ে যাবে।

প্রঃ কঃ—ভ্রম আছে, তা তো বোঝা যায় না ; বিষয়ে বিষ আছে তাও বোঝা যায় না।

মা—তবে প্রশ্ন কেন কর ?

প্রঃ—সন্দেহ হয়, তাই

মা—সন্দেহ হওয়া মানে সন্দেহ তো এসে গেল, যদি না আসত তবে প্রশ্নই করতে না। মাহাত্মাদের সৎসঙ্গ কর আর গুরুর আজ্ঞা পালন নিঃশঙ্ক হয়ে কর।

প্রঃ কঃ—একটি খেলনা আর অপরটি খেলাড়ী। ঈশ্বর আর ভক্তের মধ্যে কে খেলাড়ী আর কে খেলনা ?

মা—আচ্ছা বাবা, কথা এই যে তুমি ছাড়া আর কেহই নাই। খেলাড়ী, খেলনা ও খেলা, এই তিন পুটলীর যতক্ষণ নাশ না হয়, ততক্ষণ একত্বের প্রকাশ হয় না।

প্রঃ কঃ—বেদান্তের প্রশ্ন আমি করিনি, ভক্তির দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করছি।

মা ভগবান নিজেকে নিয়ে নিজেই খেলা করেন। স্বয়ং না হলে খেলা কি হতে পারে ? ভগবান স্বয়ং নিজেকে নিয়ে খেলা করেন।

প্রঃ কঃ—ভক্ত খেলনা না তুমি খেলনা ?

মা—ছোট্ট মেয়ে খেলনা।

প্রঃ কঃ—ধ্যান কেমন করে করা যায় ?

মা—গুরু যেমন ধ্যান বলেছেন তেমন কর। ধ্যান করা এক কথা আর ধ্যান হওয়া আরেক কথা। যাকে যেমন গুরু বলেছেন তাকে তেমনি করা উচিৎ। আসলে ধ্যান স্বয়ং নিজে নিজেই হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে যা ক্রিয়াশক্তি আছে তাই দিয়ে ধ্যান কর।

প্রঃকঃ—প্রতিবর্ষ সংযম সপ্তাহ হচ্ছে। তুমি তার পরীক্ষা নেও ? কি না ?

মা—এখানে তো কিছু পড়াশুনা নেই উটপটাঙ্গ বলি, তাই তুমি শোনো। যে প্রফেসার ছাত্রের পরীক্ষা নেয় সেই প্রফেসার তো জানেই যে এই ছাত্রের কতটা জ্ঞান আছে ? কিন্তু প্রোফেসার এই জন্য পরীক্ষা নেয় যে ছাত্র স্বয়ং বুঝুক যে আমি কতটা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছি। আর আমার

মধ্যে কতটা কমী আছে। এখানে প্রোফেসারই সেই ছোট্ট মেয়ে। (সবাইকে ইঙ্গিত করে) আমি তো আমার মা বাবার কাছে বসে আছি। ভগবানের কি সুন্দর খেলা। ঋষিরা আকর্ষণ করে নিজেদের স্থানে নিয়ে এসেছে। স্থানের প্রকাশ নিত্যই আছে। তার প্রভাব অবশ্যই প্রকাশ দেবে। এই সাত দিন তোমরা ঘরে কি করতে, কত সত্য-মিথ্যা সংযম-অসংযম, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য করতে। এখানে তোমরা সবাই সংযমের জন্য চেষ্টা কর। এতে নিশ্চয়ই উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। সংযমিত জীবন পালন করার মানে কি? তোমাতে ভগবান কোথায় আছেন? তাঁর প্রকাশের জন্য কি করা উচিৎ? "যেমন অন্ন খাবে তেমন মন হবে"। সংযম সপ্তাহে অধিক নিদ্রাও না অধিক ভোজনও না। ভগবানের কেমন সুন্দর বিধান, প্রথমে তুমি ঘরে এক ছিলে। দুজন হলে তারপর দশজন হলে। প্রথমে পড়লে, পরীক্ষা দিয়ে ধন উপার্জ্জন করতে লাগলে। সবাই ভোগ করল। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম তথা সন্যাসাশ্রম, এতে কি আছে? যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সব আশ্রমের ভিত্তি। ভিত্তি দুর্ব্বল হলে বড় মহল গড়ে উঠতে পারে না। তেমনই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দৃঢ় না হলে অন্য আশ্রমগুলিতে নূনতাই থেকে যাবে। ভগবান কোথায় নেই? একমাত্র ভগবানই সর্বত্র আছেন। তিনিই নিজেকে নিয়ে খেলা করছেন। মানুষ বিষয় ভোগেই মত্ত থাকে। বিষয় কি? বিষয় বিষ। বিষ পান করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ মরে যায়। কিন্তু বিষয় এমন বিষ, যা ধীরে ধীরে মারে। slow poision। মৃত্যু কে? তুমি স্বয়ংই মৃত্যুস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। গুরু কৃপায় ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা কর। খেলাড়ী, খেলনা একই। তিনিই স্বয়ং। আমি অমৃত, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, এখন ভাবা উচিৎ। যদি বিষয় বাসনায় জড়িয়ে থাকো তবে আবার return ticket করতে হবে।

আমি কে ? কোথা থেকে এসেছি ? কোথায় যাব ? এই সব বিচার কর। আর শুভগতির ক্রিয়া কর। দুর্গতির দিকে যেওনা। ভগবান দূরে ইহা ভাবাই দুর্বুদ্ধি। এর থেকেই দুর্গতি হয়। এখানে পরীক্ষা কিসের নেওয়া ? যত আগে অগ্রসর হবে ততই লাভ।"

প্রঃ কঃ—সাধন-ভজন করতে করতে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় তবে তুমি সাহায্য ক'র।

মা—ভগবান নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। তাঁর রাস্তায় চল।

প্রঃ কঃ—ধ্যান না হলে কি করব ?

মা—যতক্ষণ ধ্যানে স্থিতি না হয় ততক্ষণ ছেড়ো না।

প্রঃ কঃ—যার কোন গুরু নেই সে কি করবে ?

মা—ভগবনের যে নাম ভাল লাগে, তার জপ কর। নামও যদি ভাল না লাগে তবে চুপচাপ শান্ত হয়ে বস।

"অভাব আর স্বভাব এক জায়গায়ই—একমাত্র ঐ-ই। অভাবটা, স্বভাবটা কি ? তিনিই। কেননা একটা বীজই ত সেই গাছ, সেই বীজ, সেই রকমারীটি ঐ-ইত। অভাব দিয়ে অভাব পূরণ করছ, তাই অভাব যাচ্ছে না এবং অভাববোধও যাচ্ছে না। সেই অভাব-বোধের যখন জাগরণ হয়, তখনই খাঁটি জিজ্ঞাসা। সেই অভাববোধটায় আপনা বোধের অভাব হয় তাই খাঁটি জিজ্ঞাসা আসে, এটি জেনে রেখ। তুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা বল সব ঠিক।"

—শ্রীশ্রীমা

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(১৫)

"তুমি ভাষায় কোন বস্তুরই স্বরূপ পরিচয় দিতে পার না। একটু আভাস মাত্র দিতে পার, কারণ বাণী সেখানে কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইই।"

গেল কিছুক্ষণ। নীরবতা ভেঙ্গে কান্তবাবু বললেন, আশ্রমের ওধারে যতো ক্রিয়া-কর্ম ভাষ্য-ব্যাখ্যা ছিল, এধারে সব জল হয়ে গেছে। গঙ্গাধারা চোখে পড়ে শুধু। এখানে আপনাতে আপনি থাকো, মন। তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

"তোমার কর্তব্য, চেষ্টা ও বুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করাই করণীয়। সেই মহান্ ভাবের ভিতর একবার পড়িতে পারিলে শেষে সেই স্রোতেই তাঁহার দিকে নিয়া যাইবে। একবার ফেলিতে পারিলে হয়।"

আমাদের এই তো তখন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ। তারপর কী যে ঘটে থাকতে পারে, কী ঘটেছে, তা উভয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছিল। বললাম, মা বোধ হয় এ মনকে বলেন "নিজেকে নিয়ে নিজেতে নিজে।" এ-বস্তু অকপটে কেউ চাইবার মতো চাইলে মায়ের "এই শরীরটা হইতে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা হইয়াই যাইতেছে।"

"নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আর ভাবতে হবে না।"

কান্তবাবু আনন্দজড়ানো স্বরে বললেন, এ কিন্তু কল্পনা নয়, স্বচক্ষে কী দেখছি জানো—গঙ্গা ভরা তরী দিতে ভরাডুবি নিজেই গভীর জল হয়েছেন।

---

* এই রচনার উদ্ধারচিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

আবার, নিজেই নৌকোগুলিকে স্রোতে টেনে হাত ধরে অনন্তসাগর দেখাতে চলেছেন। ওই ছোট ডিঙিটি বুঝি তাঁর কোলের শিশুই হবে, ষ্টীমারের ঢেউয়ে ওকে দোলাতে-দোলাতে ঘাটের কূলে ফিরিয়ে দিলেন—অতো ছোটর সাধ্য আছে নাকি সাগরে যাবার!

বলে চললেন, ওই ক্ষুদ্র তো জানে না মায়ের ছোঁয়ায় ছেলে মরে! স্রোতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে, থাকবে এক অনন্তধারা শুধু। এ-সব কাহিনী আমার জানতে বাকি নেই।

কিন্তু বইতে এসব সূক্ষ্মরহস্য পড়া তার বাকি ছিল জানতাম। ওধার থেকে ডাকের সাড়া চেয়ে-চেয়ে জীবন এধারে এগিয়ে আসছিল। কান্তবাবু আপন কথার মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন. আমি এসব সৃষ্টিছাড়া কি দেখছি. কি কি বলছি! আমার সামনে যে-হুগলী নদী সেই হুগলী-নদীই আছে, এটি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, পাশে জেঠিও আছে ঠিক জেঠি হয়ে।

জীবন এসে পৌঁছেছিল। সে বলল, এরা শক্ত ইট কাঠ লোহার বলে মুছে যাবারও নয়, মিথ্যেও নয়।

মায়ের কথা মনে পড়ল—"জগতের ভিতরে সকলের জন্ম; জন্মিয়াই এই জগৎ দেখিতেছ। বাস্তবিক যখন সেই জ্ঞান হইবে তখন বলা চলে জগৎ মিথ্যা।"

আমি কান্তবাবুকে বললাম, এতদিন এদের যেমনধারা জানতেন আজ সে পরিচয় থাকছে না দেখে, এরা বাল্যসঙ্গীর মতো অতীতে-চেনার দাবী এনে হাজির করছে।

তিনি বললেন, এতকালের ধারণার ধার তো ধারতে হবে।

বললাম, ওরা এক-একটা লগেজের মতো, যাত্রাকালে সব লগেজেই দরকারী সেজে তীর্থযাত্রীর কাঁধে চাপতে চায়—তীর্থবাসও সংসার বানাতে। জাগা ঘরে চুরি করে ওরা।

"বহু জন্মের সংস্কারগুলি বট-অশ্বত্থের শিকড়ের মত দেহ-মনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; তাদের উৎপাটন করতে হলে ভিতরে বাহিরে কঠোর কুঠারাঘাতের দরকার।"

কান্তবাবু মাথা নেড়ে বললেন, যেমন জানতাম তেমন জানব না, যা জানতাম না তাই জানব—এ-সবের অর্থ কী? ভাবাবেগে, আতিশয্যে বা অন্য কারণে আমি কি তবে পাগল হয়ে গেলাম?

বললাম, না। যে স্নেহ আকাশে আধার দেখে চাঁদের বাতি হয়েছেন, ঘুম হয়ে শ্রান্ত জগৎকে কোলে নিয়েছেন, প্রভাতে পাখীর ডাকে জাগিয়ে দেবেন, যে স্নেহ শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে দুধ দিয়েছেন, আজ সেই বাৎসল্যের ব্যক্তিরূপ আছেন ঐ দ্বিতল ভবনে। তিনি বিরাজ করছেন তাঁর 'বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত একখানিই আশ্রমের' ওধারের ক্রিয়া-কাণ্ডের সাথে এধারের মৌন-রহস্যের যোগবন্ধন ঘটিয়ে। যে এক পরম বিস্ময় রূপে ওধার, এধার এবং মধ্যেকার ব্যক্তিরূপী 'শরীরটা' এরা সবাই এক হয়ে আছেন একটি একাক্ষর মন্ত্রে, সেই মন্ত্রটি—মা। মা আনন্দময়ী। কৃপাময়ী। কান্তবাবু, আজ তাঁরই কৃপায় আপনার নিশ্চয় দীক্ষা হয়ে গেছে।

কান্তবাবু খানিক চেয়ে থেকে বললেন, তিনি কি আমাকে চান?

বললাম, "তিনি ডাকলেই আমরা ডাকতে পারি।" তিনি যদি না চাইবেন, তবে আপনাকে দিয়ে এত করে কেন চাওয়াবেন! আপনি পরশনে সোনা হতে চেয়েছিলেন, এ সেই পরশন।

শ্রোতা বিস্মিত হলেন না। বললেন, এত সৌভাগ্য পাবার মতো কিছু তো করিনি!

মায়ের কথাই তাকে বললাম: "অহৈতুক কৃপাও হয়। তাহা কেন হয় এই 'কেন'র কোন উত্তর নাই। এই শরীরের কৃপা-রূপেও যদি কিছু দেখ, জানিও তাহাও হইয়া যাইতেছে। আগুনের কাছে গেলে যেমন তাপ

স্বাভাবিক, যদি কিছু এই শরীরের কৃপা ইত্যাদি দেখ, তবে তাহাই। এই শরীর দিয়া সবই হইয়া গিয়াছে।"

কান্তবাবু বললেন, কিন্তু তা কেমন করে কখন হবে ?

"কখন যে সেই সময় আসিবে কেহ ত জানে না। সব সময়ই যে সেই সময় হইতে পারে।"

বললাম: হয়তো যখন নাটমন্দিরে মা আপনার প্রতি দৃষ্টিপ্রসাদ মেলে রেখেছিলেন, অন্য সময়েও হতে পারে। কৃপা কখন বর্ষিত হবে তার ক্ষণটি মা একা স্থির করেন নি, আপনার ব্যাকুলতাও তা স্থির করেছিল।

"তোমাদের 'আমার কি উপায়' এই যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ইহা জমির স্পন্দন। এই স্পন্দন তিনি স্বয়ং প্রকাশ হইবেন বলিয়াই হয়। দেখ না, মাটির ভিতর বীজটি থাকাকালীন তার এযন একটি শক্তির প্রকাশ হয় যাহাতে মাটিরও একটি স্পন্দন হয় ও গাছটি বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মাটিটাও ফাটিয়া যায়।

কান্তবাবু বিহ্বলের মতো চেয়ে রইলেন।

তাকে বললাম, মায়ের থেকে কৃপা লাভের এমন উদাহরণ অন্যসূত্র থেকেও আমি জানি। আপনার এতক্ষণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বলা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখছিলাম। মা 'মর্জি' হলে নিমেষে টেনে নিয়ে তাঁর অসীম শক্তি ও আনন্দের উৎসের সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে, দেন গুণগত পরিবর্তন করে। এক মানুষকে করেন অন্যমানুষ। তাই মাকে চেয়ে মহাত্মারাও ঘোরেন।

বললেন, আনন্দদায়ী এই দৃশ্যই তবে শেষ ?

বললাম, শেষের এটা সুরু। মা বলেন "যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণ সৃষ্টি। যদি কাহাকেও দৃশ্য শূন্য দ্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তবে বুঝিতে হইবে জাগতিক স্থূল দৃশ্যের উপরে যাইতে হইবে। চিন্তা দ্বৈত জগতের এবং দৃশ্যও।" অতএব এহ বাহ্য, আগে আছে আর।

কান্তবাবু স্থানুর মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। বোধহয় কাঁদছিলেন, আবছায় বুঝতে পায়লাম না।

অপেক্ষা করে থেকে বললাম, সর্বভূতান্তরাত্মা মা। আবার আমাদের মাতা-পিতা গুরু-বন্ধু হয়ে 'শরীরে'ও বিরাজিতা। তবু তাঁর কত অল্পই আমরা জানি। আমরা মালা পরাই, মিষ্টির বাক্স দেই। একদিন হয়তো গবেষণা হবে ঐশ্বরিক আবির্ভাবের ইতিহাসে এমন স্বয়ম্ প্রকাশের মতো পরমবিস্ময় ঘটতে পারে কিনা, আনন্দময়ী সত্যই কি কেউ জন্মে ছিলেন? "বাবা, জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই" মাতৃবাণীর এই হাতিয়ার সেই গবেষকরা ভালভাবেই কাজে লাগাবেন।

কতোদিন যাকে বুলি ধরাতে চেয়েছি, আজ তার নিজের মুখে বুলি ফুটেছিল। কান্তবাবু নিজের কথাই বললেন, দেখছি কি জানো, গঙ্গার পুন্য-ধারায় যাত্রী হয়ে এত যে বোট্, ডিঙ্গি, বজরা, ষ্টীমাররা চলেছে, সবারই হাল ধরে আছেন একজন। তিনি তাদের নেয়ে। বাসার নোঙর ছেড়ে স্রোতে-ভাসা নৌকোর মতো এখানে যে এসেছি, এরও হালে সেই একজন নেয়ে আছেন। তিনি মা। পথে যে আনন্দজী সঙ্গী হয়েছিলেন তিনিও মায়ের বাহন। এই যে পার-ঘাটায় এসে বসেছি, মা এখানেও আছেন, ঐ দোতলায়ও আছেন—সব কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি।

জীবন বলল, আমি কিন্তু বেশ দেখে আসছি—যা ভাবি তা ভুল করে ভাবি, যা পাই তা চাইনে। মা আদপে আশ্রমেই নেই। তাঁকে কাল দেখা যাবে নিরাময় হলে, গড়িয়াহাটায়। অতএব আনন্দজীকেও।

আমি বুঝেছিলাম কান্তবাবুর অভিজ্ঞতা অতিকথন নয়, মুখের কথাও নয়। তার বুকের কথা। বললাম, আপনি কিন্তু জীবনের এই দিন-তারিখটি লিখে রাখবেন।

কান্তবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সাহস পেয়ে তার বিশ্বাসের তেজ বেড়ে গেল। বললেন, এখন বোধ হচ্ছে—অন্য কিছু নয়, আর কোথাও

নয়, আমাদের এখানেই আসা ছিল নির্ধারিত। এতদিন প্রতিকর্মে প্রতি পদক্ষেপে যেন মায়ের এমন কাছে এই সময়টির নিকটবর্তী হচ্ছিলাম—উহু—বেশ বোধ হচ্ছে কি জানো, এ জীবনের গোড়া থেকে বুঝিবা তারও আগের থেকে কতো দেশ-বিদেশ পাহাড়-পর্বত জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দিন নেই রাত নেই, একভাবে একটানা চলে চলে এসেছি এই ক্ষণটিতে পৌঁছবার জন্যেই। চিরকাল দূরগতি রক্ষা করে পথ দেখিয়ে এনেছেন মা—, হঠাৎ কথার মধ্যেই বলে উঠলেন, কিন্তু একি হতে পারে! আমার একি হোল—অন্য কিছু ভাবনায় আসছে না। হতাশায় আমি বিকৃত হয়ে গেছি, লোকে কি তাই বলবে না?

এতক্ষণ আশ্রমের গাবগাছটিতে কতগুলি বক্ শান্তিতে মিলে-মিশে ছিল। হঠাৎ তাদেরই গোটা-দুই ওক্-ওক্ শব্দ করে ছিটকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। নীড়ের শান্তিতে ফিরে বসতে পারছে না।

কান্তবাবুর আনন্দ-আবেশ থেকে-থেকে টুটে যাচ্ছে। ঘুরে-ফিরে তাকে তিনি বুঝে নিতে চাচ্ছেন। মনে হোল, যেখানে আমরা বসে আছি সেখান থেকে আনন্দধারা গঙ্গাকে নিয়ত দেখা গেলেও সে-গঙ্গাতেও জোয়ার ভাটা আছে। তার কূল জোয়ারে আনন্দে ভেসে যায়, ভাটায় কাঁদে কাদা হয়ে পড়ে।

কিন্তু জোয়ার আর ভাটা বাদ দিয়েও স্রোত তো আছে!

"সর্বদা জলের স্রোতের মত একমুখী ও তরল হয়ে থাকতে পারলে কোন ময়লা তোর ভিতর আটকাবে না, পরের ময়লাও তোর সংসর্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরমতত্ত্বের সন্ধান বা সম্মিলন লাভ করতে চাইলে নদীর মত তরল ও এক লক্ষ্যে চলতে থাক।"

কান্তবাবু যখন শুকিয়ে বললেন 'লোকে আমাকে বিকৃত বলবে না', তাকে বললাম, বলবে। যারা দীক্ষা ও কৃপালাভে বাধামুক্তির এতবড় পথটা দেখেনি, তারা বলবে। তারা নিজেদেরও বড় করে দেখেনি।

(ক্র ম শ:)

মাতৃ-প্রসাদ

(প্রথম খণ্ড)

মৌনী মা

["ব্রহ্মলীন মৌনীমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়" : ব্রহ্মলীন মৌনীমার সন্ন্যাস নাম ছিল স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী। পরমকৃপাময়ী মার কৃপায়, পরম গুরুদেব শ্রীশ্রী সিদ্ধি মার কৃপায় ও পরমকরুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়—মার সাথে ও পরমকৃপাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে—তাঁর সৎসঙ্গ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রায়ই তাঁর রসময় ভগবানের দর্শন হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে মৌনীমার যে কথোপকথন হয়েছিল তা "কথিকামালা"-তে ছাপা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা শত সহস্র মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও মৌনীমার শ্রীশ্রীমার দর্শন ও কথোপকথন হত। ভগবান নারায়ণ ও অন্যান্য দেবদেবীরও দর্শন পেতেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় মৌনীমার আত্মদর্শন আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়েছিল। মার সাথে মৌনীমার যা কথোপকথন হয় তা "মাতৃকৃপা-প্রসাদ" নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়। দুইটি বইতে এ সমস্ত তত্ত্ব কথা, যা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে ও মায়ের মুখ থেকে শোনা, তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রসিকেন্দ্রশেখর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইংরাজীতেই উত্তর দিয়েছেন "ঠাকুর বলিলেন—Nothing, Nothing অর্থাৎ নেতি নেতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" বাইশ বছর আগে মৌনীমার একমাত্র পুত্র রাখালদাকে বলেছিলেন "এখন তো মা সারা সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু দেখিস শরীর ছাড়ার সময় শ্রীশ্রীমা অবশ্যই কাশীতে আসবেন। শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণকমলতলেই এই শরীরের ব্রহ্মস্থিতি হবে।" মৌনীমার কথা যথার্থই হয়েছিল। কয়েক বছর হল কাশীধামে শ্রীশ্রীমার চরণতলেই মৌনীমার শরীর ব্রহ্মলীন হয়। বিন্ধ্যাচলে মৌনীমাকে বহুবার বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। মৌনীমা একবার বলেছিলেন যে তিনি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মৌনীমা বলেছিলেন "একবার গুরু আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। আরেকবার আমি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন মৃত্যুর ভাব না হলে আর মৃত্যু আসতে পারবে না" এই প্রকারে আমরা দেখতে পাই যে মৌনীমা কালজয় করেছিলেন অর্থাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু হয়েগিয়েছিল। 'মাতৃ-প্রসাদ' থেকে প্রথম কিছুটা অংশ জুলাই ১৬ সংখ্যা আনন্দবার্ত্তায় ছাপা হয়েছে। সম্পাদক]

(৬)

বিদ্যার থেকে জন্ম আমার
বিদ্যাধরী নাম
সরসে সরসী আমি, নাইকো আমার ধাম।
জীয়ন্তে জ্বলন্ত আমি, ধুয়ার মত রই
নাই আমার থই
অতিথি এসেছি ভবে দু'দিনের তরে।
প্রবাসে দুঃখ কষ্ট নিতেই হয়
আপন বাড়ীত নয়।
আপন ঘর মধুময়।
জীয়ন্তে জ্বলন্ত আমি, উদাস আমার ঠাঁই,
আমি বলে কোন ব্যক্তি নাই।
আমি আমি বলে।
সরস্বতী জ্ঞানেতে গরীয়ান
ভুলেতে ভোলা, বুদ্ধিতে সরস্বতী
লক্ষ্মী স্বরূপা।
নিরাকার জায়গাটি কেমন
চন্দ্র সূর্য্যের আলো নাই
পরমজ্যোতি তাই।

ঐত আমার ঠাঁই
যাওয়া আসার ফাঁক নাই
ঐত আমার ঠাঁই।
দেবতা পূজাদি হইয়াছে শেষ
মায়ের কৃপা অশেষ।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, উৎপত্তি নাশ, অমৃতে বাস
সাধন করিতে করিতে জীয়ন্তে মরা হতে হয়
মরা না হইলে অমর নাহি হয়।

(৭)

বিষয় বলে বলিয়ান মন
মন-মরা হইলে সাধন সফল
মরা দেহে জীবন পেলাম
আপন ঘরে গেলাম
যোগ বিয়োগের অধীন নাই
মুক্তি বলে কথা নাই, অমৃতে ঠাঁই।
আপন ভোলা কয়, মায়ের কৃপায় হয়
মায়ের কৃপায় ব্যাপার হইল
ধারাটি বদ্‌লে গেল
আগের মানুষ নেই।

(৮)

অল্পে সন্তুষ্ট, অল্প কথা কয়,
সত্য ধরে রয়
সাধনে তার হয় জয় জয়।
দুঃখ কষ্টে উদাস আসে, পরে নাহি থাকে
তাহা নয়
উদাস পথে লেগে থাকতে হয়।
এমন একটি আছে জায়গা
মনেও থাকে না, ভুলেও যায় না
আছে মাত্র সেই।

(৯)

মান অভিমান দুঃখময়
সাধনে অনিষ্ট হয়।
তাই ভাবিয়া চল ভাই
যোগেতে জেগে থাক সদাই।
প্রথমে ঠাকুর ঠাকুর, তুমি আমি চলে
তাহার পরে আপনি আপনি
নিজে নিজে বলে।

(ক্রমশঃ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যার সহিত 'আনন্দবার্ত্তার' ত্রয়োবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। মুদ্রণ-ব্যয় ও ডাকমাশুলের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী সংখ্যা হইতে 'আনন্দবার্ত্তার বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৮৲ (আট টাকা) ধার্য্য করা হইল।

যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইয়াছে তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আগামী বৎসরের চাঁদা ৮৲ টাকা মণিঅর্ডারযোগে আনন্দবার্ত্তার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া পত্রিকাটির পরিচালনায় সহযোগিতা করিয়া বাধিত করিবেন।

—সম্পাদক

মাতৃ-স্মরণ

সনৎ কুমার সেন।
অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে কনখলে-কুম্ভমেলার সময়। তারপর থেকে কানপুরে কনখলে নৈমিষারণ্যে ও ডিব্রুগড়ে কয়েকদিন ধরে মায়ের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে, এবং মায়ের অন্য সব ভক্ত ও সন্তানের মত, মাতৃ-সান্নিধ্যের আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মায়ের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, কারণ মা সদাই পরিপূর্ণ, পরমজ্ঞানময়ী করুণাময়ী আনন্দময়ী, সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্বের অতীত—সকল দিব্যগুণের তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক প্রকাশ, আর সংসারে আবদ্ধ জীব অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, কামনার তাড়নায় অস্থির, অহংকারে মত্ত, আঘাতে ক্ষত বিক্ষত—অথচ নিরুপায়, মাকে দেখে মনে হয় সকল সমস্যাই তাঁর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ শান্তি তাঁর মধ্যে রয়েছে। শান্তি কে না চায়? পায় কজন? অতএব পরম প্রশান্তিময়ী জননীর প্রতি অশান্ত শান্তিকামী মানুষ যে দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মায়ের সম্বন্ধে যে লেখা প্রথম আমার মনে রেখাপাত করে তা ছিল স্বামী যোগানন্দের "এক যোগীর আত্মকাহিনী" বইটিতে। তারপরে আগ্রহ সহকারে পড়ি একটি ইংরাজী বই যা ছিল মায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের লেখার সংকলন। এর কিছুদিন আগে থেকেই, ঠিক কেন জানিনা, ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র ও অভ্যাসের দিকে আমার একটা ঝোঁক এসেছিল। অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই পুরানো কথাটা যেন নতুন করে মনে দাগ কাটল। শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থী এক বাঙালী অধ্যাপকের সঙ্গে আমার

পরিচয় হয়েছিল বোধ হয় ১৯৭৩ এর শেষ দিকে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ তো এখন দেহ রেখেছেন, আপনি এমন জীবিত কারো নাম বলতে পারেন যাঁর গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আছে যাঁর কাছে যাওয়া যায়? তিনি নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দিলেন, মা আনন্দময়ী। জীবনে যথার্থ কিছু লাভ করতে হলে—তা জ্ঞান বা প্রেম বা শান্তি, যাহা হোক না কেন—এমন কারো কাছে যেতে হবে যাঁর তা আছে বা যিনি তা পেয়েছেন। এই ধরণের চিন্তা আমার মনে তখন চলছিল।

১৯৭৩—এর মার্চে সংসার থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে আমি ঋষিকেশের নিকট একটি আশ্রমে যাই। সেখান থেকে ফেরার সময় হঠাৎ খবর পাই যে মা আনন্দময়ী কনখলে আছেন এবং ভাগ্যে থাকলে তাঁর দর্শন হতে পারে। মনে তীব্র দর্শনেচ্ছা নিয়ে আমি হরিদ্বারে এলুম। সেদিন কুম্ভমেলার স্নানের একটি পুন্য যোগ ছিল—হরিদ্বারে প্রচণ্ড ভীড়, পুলিশের কড়াকড়ি। আমার তখন অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নেই—মায়ের দর্শনই একমাত্র কামনা। হরিদ্বারের নবনির্মিত একটি হোটেল-ভবনে স্যুটকেশ-বিছানা রেখে স্নান সেরে আমি বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ কনখলে মায়ের আশ্রমে পৌঁছলাম।

সেখানে প্রথমে দেখা হোল কমলদার (শ্রী বিরজানন্দ সঙ্গে, তাঁর কাছে জানলাম সেদিন সকালে মা পায়ে হেঁটে হর-কী-পৈরী যাতায়াত করেছেন এবং মাত্র কয়েক মিনিট আগে বিশ্রামের জন্য উপরে উঠে গিয়েছেন। আমার অবস্থা দেখে কমলদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? মাতো ভক্তদের জন্যই আছেন! দাঁড়ান দেখি কি করতে পারি।" এমন সময় দেখা গেল মা হঠাৎ নীচে নেমে এসেছেন। কমলদা মাকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, শীগ্‌গির যান এই যে মা এসেছেন, মা সিঁড়ির মুখে পাশের একটি ঘরে ঢুকলেন। একজন ব্রহ্মচারিণী সেখানে তক্তপোষের উপর তাড়াহুড়ো করে তাঁর বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। মেঝের উপর মাদুর পেতে আমাকেও

বসতে দেওয়া হোল। আমি প্রণাম করে সামনে বসলাম। মা এমন নিশ্চিন্ত-ভাবে বসলেন যেন তাঁর হাতে অনেক অনেক সময়, ব্যস্ততার কোন লক্ষণই নেই। আমাকে বললেন, "বাবা, বল কি বলবে।" এত নিকট থেকে একান্তে জগজ্জননীর দর্শনলাভে আমি এতই অভিভূত হয়েছিলাম যে তখন কোন প্রশ্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব বিল না। তাছাড়া, এতবড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রথম দর্শনে তুচ্ছ বুদ্ধিগত প্রশ্ন করা আমার কাছে কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আমি শুধু বললাম, "মা বইয়ের শুষ্ক যুক্তিতর্ক ভালো লাগে না। তা দিয়ে অধ্যাত্ম-বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান হয় না।" মা আমার মনের কথা বুঝে উত্তরে একটি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "বাবা, (সাধনা) কিছু কি করেছ? দীক্ষা হয়েছে? কিছু তো করতে হবে।" মার এই ছোট্ট উত্তরটি অনেকের কাছে সাধারণ মনে হতে পারে, আমার মনে কিন্তু গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি বললুম, "মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার আশী-যেই ক্রমে সব হবে।" মা তৎক্ষণাৎ ডান হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। সর্বজ্ঞা মায়ের সবকিছুই যথাযথ নিখুত।

এই হোল আমার প্রথম মাতৃদর্শন। তারপরে আবার মাকে দেখি কাশীতে অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন, ১৯৭৪—এর এপ্রিল মাসে। তখন দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও মা আমাকে সস্ত্রীক কাছে বসিয়ে এক-নাগাড়ে ১৫।২০ মিনিটি ধরে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিয়েছিলেন—উপদেশ দিয়ে-ছিলেন। তাঁর উপদেশ কতটুকুই বা বুঝেছি? কতটুকুই বা পালন করতে পেরেছি?

মা সত্যকথা বলার উপর খুব জোর দেন। এই সম্বন্ধে আমার শিক্ষা-লাভ করার একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৭৫-এর জুলাই মাসে মা আসামের ডিব্রুগড় থেকে ফিরছিলেন। পথে নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে সন্ধ্যায় গাড়ী বদল করতে হয়। ঐ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে মাকে কয়েক ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল ট্রেনের গণ্ডগোলের দরুন। পরিবেশ যাই হোক, অপ্রত্যাশিতভাবে ততক্ষণ মায়ের

কাছে থাকতে পেরে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। মাঝে একবার সময় করে আমি ষ্টেশনের ভোজনালয়ে নিরামিষ আহার সমাধা করলাম। কিন্তু আহারের পরেই আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, মায়ের কাছে যখন থাকব, ষ্টেশনের ভোর্জনালয়ে খাওয়টা ঠিক হয় নি। খাওয়ার কি এমনই প্রয়োজন ছিল? খাওয়াটাই বড় হোল? খাওয়ার জন্যই নিজেকে কেমন অশুদ্ধ মনে হোল, আমার ভয় হতে লাগল, মা যদি খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন! যা ভয় করছিলাম ঠিক তাই হোল। আহারের পর মায়ের কাছে আসা মাত্র মা জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া হয়েছে কি না। আমি একটা ছোট্ট 'হাঁ' বলে নিস্তার পাবার চেষ্টা করলাম, মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেয়েছ বাবা? আমি আবার প্রশ্নটা এড়াবার চেষ্টা করলাম একটা অস্পষ্ট উত্তর দিয়ে। কিন্তু মায়ের সেই একই প্রশ্ন। আমি কেন জানিনা বলতে পারলাম না যে ষ্টেশনে ভাত-তরকারি খেয়েছি। খানিকক্ষণ আগে ফল খেয়েছিলাম সে কথা বললাম। সাক্ষাৎভাবে মিথ্যা না বললেও সত্য গোপন করা হোল।

কিছুক্ষণ পরে উপদেশ প্রসঙ্গে মা বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, কোনটা ভালো জানা থাকলেও লোকে সেই মত কাজ করে না। যেমন সত্যকথা বলা যে ভালো সে তো জানাই। কিন্তু সত্য কথা তো সব সময় বলা হয়ে ওঠে না। কথায় আছে, কয়েক বছর ধরে কেউ যদি সত্য কথা বলে, কখনও মিথ্যা না বলে, তাহলে সে সত্যবাক্ হয়ে যায়; অর্থাৎ সে যা বলে তাই ঘটে।" মায়ের এই ধরণের কথা ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে আমার মনে গেঁথে গেল। এই রকমের অবস্থায় পরে আর একবার আমাকে পড়তে হয়েছে মায়ের কাছে নৈমিষারণ্যে কিন্তু তখন আর সত্য গোপন করিনি-দয়াময়ী মাও সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধিক্ষালণের ব্যবস্থা করেছেন। মায়ের কাছে সত্য গোপন থাকে না; তিনি ইচ্ছামাত্র কোনটা সত্য তা জানতে পারেন। কখনও কোন অবস্থায় সত্য গোপন করা কর্ত্তব্য কি না তা মাই বলতে পারেন।

এইবার আর নিজের প্রসঙ্গ না টেনে কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মায়ের কথা বলব। প্রশ্নোত্তরের কতকগুলি ঘটনাস্থলে লিপিবদ্ধ; অন্য কয়েকটি স্মৃতির থেকে উদ্ধৃত, কাজেই এর আক্ষরিক যথার্থতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। তবে এতে মায়ের বক্তব্যের একটা মোটামুটি প্রতিফলন পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্থান বারাণসী এপ্রিল ১৯৭৪

প্রঃ— মা, অদ্বৈত বেদান্তে বলে : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। এর মধ্যে জগৎ মিথ্যা এই কথাটা বোধগম্য হয় না। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

উঃ—আহা কি সুন্দর কথা! ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মছাড়া আর কিছু নয়! জগৎ মানে যা চলে যায়, যা স্থির থাকে না। যা পরিবর্তিত হয় তাতো নিত্য নয়! তা তো মিথ্যাই! আবার এমন এক অবস্থা আছে যেখানে নিত্য-অনিত্য হাঁ-না কোন প্রশ্নই নেই। এ সবের অতীত।

সাধু সন্তদের পরমপ্রাপ্তিই লক্ষ্য। তাঁরা যদি আশ্রম ইত্যাদিতে বাঁধা পড়ে যান তাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন।

স্থান ডিব্রুগড় (আসাম) ১৪।৬।৭৫

প্রঃ—ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা আছে। তা পূর্ণ হবে কি?

উঃ—ব্যাকুলতা যিনি দিয়েছেন, সে ব্যাকুলতা তিনি পূর্ণ করবেনই, কখনও না কখনও।

প্রঃ—মা, আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলুন। ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর কৃপা, তাঁর কল্যাণগুণ, ঈশ্বরোপলব্ধি। আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, একাত্ম, আপনার কাছ থেকে ঈশ্বর-বিষয়ক কথা শোনার মূল্য অপরিসীম।

উঃ—ভগবান কল্পনামাত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। লীলা করার জন্য শুনেছি। এ শরীরেও ঐ কথা। ভগবান বলেছেন, আমার হাতের যন্ত্র সব। সবই তাঁর

হাতের যন্ত্র বিশ্বজগৎ বিশ্বাতীত থেকে। ভগবানই একমাত্র। ভগবানকে পাওয়ার জন্য গুরুবরণ। ঋষি-মুনি রূপেতে তিনি প্রকাশিত।

তিনি মাতৃরূপে, সর্বময় রূপে, যত মুনি তত মত, তত পথ। তত সম্প্রদায়। ভগবান নিজেই তুই অনন্ত। মাখন যত টুকরো করবে, মাখনই থাকবে।

অদ্বৈত মত—এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। বৈষ্ণব মত—ভগবান প্রভু, ভক্ত দাস। একাত্মা না হলে পূর্ণ-অংশ, প্রভু-দাস সম্পর্ক হতে পারে না। যত্র তত্র নেত্র পড়ে তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে। যখন কৃষ্ণ প্রকাশ হল তিনিই একমাত্র।

ভগবান ভক্তের জন্য সাকার হন। সাকার স্ব-আকার। স্ব=রূপ। যেমন জল আর বরফ। বরফে জল আছে। বরফ সাকার—যে পাত্রে থাকে সেই আকার ধারণ করে। ভগবান সর্বরূপে রয়েছেন। যে যে পথে যায়। অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি।

অনেক ঘুরে, অনেক ভোগের পর মনুষ্য রূপ পায়। মানুষই ভগবানকে পেতে পারে। তার যেমন অজ্ঞান রয়েছে, তেমন জ্ঞানের জানালাও আছে। ডাক্তার—ডাক তাঁর।

ইচ্ছা আসা যাওয়া করছে। ইচ্ছা একেতে এলে প্রকাশ হবেই। সেই ধারা সেই গতি আসা চাই। তুমি যখন ভগবানের যন্ত্র, তাঁতেই লাগাতে হবে নিজেকে। শুধু টাইম্ টেবিল দেখলেই হবে না। ষ্টেশনে যেতে হবে, টিকিট কাটতে হবে। ঋষিপন্থায় মনপ্রাণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

পত্নী গৃহলক্ষ্মী, সেবা করব—এই ভাব। সন্তান বাল-গোপাল—এই ভাব। এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে চলতে হবে। ঠাকুর ঘর রাখবে। সকাল সন্ধ্যা ভগবানের চিন্তা করবে। ভগবান কোথায় নেই? যেখানে আছ, সেখানে থেকেই নিজেকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা। তুমি যে ঋষি-সন্তান—তাই পাওয়ার জন্য চেষ্টা।

স্থান আগরপাড়া আশ্রম, মে ১৯৭৫

প্রঃ—মা, বাংলাদেশ থেকে ব্রাহ্মণেরা অনেকেই ভারতে চলে এসেছেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে সেখানে আরাধ্য বিগ্রহাদির পূজা অর্চনার ব্যাঘাত হচ্ছে। এ অবস্থায় কি কর্তব্য? পূজা কি বন্ধ থাকবে, না অব্রাহ্মণ পূজা করবেন?

উঃ—বিগ্রহে ঈশ্বর যদি অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি তাঁর যথাযোগ্য পূজার ব্যাবস্থা করিয়ে নেবেন।

স্থান নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনের প্লাটফর্ম। ১৯-২০।৬।৭৫

প্রঃ—মহাপুরুষেরা বলে থাকেন, সব ঘটনাই ঈশ্বরেচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি পাতাও নড়ে না। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষ কর্মফল ভোগ করে কেন? কেন বলা হয়, যেমন কর্ম তেমন ফল? কর্ম তো সবই ঈশ্বরের, মানুষের দুঃখ ভোগ কেন?

উঃ—সমস্ত ঘটনাই ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই ঘটে না। এ কথা ঠিক। তবে মানুষের ঠিক ঠিক সে বোধ হয় কই? ভগবানই সব কর্মের কর্তা এই প্রতীতি যদি দৃঢ়মূল হত, তাহলে তো সমস্যাই থাকত না; যে প্রশ্ন করেছ, তা উঠত না। ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা—এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে তিনি মানুষকে ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত বিচার করে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ যেমন কাজ করে, তেমন ফল পায়।

প্রঃ—মা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন নিষ্কাম কর্মই মানুষের কর্তব্য। সেই নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—নিঃস্বার্থ যে কর্ম, ঈশ্বরের দিকের যে কর্ম, তা নিষ্কাম কর্ম। স্বার্থ-পরতার যে কর্ম তা সকাম কর্ম।

স্থান কানপুর (সংযম সপ্তাহ) ১০।১১।৭৫

প্রঃ—অপরোক্ষানুভূতি কেমন করে হবে?

মাঃ—অপরোক্ষানুভূতি বলতে কি বোঝ ?

উঃ—আত্মাকে পাওয়া—আত্মসাক্ষাৎকার।

মাঃ—গুরুর উপদেশ ঠিকমত পালন কর। তাতেই হবে।

প্রঃ—গুরুর উপদেশ ক্রিয়াত্মক। কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম তো ক্রিয়াত্মক নয়, ক্রিয়াতীত—জ্ঞানস্বরূপ, ক্রিয়ার মাধ্যমে কি ক্রিয়াতীতকে পাওয়া যায় ?

মাঃ—ক্রিয়াই ক্রিয়াতীতে যাবার রাস্তা। আত্মা তো সয়ংপ্রকাশ। তাঁর প্রকাশ তো সর্বক্ষণ আছেই। কিন্তু আবরণ আছে। আবরণই দূর করতে হবে। তা ক্রিয়ার দ্বারাই হয়। যেমন সূর্য সর্বদাই আছে ; মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে যায়। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে, সাধনা আছে, ততক্ষণ ক্রিয়াও আছে। প্রকাশ হয়ে গেলে ক্রিয়াতীত অবস্থা হয়। সেখানে ক্রিয়া-অক্রিয়ার প্রশ্ন নেই কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ক্রিয়া আছে।

প্রঃ—পাপ-পুন্য ধর্ম-অধর্ম কি ? কে করে ? কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য, কে তার সমাধান দেয় ?

মাঃ—ঈশ্বরাভিমুখী যে কর্ম তাই পুণ্য। যে কর্মের দ্বারা অবোগতি হয় তাই পাপ।

১১।১১।৭৫

প্রঃ—সংযম করে কি হয় ?

মাঃ—সংযমের নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করলে শক্তি জাগরিত হবে। তখন প্রশ্নের উত্তর নিজেই পেয়ে যাবে।

১৩।১১।৭৫

প্রঃ—ভগবানের উপর শ্রদ্ধা কেমন করে হবে ? কেমন করে আপনার কাছে পৌছব বলুন।

মাঃ—যে সব প্রবচন হচ্ছে, আদর্শ স্থাপন হচ্ছে, তাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতে পারে। ধরবার চেষ্টা কর। বুঝতে চেষ্টা কর। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিখে নাও। শ্রদ্ধা ভক্তি যদি ভিতরে না থাকত, এই প্রশ্ন উঠত না। এই যে প্রশ্ন

করেছ এতে শ্রদ্ধার রূপই প্রকাশ হচ্ছে। ভাল-খারাপ যেমন ভিতরে আছে, শ্রদ্ধা ভক্তিও আছে। ঈশ্বরকে পরমাত্মাকে পাবার ইচ্ছা শ্রদ্ধা থেকেই হয়।

প্রঃ—কি করে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব, বলুন।

মাঃ—গুরু পেয়েছ?

উঃ—রাম নাম ভালো লাগে। আজই বারবার মনে হচ্ছে আপনিই আমার গুরু।

মাঃ—গুরুর উপদেশ পালন, শাস্ত্রবিধি পালন করলে তোমার প্রশ্নের সমাধান হবে। সৎসঙ্গ কর। গুরুকৃপায় হয়।

প্রঃ—আপনাকেই গুরু বলে জানি। আমি প্রত্যেক ব্রতীর জন্য গুরুর স্পর্শ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি (কারণ পাদস্পর্শ নিষিদ্ধ), এবং অধ্যাত্ম বিধয়ক ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও উপদেশের জন্য কয়েক মিনিট সময়। কিন্তু দ্বারপালেরা আপনার কাছে যেতে দেয় না।

মাঃ—ভগবানই একমাত্র গুরু। অন্তর থেকে প্রার্থনা যদি করে যাও, ভগবান সে প্রার্থনা পূরণ করবেন।

প্রঃ—ঈশ্বরের কৃপার কি কোন নিয়ম আছে? কে কতটা সাধনা করেছে তা বিচার করে কি তিনি কৃপা করেন? না কি কৃপা অহেতুক, তার প্রাপ্তি যোগ্যতার কোন স্থির বিচার নেই, সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছাধীন?

মাঃ—ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব। একটা গল্প শোনো। নারায়ণ ভোজনে বসেছিলেন, হঠাৎ খাওয়া ফেলে তিনি প্রচণ্ড তাড়াহুড়ায় বেরিয়ে পড়লেন। বললেন একজন ভক্ত ভীষণ মার খাচ্ছে—তাই তিনি ছুটে তাকে বাঁচাতে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখা গেল তিনি মন্থর গতিতে হেলতে দুলতে ফিরে আসছেন। এত ব্যস্ত হয়ে বেরোলেন, অথচ গন্তব্যস্থলে না গিয়ে তখনই নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসছেন কেন—এ কথার উত্তরে ভগবান বললেন যে ভক্তটি কাতরভাবে তাঁকে ডাকছিল দেখে তিনি

দৌড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেখলেন কিছুক্ষণের মধ্যে সে আর তাঁর ভরসায় বসে না থেকে প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করেছে। তাই তিনি আর গেলেন না। এর থেকে শিক্ষা হোল—তাঁকেই ডাকতে হবে; একান্তভাবে তাঁর শরণ নিতে হবে শেষ সময় পর্যন্ত। নামস্মরণ, সহন, শরণ, সমর্পণ—মানুষের এই কর্তব্য। কিন্তু কৃপার এই হেতু থাকলেও তারই সঙ্গে কৃপার অহেতুকত্বও থেকে যায়। কৃপা পাবার পর ভক্ত দেখে যে যে কৃপা সে পেয়েছে, তা তার ভক্তি বা কর্তব্যকর্মের প্রাপ্যের অনেক বেশী। কাজেই কৃপা অহেতুকও বটে। ঈশ্বরের সৃষ্টিই তো অহেতুক। কৃপার অহেতুকত্ব ঠিক ঠিক সেই স্থিতি না হলে বুঝতে পারবে না।

দুঃখ দু'রকম হয়। সাংসারিক জিনিষের অভাব থেকে দুঃখ এবং ঈশ্বর বিরহরূপ দুঃখ। এই দ্বিতীয় প্রকারের দুঃখ থেকে শেষে সুখ আসে। প্রথম প্রকারের দুঃখ দুঃখই বৃদ্ধি করে। অবশ্য এর থেকেও সময়ে ঈশ্বরের দিকে আত্মানুসন্ধানের দিকে মোড় ফেরে।

১৪।১১।৭৫

প্রঃ—ভগবান নিজে আনন্দে আছেন অথচ সংসারকে দুঃখে ডুবিয়ে রেখেছেন; আর বলছেন, আমার নাম কর, স্তুতি কর। এরকম সংসার কেন বানিয়েছেন?

মাঃ—ভগবানই সংসারের ভিতর। সবই ভগবানের রূপ। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। ভগবানের খুসী তিনি কি রকমভাবে খেলা করবেন। লীলা তাঁরই। যখন প্রভু-দাস সম্পর্ক হয়, তিনিই দাস-রূপে। দাসের কাজ হোল সেবা করা। যে Line-এ যাবে, ভগবানের সেইরকম প্রকাশ হবে।

১৫।১১।৭৫

প্রঃ—আমার অহং বড় বেশী। তাতে দুঃখ হয়। মা, উপায় বলুন যাতে অহং না আসে। আমাকে অহং থেকে বাঁচান।

মাঃ--প্রবচনে তো এই কদিন ধরে এরই উত্তর দেওয়া হচ্ছে। সোজা উত্তর ঃ- গুরুর উপদেশ পালন কর –তিনি যেমন বলেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চল। মনুষ্য-জনম পাওয়া অতি দুঃসাধ্য। অহংকে এমনভাবে বাড়াও যেন ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা হয়, প্রতিজ্ঞা হয়।

প্রঃ—মা এত লোক আপনার কাছে আসে, আপনাকে পূজা করে, আপনার এসব কেমন লাগে ?

মাঃ এই শরীরকে যদি পূজা করত, তাহলে তোমার যেমন লাগে তেমনই লাগত। কিন্তু তারা ভগবানেরই পূজা করে, এই শরীরের তো নয়।

সংযম সপ্তাহে স্থির হয়ে বসার চেষ্টা, ভাব ক্রমশই ভাল হচ্ছে। ক্রমশই কাশি কম হচ্ছে, ঢুলুনি কম হচ্ছে। আসন ঠিক হওয়া চাই। মেরুদণ্ড সোজা থাকা চাই। ক্রিয়া হলে অনেক সময় আপনা-আপনি মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। স্বরূপ প্রকাশের ক্রিয়া। তুমিই (ভগবান) আছ এই প্রকাশের রাস্তা খোলা। অহংকার নিয়েই এই রাস্তায় প্রবেশ কর। মনোরাজ্যে অহং নিয়ে কাজ করলে দুঃখই হয়। ঠিক ঠিক 'তুমি'কে পেলে 'আমি'কে পাওয়া যায়। কপিল তাঁর মাকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই স্থিতি যদি আসে তখন সন্তান মায়েরও গুরু হয়।

অহংকারকে জানা হতে আপনাকে পাওয়া। কিন্তু পাওয়া না পাওয়ার উপরে যেতে হবে। তা ভাষায় বোঝানো যায় না।

ভগবানের সাথে দোকানদারি চলে না। এতদিন করলাম, তবু পেলাম না—আর সাধনা করে কি হবে ? এ ঠিক নয়। লেগেই থাকতে হবে, নিষ্ঠা রাখতে হবে। সাধনার দ্বারা উত্তরোত্তর স্থিতি পাওয়া যায়। আবার এমনও হতে পারে ঠিক point-এ বসে গেলে মুহূর্তেই পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে যাবে। এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবু যে যেমন অবস্থায় যে আশ্রমে আছে, তদনুযায়ী কর্তব্য করতে হবে। ভগবদবুদ্ধিতে সংসার করলে

গৃহস্থাশ্রমেও ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা খুলবে। নিষ্কাম কর্ম ভগবদ্‌সেবা বুদ্ধিতে। অহংকার থাকলে ভগবদ্—ক্রিয়াতেই অহংকার বাড়াও।

ভাইজীর স্মরণীয় 'দ্বাদশবাণী' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই লেখা শেষ করি। "ভগবান ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারনায় যা আনতে পারি, শ্রীশ্রীমা তাহারই মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলাবিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ।··· তিনি স্বাধীন ; বদ্ধ জীবভাবেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব। তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না বা বলেন না।···যখন কাহারও সুকৃতির ফলে তাঁহার আদেশাদি স্ফুরিত হয় ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিনা দ্বিধায় মন ও বুদ্ধিকে তদনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে।···ভগবচ্চিন্তারূপ ভিক্ষাই তিনি সকলের নিকট যাঞ্চা করেন।···তাঁহার নিকট ভেদাভেদ নাই ; ভাবই তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।···তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয় এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে।···শোক-দুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইহা নিশ্চিতভাবে মনে রাখিয়া সকল সময়ে সম্পদে-বিপদে তাঁহার অজস্র করুণাধারার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হইবে।"

"তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার বিধানে জগতে সবকিছু। তাঁহার নিজ সব। কর্ম্মগতিকে যেখানে যে অবস্থায় প্রয়োজন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। তাঁহারই উপর নির্ভর, তাঁহাকেই স্মরণ সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্য। তিনি বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন। দুঃখহরণ, কালহরণ তাঁহারই শরণ লওয়া। তবেই শান্তির আশা।"

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কথামৃত

গঙ্গেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

'মনের গেরুয়াই আসল সন্ন্যাস।" শ্রীশ্রীমা বললেন একজন ভক্তকে। তিনি গেরুয়া পরে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, মা মৃদু হেসে সুন্দর করে কাব্যায়িত করে এই মন্তব্য করলেন।

যে যাই বলুক মনই ত সবকিছু। মন নিয়েই ত কথা। তাইতো মনের সমস্ত কুঠরিতে জ্বালাতে হবে আলো। সে আলো প্রেমের আলো ক্ষমার আলো, শান্তির আলো। সাধ্য কি তুমি আমার মনের ঘরটিতে এসে না বস। তোমাকে আমি ধন দিয়ে ভোলাবো না, ভোলাবো মন দিয়ে। এই অন্তরেই ত সুচির নীর-নিবাস। এই মনের মধ্যেই ত সেই মানস সরোবর। মনমালাই হোক জপমালা। তাইতো মা ডাঃ জে, কে, সেনকে বলেছিলেন দিল্লীতে,—'তুমি ত ডাক্তারী কর, এবার একটু মনের ডাক্তারী কর।' তোমরা ত জান রোগ ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ পথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ান দরকার। সেই রকম নিয়ম মত নাম করে যাও। মন স্থির হবেই। ফল নিশ্চয়ই পাবে।'

—নাম ত করি ফল ত দেখি না মা?

—'দেখ, তোমরা ঔষধ খাও সত্য কিন্তু কুপথ্য কর। তাই ঔষধে ফল

দেখা যায় না। ঔষধ হলো নাম, আর পথ্য হলো সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়? যতই ঔষধ খাও ফল হবে না। তাই বলি যদি ফল চাও শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নাম করে যাও।'

বাইরে কোথাও তাঁকে পাবে না। এই অন্তরেই সব কিছু। এই দেহ-ঘটের মধ্যেই তিনি দীপ্যমান। এই দেহের মধ্যেই সপ্তসমুদ্রের রঙ্গলীলা। এই দেহ মনেই দ্বারকা মথুরা আবার কাশী সর্বপ্রকাশিকা। যত কঠিনই হোক অন্তর খুললে জল মিলবেই। দেখ না খেজুর গাছ প্রথমে কাটলেই কি আর রস বের হয়? কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে ঝর্‌ঝর্ করে রস পড়ে। আবার দেখ সেই রসে শক্ত জিনিষও তৈরী হয়। তেমনি ভক্তিরসে মন সিঞ্চিত হলে ধীরে ধীরে গলবে। নাম কর। নামেই সব হবে। নামের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়। একটা প্রজ্জ্বলন্ত' প্রেমমন্ত্র। যাকে ভালবাস তাকে যেন হৃদয়ের সুর দিয়ে ডাকা হয়। সে ডাকের সংঘর্ষে বাতাস হবে সমীরিত। আর সঞ্জীবিত হবে সেই নিরুত্তর নিষ্ঠুর কাষ্ঠ। আর তারই প্রত্যুত্তর একদিন পুষ্পায়িত হয়ে উঠবে সেই কাষ্ঠে।

অনুরাগ নিয়ে কথা। মাটী যত শক্তই হোক যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে, তবে নাম বীজ—বীজের অঙ্কুর যতই হোক কোমল, মাটি ঠিকই ভেদ করে উঠবে।

পৃথিবীতে এত বস্তু নেই যা আগুন দগ্ধ করতে না পারে। তেমনি মানুষে এত পাপ করতে পারে না যা নামের দ্বারা দগ্ধ না হয়। নাম নাম শুধু নাম। 'নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।'

'শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই ত পড়ে। নিজেকে ভগবানের চরণে অঞ্জলী দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখবার চেষ্টা। যিনি আত্মা প্রাণের প্রাণ তাঁর কথা তাঁরই গুণ বর্ণন, তাঁরই রূপ সর্বেতে দেখার চেষ্টা রাখা। যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা তাঁরই ত কৃপা। কেবল

ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণীয়। নিরাশ হতে নাই। যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা।'

'গোলাপ ফুল তোলাই উদ্দেশ্য কাঁটার দিকে লক্ষ্য করতে নেই। কাহাকেও অবজ্ঞা করতে নেই। সাধুভাবে আছে এই দেখলেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়। সেই বিরাট মহানেরও এই একরূপ এই ভেবে প্রণাম করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে। শ্রদ্ধার ভাবে যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। সকলের মধ্যেই সেই একেরই সত্তা দেখতে চেষ্টা করতে করতে দেখবে সেই বিরাট মহান ভাবে তাঁকে পাওয়ারই রাস্তার অনুকূল আশা।'

'ফিলটার করলে জল পরিস্কার হয়। সেই শুদ্ধ জল যেমন এই জলেতে আছে, তেমন তিনি সর্বেতে আছেন। তাঁকেই প্রণাম। তাঁরই সঙ্গ করণীয়।'

'জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম তাঁকে সমর্পন করার চেষ্টা করা দরকার। এমন কি খাওয়াদাওয়া হাঁটাচলা দেখা শুনা বলা সবকিছু। তাঁর হাতের যন্ত্র এই শরীর দিয়ে যা কিছু হচ্ছে সব তাঁকে সমর্পন করা। ভোর বেলা জাগরণের পর থেকে নিদ্রার পূর্ব পর্য্যন্ত এই ভাবটী রাখতে চেষ্টা করা। তারপর মনে মনেই তাঁর চরণ চিন্তা করে জপ কিংবা ধ্যানের ভাবটীসহ চরণের উপর নিজের মাথাটি লুটিয়ে সর্ব সমর্পিত ভাবটী নিয়ে শুয়ে পড়া। এই রকম করতে করতে ধীরে ধীরে মনে আসবে যে, লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ বস্তু তাঁকে কেমন করে দেব? তিনি যে আমার প্রিয়, আপনজন। প্রিয়জনকে কি আর খারাপ জিনিষ দেওয়া যায়? ধীরে ধীরে শুদ্ধভাব মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসবে। অসৎ ভাব বিদূরিত হবে। তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চরণে উজাড় করে দিলে, নিজের বলে আর কিছুই রইলো না, সেই শুভমুহূর্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার অল্পত্ব পূর্ণ করে দেন। তখন চাইবার পাইবার কিছুই থাকবে না বাকী। সেই মুহূর্তে তোমার সমর্পন, সেই মুহূর্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ডপূর্ণত্ব তার প্রকাশ। আমার

আমি নিজ বলে যা, তা অর্পন মানেই নিজেকে পাওয়া।'

'আত্মাতে বিশ্ব আছে, আবার বিশ্বে আত্মা আছে। অনুরাগের বর্ধণ হলে বিশ্বও থাকে না আত্মাও থাকে না। অথচ উভয়ই অভিন্নসত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাই স্বয়ং প্রকাশ। পূর্ণসত্ত্বা।'

'সর্বকর্মের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা বড় রাখতে চেষ্টা করবে। ধ্যান যত বড় রাখবে ততই সেই জ্ঞান পাওয়ার আশা। তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন কর আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধর সিদ্ধকাম হবেই।'

'দেহ-সংযম বাক-সংযম ত অনেক সময় হয় কিন্তু মন সংযম হয় কোথায় ? এরই জন্য চাই সংকল্প। চাই সাধনা। চাই ধৈর্য্য। চাই একাগ্রতা। মন সংযম না হলে ধ্যান রাখবে কি করে ? সারাদিন মনটা কি করে, ধরতে পার কি ? জপ ধ্যান থেকে মনটা যদি ছুটে আসে তবে নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনটাকে নিজের বশে রাখা। গভীর অন্ধকারে মনের গুহায় প্রবেশ করে, সেখানে ক্রিয়া করে আসনে বসে পড়া। যতক্ষণ পারা যায় জপ ধ্যানে থাকা। থাকতে থাকতে এইরকম ভাবের সৃষ্টি হবে যে, সেই অন্ধকার গুহা নিজেরই অন্তরের তেজোময় আলোতে যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে। যখন ইষ্ট অথবা গুরুর ধ্যানেও মনটা নিবিষ্ট হতে চাইছে না, তখন ঐ আলোকিত গুহার মধ্যেই মনটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করা। তারপর সেই আলোর মধ্য হতেই কোনও কল্পিতভাবে নয়, তেজোময় মহাযোগীদের প্রকাশ হয় কি না, তারই জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা। যদি কখনও দর্শনলাভ হয় তবে তাঁদের সঙ্গেই ওঠা বসা থাকা। যদি যোগীদের প্রকাশ নাও হয়, তবুও এই সৃষ্ট গুহার মধ্যভাগ ছাড়া বাইরে কোথাও যাওয়া নেই। গুরু ইষ্টের প্রকাশ জাগ্রতভাবে রাখবার চেষ্টা করা। সর্বদাই একটা নিরাবরণ মুক্তভাব রাখা। যদি কখনও মনটা চঞ্চল হয়ে গুরু ইষ্ট ধ্যান ছাড়া বহির্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে নাম জপ করতে করতে গুহার ভিতরে প্রবেশ করা। যে অবস্থায়ই থাক না কেন নিত্য-

কর্ম সমাপনান্তে এই জাতীয় ভাবধারায় যত দীর্ঘ সময় থাকতে পারা যায় ততই মঙ্গল।'

চাই মনের সূচিতা। শুদ্ধ চিত্ত। তমসায় আবিষ্ট মন নয়। সে মন জ্বলবে সত্যের বিভাসনে, মুক্ত খড়্গের মত। সে দীপ্তি কিছুতেই বাধিত হবে না, বাইরে তার আভাস জাগবেই জাগবে। তাইতো আনন্দময়ী মা বলেছিলেন সাধিকা রুমাদেবীকে, 'দর্পন পরিষ্কার করলে যেমন তাতে নিজের প্রতিমূর্তি পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়, তেমন চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মস্বরূপ তাতে পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে। সেইভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করবার জন্য চেষ্টা করা। তাহাই লাভ করা দরকার।' গেরুয়া পোষাক নয়, মনকেই গৈরিক রঙে সিক্ত করে তোলা। অবশ্য একথাও ঠিক,—'ভগবৎ কৃপা বিনা কিছুই সম্ভব নয়। সবই ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সব সহ্য করে তাঁরই নাম নিয়ে থাকা।'

):::০:::(

"মানুষ নামে পরিচিত। মনের হুস হওয়া চাই। কর্ত্তব্য নয় কি আছাড় খাইয়া পড়িলেও আবার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ান? বার বার ত আর পড়িয়া যায় না। মানুষ মাত্রেরই চেষ্টা কর্ত্তব্য। হুস না হইলে আর হইল কি? জীবন যে তাহা হইলে বৃথা। ব্যর্থ জীবনে কত যুগযুগান্তর আসা যাওয়া। মনে হওয়া—আমি কে? আসা যাওয়াটা কি? কেন? কোথায়? অন্তরের নিজের যাত্রায় অন্তরাল অন্তর্হিত হয়। সেই অমৃতের দিকে যাত্রা করিতেই হইবে, শত শত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া। সেই পুরুষকারের জাগরণ প্রয়োজন। প্যারালিসিসের মত হেলিয়া পড়িবে কেন? কেবল পারছি না, পারছি না। কেন? কেন? কেন?"

—শ্রীশ্রীমা

= চিন্ময়ী =

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়

চিন্ময়ী মূরতি তব
কি অমিয় সুধা
ঢালে এই অম্বরে।
থাকি' থাকি' যে হাসি রাশি
ফোটে ওই অধরে,
চকিতে দামিনী যেন
ক্ষণেকের তরে
পরিচিত ভুবনে
দেখায় নূতন ক'রে॥

* * *

যে অমৃত রস ও
মায়ের প্রশান্ত বদনে
নিয়ত নির্ঝরে
তা'র কি তুলনা মিলে
কোথাও, এ ত্রিভুবনে!!

* * *

অখণ্ড-ভাব-ঘন
জ্যোতির্ময়ী-মূরতি
জননী
সন্তানের অন্তর উদ্ভাসি'
আর্বিভূতা হও এবে
সত্য জ্ঞান ও আনন্দের
পরিপূর্ণ মধুরিমা নিয়ে॥

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজজী গত ১২ই জুন ১৯৭৬ অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীধামে মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হইয়াছেন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আনন্দবার্ত্তার পরবর্ত্তী একটি সংখ্যা "শ্রীগোপীনাথ স্মৃতি সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত করা হইবে।

যাঁহারা শ্রীগোপীনাথজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার পরম সোভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনবেদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ এবং অগাধ জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের জ্ঞাত বিষয় আমাদের লিখিয়া জানান। কবিরাজজীর সম্বন্ধে বিশেষ রচনাও সাদরে গৃহীত হইবে। সমস্ত রচনা ১৯৭৬ সালের ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। জয় মা। ইতি—

সম্পাদক
আনন্দবার্ত্তা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদৈনী।
বারাণসী—২২১০০১

ধন্য হ'ল জন্ম মম পূর্ণ হ'ল অন্তর

শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য

চলেছি তীর্থ ভ্রমণে। সঙ্গে আছে স্ত্রী ও দুই পুত্র। ১৯৭৬ ইং ৩রা মার্চ ধানবাদ থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকালে টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আগ্রা, মথুরা হয়ে ৬ই মার্চ আমরা শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছলাম। আগ্রায় দুই দিন অবস্থান করে রাধাস্বামী মন্দির, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি ইত্যাদি দেখা হ'ল। বৃন্দাবন মথুরায় তীর্থ করতে গিয়ে প্রথমে আগ্রায় আসতে হ'ল তাই মনে মনে অসন্তোষ ছিল যে প্রথমে মমতাজের সমাধি দেখেই কি তীর্থ পরিক্রমা আরম্ভ করতে হবে? টাঙ্গাওয়ালাকে ধন্যবাদ সে প্রথমে আমাদের রাধাস্বামী মন্দিরে নিয়ে গেল। রাধাস্বামী একজন আগ্রাবাসী মহাত্মা। তাঁর তৈলচিত্র ঐ মন্দিরে রাখা আছে। চিত্র দেখে ভক্তিতে মাথা আপনি লুটিয়ে পড়ে। শুনতে পেলাম তিনি জীবিত থাকা কালিন এই মন্দিরের পরিকল্পনা নিজে করেছিলেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছে ১৯০৩ ইং তে। ৭৩ বছরে মাত্র একতলা শেষ করা হয়েছে। শুনলাম সাত তলায় এই মন্দির সম্পূর্ণ হবে। মন্দিরটি আগাগোড়া সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী হচ্ছে। মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি এত সুন্দর ও অপূর্বভাবে খোদাই করা হচ্ছে যে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মন্দিরটি সম্পূর্ণ হতে আরও বহু বছর সময় নেবে। আমার অনুমান এটি সম্পূর্ণ হলে দেশ বিদেশের আগ্রা ভ্রমণকারির দল তাজমহল

দেখার আগে প্রথমে এই মন্দিরে ভীড় করবে।

আগ্রা থেকে সকাল ৭ টায় আমরা বাসে করে রওনা হয়ে বেলা ১০ টায় মথুরাতে পৌছালাম। সেখানে বাস বদল করে বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে চললাম। পথে যেতে যেতে অন্তরে আনন্দধারা অনুভব করছিলাম। এই সেই বৃন্দাবনধাম যেখানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কৈশরে তাঁর লীলা প্রকট করে ব্রজমণ্ডলবাসীকে ব্রহ্মরস পান করিয়েছিলেন। আর সে রসের বিন্দুমাত্র অনুভব করে আজও কত সাধক, সিদ্ধ, যোগী নিজেকে ধন্য মনে করছেন। বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে মধু, পথ ঘাট, বৃক্ষলতা বায়ুমণ্ডল অহরহ মধু, বর্ষণ করে চলেছে। আমরা ধন্য - চলেছি মধুবৃন্দাবনে। এখানে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণনাম ব্রজবাসীকে কৃষ্ণপ্রেমে আকুল করেছে - বনের পশু-পক্ষী স্থির হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়েছে। এখানে এসেছেন শ্রীরূপ-সনাতন—শ্রীজীব গোস্বামীরা, এসেছেন মহাসাধিকা মীরাবাই, এসেছেন ভক্তপ্রবর লালাবাবু, এসেছেন বিল্বমঙ্গল, এসেছেন বর্ত্তমানকালের পরমযোগীনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। কত ভক্ত, সাধক বৈষ্ণব ও যোগীর পবিত্র দেহস্পর্শ আছে এই ধামে। ধন্য আমরা এখানে আসতে পেয়ে। তিন দিন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করে মন্দিরাদি দর্শন করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে ভজনে যোগ দিলাম। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে গিয়ে মায়ের ছবি ও ঠাকুরদেবতার বিগ্রহ দর্শন করে প্রণতঃ হলাম। পুজারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল কুশারী মহাশয়কে মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু মা কোথায় আছেন তিনি বল্‌তে পারলেন না।

৮ই মার্চ তারিখে মন্দিরাদি দর্শন করতে গিয়ে অলৌকিকভাবে অমর পুরুষ এক মহাত্মার দর্শন ও কৃপালাভ করে ধন্য হলাম। তাঁর সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌তে চাই না। ঐ মহাত্মার অনুমতি পেলে পরে তাঁর সম্বন্ধে জানাবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীবৃন্দাবন থেকে দিল্লী হয়ে আমরা ১১ই মার্চ সকালে হরিদ্বারে পৌছালাম। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে (হর-কি-পৌড়ী) গঙ্গামায়ের আরতী দর্শন করে খুবই আনন্দ অনুভব করলাম। কোন নদীকে দেবী ও মাতৃজ্ঞানে পূজা ও আরতী যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর—ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে সন্ধ্যাবেলায় এসে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে না দাঁড়ালে অনুভব করা যায় না।

পরদিন ১২ই মার্চ (১৯৭৬) সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পন করলাম। ঐ দিনই বিকালে কন্‌খলে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে উপস্থিত হলাম। উদ্দেশ্য যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হব। ১৯৭২ ইং মার্চ মাসে কাশীতে ও পরে ১৯৭৪ ইং আগষ্ট মাসে ধানবাদে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলাম কিন্তু পরে আর তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়ে উঠে নি তবে পত্র মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৭৪ ইং অক্টোবর মাসে ৺শুভবিজয়ার প্রণাম জানিয়ে তাঁকে পত্র দিয়েছিলাম। উত্তরে বৃন্দাবন থেকে ৩০শে জানুয়ারীর (১৯৭৫ ইং) পত্রে তিনি জানালেন "গুরুকৃপা প্রার্থণা। ক্রিয়াযোগ। নিত্যযোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা—আনন্দের। বিজয় লাভ লক্ষ্যে পরমপথে তীব্র যাত্রী হওয়া।" ১৩ই এপ্রিলের (১৯৭৫ ইং) পত্রে কনখল থেকে মা জানালেন—"স্বধন-প্রাপ্তি লক্ষ্যে মনুষ্যজীবন সফল যাত্রায় চলা।" পুনঃ কনখল আশ্রম থেকে ২৭ শে অক্টোবরের পত্রে জানালেন—"উপস্থিত কেমন? ভাল চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার চেষ্টা। ভগবৎ চিন্তা সর্ব্ব পরিস্থিতিতে।" এই পত্রটি পেয়ে আমি প্রথমে মনে করলাম অন্য কোন ভক্তের চিঠির উত্তর ভুল করে আমার কাছ পাঠানো হ'ল না তো? কারণ আমি মায়ের কাছে লেখা কোন পত্রে কারও অসুখের কথা তো লিখি নাই। কিন্তু পরে এর মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। যদিও কারও অসুখের কথা মাকে জানাই নি এদিকে সত্য সত্য আমার স্ত্রী ইতিমধ্যে খুবই অসুস্থ ছিল এবং একদিন তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। ঐ

সময়ে সে যে কামরায় ছিল তার দেওয়ালে টাঙ্গানো শ্রীশ্রীমায়ের ফটোর দিকে তাকিয়ে সে অভিমানভরে বলে, "মা, তুমি থাকতে আমার এই সঙ্কট কেন ?" ধানবাদে আমাদের বাসাবাটী থেকে বহুদূরে কনখলে অবস্থান করেও শ্রীশ্রীমা আমাদের প্রতি তাঁর শুভদৃষ্টিধারা অব্যাহত রেখেছেন প্রত্যক্ষ করে আনন্দে ও আবেগে হৃদয় ভরে উঠল। জয় মা! অপূর্ব্ব তোমার মাতৃস্নেহ! মায়ের কৃপায় সঙ্কট কেটে গেল। এই সংবাদ জানিয়ে মায়ের চিঠির উত্তর দিই কনখলের ঠিকানাতে। কাশী থেকে ২০শে ডিসেম্বরের পত্রে স্বামী পরমানন্দজী জানালেন—"আপনার চিঠি মা শুনেছেন। মা বল্লেন চিঠি দেও। উপস্থিত আপনারা কেমন আছেন মা জিজ্ঞাসা করলেন। পরমার্থ পরিবেশে মন রাখতে বললেন।" পরে নৈমিষারণ্য থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৭৬ ইং) পত্রে মা জানালেন—"অন্তর্জ্ঞান জাগরণ হওয়া মানুষের কর্ত্তব্য, সত্যানুসন্ধানের দিক্ হওয়া।"

বৃন্দাবন আশ্রমে খবর নিয়ে মা বর্ত্তমানে কোথায় আছেন কোন সন্ধান পাই নি। কাজেই কন্‌খল আশ্রমে তাঁকে পাব বলে আশা করি নি। আশ্রমের প্রবেশদ্বারে টাঙ্গা থেকে নেমে একজন ভক্তের নিকট মা আছেন কি না অনুসন্ধান করতে তিনি খুসী হয়ে বল্লেন,—"মা আছেন এবং আপনারা ঠিক সময়ে এসেছেন—তিনি দর্শন দিচ্ছেন শীঘ্র যান।" তাড়াতাড়ি ফুলের মালা নিয়ে দোতলায় মায়ের কাছে উপস্থিত হলাম। সঙ্গে স্ত্রী, বড় ছেলে গৌতম ও ছোট ছেলে সুজলও আছে। প্রণাম করতেই বল্লেন,—"তোমরা ভাল আছ তো ?" বল্লাম--মা, আপনার কৃপায় ভাল আছি।

মা—"জপ করছো তো ?"

বল্লাম—করছি মা।

সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন। প্রসাদ পেলাম। আমার ছেলেরা এবারে প্রথম মায়ের দর্শন পেয়ে ধন্য হল।

হরিদ্বার, কন্‌খল, হৃষিকেশ, লছমনঝুলা, স্বর্গাশ্রম ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দর্শন করলাম। ৪ কিলোমিটার উচু মনসা পাহাড়ে উঠে মনসাদেবী, দত্তাত্রেয় ও অনেক দেবদেবী দর্শন হল। গঙ্গায় প্রায়ই স্নান তর্পন করে শান্তি লাভ করলাম। প্রায় ১০ দিন পরমানন্দে হরিদ্বারে কাটালাম। ২০শে মার্চ রাত্রের গাড়ীতে হরিদ্বার ত্যাগ করে কাশীর দিকে যাব। ঐ দিন সকালে গঙ্গাস্নান করে আমি ও সুজল শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে প্রায় ১২টার সময়ে তাঁর দর্শন পেলাম। মাকে বল্‌লাম —"মা, আপনি আগের বারে জিজ্ঞাসা করেছিলে 'জপ করি কি না'। আমি তো 'যোগক্রিয়া করি এবং তাতে অভ্যন্তরিণ যা' জপ আছে তা করি কিন্তু অন্য কোন জপ করার যদি প্রয়োজন থাকে বলুন কি জপ করবো।"

মা বল্লেন—"ক্রিয়া করলেই হবে অন্য কোন জপ তোমাকে করতে হবে না।" তারপরে ঐ কামরা থেকে অন্য সকলকে সরিয়ে দিয়ে একান্তে আমার সাধন সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন এবং কাশীতে গিয়ে আশ্রমে আমি যাব কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আশ্রমে যাব বলতে সেখানে পানুদা অথবা জয়াদিকে দেবার জন্য চিঠি ও অন্যান্য কিছু কাগজপত্র দিলেন। ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণাম করে বিদায় নিলাম এবং রাত্রে ডুন্ এক্সপ্রেসে কাশীর দিকে রওনা হলাম।

পরদিন বৈকালে কাশীতে পৌঁছে সন্ধ্যায় ভাদৈনীতে মায়ের আশ্রমে যাই। পানুদাকে পেয়ে পত্র ও কাগজগুলি তাঁর হাতে দিলাম। উপরে অন্নপূর্ণা মন্দিরে প্রণাম করি। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর কামরায় দর্শন করি। গঙ্গার দিকে মুখ করে শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি দাঁড়িয়েছিলেন—দূর থেকে তাঁকে দর্শন করি। ৪।৫ দিন কাশীতে জামাই আশুতোষের (কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য) বাড়ীতে বেশ আনন্দে কাটিয়ে ২৫শে মার্চ রাত্রে আমরা আমাদের তীর্থ

পরিক্রমা শেষ করে ধানবাদে ফিরে এলাম।

২৪শে এপ্রিল (১৯৭৬ ইং) স্ত্রী শান্তি পুনঃ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে স্বপ্নে দর্শন করে। সে দেখে কোন এক বাড়ীতে মা এসেছেন সংবাদ পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় মা খাটে শুয়ে আছেন এবং একজন ভক্ত মহিলা (কালো বর্ণের সাধারণ দরিদ্র মনে হয়) তাঁর শিশুপুত্রকে মায়ের দুগ্ধ পান করাচ্ছেন। দুগ্ধ পান করানো আর শেষ হয় না দেখে শান্তি কিছুটা বিরক্ত হয়ে মহিলাটিকে বলে যে মায়ের কাছে তার অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। সে দূর থেকে আসছে কাজেই মহিলাটি যদি মাকে এভাবে আঁটকে রাখেন তবে সকলের অসুবিধা হবে। উত্তরে মহিলাটি বলেন,,—"আমার ছেলের খুব অসুখ—এই দুগ্ধ পান করে সে আরোগ্য লাভ করবে।" যাইহোক, মা এবারে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে খাটের উপর পা টেনে দিয়ে বসলেন এবং হেঁসে শান্তির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, --"বল, তোমার কি জিজ্ঞাসা করার আছে।" শান্তি মাকে খালি পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কোলে উঠে বস্‌ল। মা তখন তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "বল তোমার কি বলার আছে?"

শান্তি—মা, পূজা করতে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়ি -- কেন বলুন তো?

শুনে মা খিল্‌খিল্‌ করে হেঁসে উঠলেন এবং বল্লেন—

—"এটা আবার একটা জিজ্ঞাসা করার কথা—আর কি জিজ্ঞাসা করার আছে বল।"

শান্তি—এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন, দাঁড়ান মনে করি কিন্তু আর যে কিছু মনে পড়ছে না মা। (এমনই হয়। মায়ের কাছে গেলে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে না।)

মা—"তা হলে এবার উঠ, পূজা করতে হবে না?"

শান্তি মায়ের কোল থেকে নেমে এলো। পরে দেখে সে মায়ের কোলে বসাতে মায়ের কাপড়ে মাটির দাগ লেগেছে। তার দুঃখ হল।

শান্তি—দেখুন মা, আমি বসাতে আপনার কাপড়টা ময়লা হয়ে গেল, কি করে পূজা করবেন ?

মা—'আমার আর একটা কাপড় নিয়ে এসো—আমি স্নানের ঘরে যাচ্ছি—স্নান করে একেবারে পূজায় বসব।'

শান্তি এদিক ওদিক ঘুরে কোথাও মায়ের কাপড় পেল না। বাড়ীটা তার পক্ষে নূতন—কাউকে চেনেও না। তাকে ফিরে আসতে দেখে স্নানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মা হাঁসতে লাগলেন।

মা—"তুমি কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলে তা'ও ভুলে গেলে—কাপড়ও আন্‌তে পারলে না।"

শান্তি—আপনি শুধু বল্লেন কাপড় আন কিন্তু কোথায় আপনার কাপড় আছে সেটা বলে দিলে তবে তো আন্‌তে পারতাম। (বিশ্ব ভুবন জুড়ে যিনি বিরাজমানা তাঁকে কাপড় পরানো কি সহজ কথা ?)

জয় মা।

"যাহাতে মনটা তাঁকে নিয়ে থাকে তাহাই মানুষমাত্রের কর্ত্তব্য। তাঁহার হাতের যন্ত্রবৎ নিজেকে তাঁর চরণে ফেলে রাখা।"

—শ্রীশ্রীমা

সংসারে সুখী হওয়া

জনৈক ভক্ত—মা, সংসারে সুখী হওয়া যায় কিরূপে ?

মা—"সং সাজিয়া থাকিলেই সংসারে সুখী হওয়া যায়। দেখনা লোকে নানারূপ বেশ ধরিয়া সং সাজে। কিন্তু সং সাজিলেও তাহারা নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া যায় না। আর আমরা ত সং সাজিনা, সংকে আমরা সার করি। তাই আমরা সংসারী। যাহাদিগকে লইয়া আমরা সংসার করি, তাহাদিগকে যদি সংএর সাজের মত অনিত্য বলিয়া বুঝিয়া লই তবেই আমরা সংসারে সুখী হইতে পারি।"

ভক্ত—আমরা যদি সংসার করিয়া সুখী হই এবং ইহা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকি তবে দোষ কি ?

মা—"আমি দোষের কথা বলিতেছিনা। যদি উহাতে ডুবিয়া থাকা যায় তবে ত ভালই। কিন্তু ডুবিয়া থাকা যায় না। ডুবিতে গেলেই হাঁফাইয়া উঠিতে হয়। দেখনা, তোমরা পোষাকপরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতে যাও। কিছুক্ষণ পর তোমরা ঐ পোষাক পরিচ্ছদের ভারেই অস্থির হইয়া উঠ। উহা ছাড়িবার জন্য হাঁফাইয়া উঠ এবং উহা ছাড়িয়া যেন সোয়াস্তি পাও। সেইরূপ মানুষ স্বভাবতঃই মুক্ত থাকিতেই ভালবাসে। বন্ধন হইলেই সে অসোয়াস্তি বোধ করে। তাই সংসার করিতে আসিয়া সে সংসারে মজিয়া থাকিতে পারে না। সংসারের বন্ধন তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। সে মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করে। আর একটা কথা। সকলেই শান্তি ও আনন্দ চায়। মানুষের স্বভাবই আনন্দের স্বভাব। সে এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে চায়। তাই সে আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার ভিতরে যদি এই আনন্দের জ্ঞান না থাকিবে তবে সে আনন্দ খুঁজিবে কেন ? অবাধ আনন্দের অনুভূতি তাহার মধ্যে আছে বলিয়াই ত সংসার-বন্ধন তাহাকে কষ্ট দেয়। জীবভাবটা হইল বদ্ধভাব। এই বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হইলেই জীব আনন্দে স্থিতিলাভ করে।"

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni „	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XX		...	61.50
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.75
Amar Vāni	...	...	6.00

BENGALI

Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVII		...	48.50
Akhanda Mahayājna „ „	...	...	2.50
Matri Darshan—Bhaiji	...	...	5.00
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha		...	2.50
Vivek Churamani— „ „ „		...	3.50
Agyata Banakusum – „ „ „		...	3.00

GUJRATI

Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		...	4.00
—Vol. II		...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	...	...	6.00
Matri Vani (Sayings)			3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Special	7.50
Mother as Seen by Her Devotees			7.50
Sad Vani—"Bhaiji"		...	3.00
Ma Anandamayi Lila—Hari Ram Joshi		...	15.00
A Mystic Sage—Ma Ananandamayi Shyamananda Banerjee		...	15.00

PHOTOS

Photos—various sizes	0.50 to 15.00

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 4727/57